আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

বজ্রকলম

ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা

"ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত, সেটা যেমন এক প্রশ্ন, তেমনি জানা প্রয়োজন ইতিহাসের সঠিক উদ্দেশ্য কি? ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে অতীতে দেশে দেশে নেমে এসেছিল নানা ধরণের সংঘাত বর্তমানেও এর প্রভাব থেকে কোন দেশই মুক্ত নয়। ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণে যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য জড়িত থাকে তাহলে ঐতিহাসিক সত্যের ঘটে অপমৃত্যু। আমরা যে ইতিহাস আজ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ করাই তা এ ধরণেরই। এর সমাধানকল্পে আমরা চেষ্টা করছি সঠিক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়নের।"
—(প্রকাশক)

বজ্রকলম

(সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত ইতিহাসে আলোচিত তথ্যের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

(বর্তমানকালের অন্যতম সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক, গবেষক ও সমালোচক)

ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা

(ইতিহাসের অস্বচ্ছতা প্রতিরোধকল্পে এক কার্যকর পদক্ষেপ)

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ

- চেপে রাখা ইতিহাস
- ইতিহাসের ইতিহাস
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস
- এ এক অন্য ইতিহাস
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়
- পুস্তক সম্রাট
- এ সত্য গোপন কেন?
- মুসলমানদের চোখে বিবেকানন্দ

অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার করকমলে

প্রারম্ভিকা

আমাদের সমাজে দুর্বলদের প্রতি সবলেরা যখন অত্যাচার করে, যখন উন্নত শ্রেণী অনুন্নতদের 'ছোটলোক' বলে চিহ্নিত করে, যখন বর্ণশ্রেষ্ঠরা বঞ্চিত অনগ্রসরদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে, যখন তারা বিদেশী, গুপ্তচর, যবন, হরিজন, অচ্ছুত প্রভৃতি উপাধি ঝুলিয়ে দেয় তাদের নামে, যখন তাদের লঘু অপরাধে দেওয়া হয় গুরুদণ্ড, যখন কারণে অকারণে তাদের হতে হয় নিহত অথবা আহত, পদে পদে হতে হয় লাঞ্ছিত অথবা বঞ্চিত তখন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আওয়াজ তুলতে চাইলে অথবা বিচারপ্রার্থী হলেও যদি তাকে চিহ্নিত করা হয় 'সাম্প্রদায়িক' অথবা 'সমাজবিরোধী' বলে, তাহলে তা হবে আরো নির্মম, আরো বেদনাদায়ক।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মের নামে মনগড়া কুসংস্কার আর মিথ্যা ইতিহাস সমাজের সামনে তুলে ধরতে ব্যবহৃত হয় দৈনিক সংবাদপত্র, পুস্তক পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, সিনেমা, থিয়েটার, জনশ্রুতি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সরকারি বেসরকারি প্রচারমাধ্যম। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এ সবের পিছনে লুকিয়ে আছে কতকগুলো বিষাক্ত কলম; মিথ্যাচারিতা, শঠতা এবং বেইমানির ফলস্বরূপ অসার কিংবদন্তীগুলোকে যুগযুগ ধরে টিকিয়ে রেখে আসছে একদল কুচক্রী কলমধারী। আবার এই সমস্ত কুচক্রীদের সরকারি মদদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতর থেকে বরাদ্দ অর্থ এবং নানারকম প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা প্রাপ্তি ঘটলে তা হয় সোনায় সোহাগা মেশার মত।

আশার কথা এটাই, দুর্লভ হলেও এমন কিছু কলমধারী ছিলেন এবং এখনো আছেন যাঁরা তাঁদের বজ্রকলমে তার প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন, আসছেন এবং হয়ত আগামীতেও চলবে তাঁদের দুর্বার কলমের গতি — তাঁদের লক্ষ্য থাকবেনা নিজের আখের গোছানোর প্রতি, তাঁরা তোয়াক্কাই করবেন না পি-এইচ. ডি., ডি.লিট., পদ্মভূষণ, ভারতরত্ন প্রভৃতি সম্মানের, তাঁরা তোয়াক্কা করবেন না তাঁদের বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার সন্ত্রাসকে, তাঁদের তোয়াক্কা থাকবে না পুলিসি হাজতবাস এবং কারাগারের অমানুষিক যন্ত্রণার। ঐ সমস্ত মুকুটহীন সম্রাট ও রাজাদের সিংহাসন আবদ্ধ থাকবেনা ইঁট আর পাথরের প্রাসাদে, বরং তাঁদের সিংহাসন বিরাজ করবে কোটি কোটি মানুষের মূল্যবান হৃদয়ে—সত্যান্বেষী মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসায় তাঁরা হয়ে থাকবেন চির অমর, চির ভাস্বর।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন উদ্ধৃতি সাধারণ মানুষকে চমকে দেবে। কারণ, যুগযুগ ধরে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে ১৯৪৭-এর ১৫ ই অগস্ট ভারতীয়রা বৃটিশের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে এই তারিখটি 'স্বাধীনতা দিবস'। কিন্তু যদি সত্য এই হয় যে, দিনটি বৃটিশের স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার তারিখ অথবা শক্তির হস্তান্তর দিবস মাত্র — তাহলে?

সম্রাট অশোকের মত কত সব প্রাচীন সম্রাট এবং রাজাদের ইতিহাস যুগযুগ ধরে শেখানো হচ্ছে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে তাঁদের অনেকের মত সম্রাট অশোক নামে কোন সম্রাটের পৃথিবীতে জন্মই হয়নি—তাহলে?

তথাকথিত সুপ্রাচীন অবহট্ট, দ্রাবিড়, সংস্কৃত, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার ইতিহাস আমাদের শেখানো হয়েছে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব ভাষার বেশ কিছু আসলে সাহেবী ব্রেনের বাহাদুরী, এই সেদিনের বৃটিশ আমলে ওসব তৈরি করা—তাহলে?

দেশের মানুষকে শেখানো হয়েছে মুসলমানেরা উন্নতি করতে পারেনি কারণ তারা নাকি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, আর এই না পারার পিছনে ছিল নাকি তাদের ধর্মের গোঁড়ামি, অহমিকা অথবা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা— এককথায় দূরদর্শিতার অভাব! কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, সেইসময় শাসক সরকারের সঙ্গে 'খাপ খাইয়ে' নেওয়ার অর্থ ছিল বৃটিশের শোষণ ও অপশাসনকে হার্দিক সমর্থন করা, তাতে মদদ জোগানো, স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করা এবং সাহেবদের আদেশ - আব্দার - উপদেশ অনুযায়ী নিজের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পুত্রবধূকে নিবেদন করে তাদের ঔরসজাত মিশ্রিত রক্তের একটি সহকারী ভারতীয় দল সৃষ্টি করতে দেওয়া — তাহলে? কেউ ঐ প্রস্তাবকে তখন সুযোগ আবার কেউ সেটাকে একটি মারাত্মক দুর্যোগ বলে মনে করেছিল। আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের দেওয়া এই তথ্য সত্য হলে মুসলিম সমাজের ঐ 'খাপ না খাওয়ানো'র অক্ষমতাটুকু কি পাশবিক অপরাধ নাকি মানবিক গুণ? এই সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত পুস্তক পাঠান্তেই করা বাঞ্ছনীয়।

এ বইটি পড়ে পরিতৃপ্তি পেতে হলে প্রথমে পড়ে নিতে হবে আমার লেখা 'পুস্তক সম্রাট', 'বাজেয়াপ্ত ইতিহাস', 'চেপে রাখা ইতিহাস' এবং 'এ সত্য গোপন কেন?' বই চারটি ; আমার লেখা 'সেরা উপহার' 'রক্তাক্ত ডায়েরী' 'রক্তে রাঙা ছন্দ' প্রভৃতি বইগুলো 'বজ্রকলম' পড়ার আগে পড়া ততো জরুরি নয়।

উল্লেখযোগ্য অনেক ব্যক্তির বিষয় হয়ত আলোচনায় আসেনি অথবা অনেকের দুর্লভ ছবি হয়ত সংগ্রহ করতে পারি নি — সহৃদয় পাঠক তা তথ্যসহ জানিয়ে বা ছবি পাঠিয়ে সাহায্য করলে গৃহীত হবে সাদরে।

আমাদের কাছে এক বিশাল সঙ্কট বা বড় রকমের সমস্যা হচ্ছে এই যে, পুরনো দিনের তথ্য ও তত্ত্ব জানতে গেলে বিকৃত তথ্য, দ্ব্যর্থবোধক পরিবেশনা অথবা অসত্য প্রচারের চলমান ধারা গলধঃকরণ করতে বাধ্য হতে হয়। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুর বাড়ির নেতৃবৃন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার সৈয়দ আহমাদ, গান্ধীজি প্রমুখ মহামনীষীদের সহজলভ্য ইতিহাস শুধু চাঁদের আলোর মতই প্রচারিত। কিন্তু চাঁদের বহুল প্রচারিত আলোর ইতিহাস যতই জনপ্রিয় হোক সেটি কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন কুৎসিত গর্তে ভরা ভয়ঙ্কর একটি স্থান। ঠিক সেই রকম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আগমন, তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার, শোষণ শাসন এবং দেশীয় নেতানেত্রীদের সঙ্গে তাদের সুপরিকল্পিত সংযোগ এক অপ্রচলিত বা অপ্রচারিত বিস্ময়কর ইতিহাস।

এই বিষয়ে বজ্রকলমের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নের প্রস্তুতিপর্ব সারা হলেও তাড়াহুড়ো করে তা প্রকাশ করার অসুবিধা ছিল অনেক। তাই একটু বিলম্বেই "এ এক অন্য ইতিহাস" নামে তা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে বইটি সমাদৃত হয়। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পরম করুণাময়ের উপর নির্ভর করি এবং ভিক্ষা করি আরও করুণা।

বিনীত
গোলাম আহমাদ মোর্তজা

প্রকাশকের কথা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং অতিথি অধ্যাপক ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ "...আলোচ্য বইখানি বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক হবে। ... তাঁর প্রদত্ত তথ্য প্রমাণগুলি ভবিষ্যতেও অন্যান্য গবেষকদের কাছে মৌলিক উপাদানরূপে খুব কাজে লাগবে।"

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেন, "... বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন। বস্তুতঃ ভারতের মধ্যকালীন এবং আধুনিক ইতিহাসের হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা, এবং সে ব্যাখ্যাতে ইসলাম-এর এবং মুসলমানদের বিদূষণ বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে। তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এটি লেখকের [এবং আমাদেরও] যুক্তি।"

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমিত মল্লিক বলেন, "... বইটি তাঁর দীর্ঘ এবং শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফল।"

অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বসু বলেন, "... Golam Ahmed Mortaza known to us as a man well-versed in the history of Islam and respected for his erudition and art of eloquency."

অধ্যাপক প্রভাস কুমার সামন্ত বলেন, "... ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষে এ বইটি অবশ্য পাঠ্য।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মন্তব্য করেন, "... মুসলিম সমাজের বর্তমান সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছেন জেনে খুবই খুশী হয়েছি। ... এই সমস্ত সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নির্ভীক আলোচনা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন এই রচনা সংগ্রহ।"

হুমায়ুন কবীর

আলোচ্য বইটি সম্পর্কে মন্তব্য

মৌলানা আজাদ [গভঃ] কলেজের অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী বলেন, "... ঔরঙ্গজেব যে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য।"

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "... পুস্তকটি প্রশংসার দাবী রাখে।"

শরৎ সেন্টিনারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ "... পুস্তকটি প্রতিটি শিক্ষিত, বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের পড়া উচিত।"

বিবেকানন্দ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ. রায়. বলেন, "... The approach of the author is non-communal and his efforts for preserving amity among people of different religions are praiseworthy."

কলকাতা হাইকোর্ট এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি [অবসরপ্রাপ্ত], পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সম্মানীয় সদস্য সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন ঃ "... বৃটিশ আমলে রচিত ভারতের ইতিহাস ইংরাজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য লিখিত। ঐতিহাসিক অনেক সত্য উপেক্ষিত বা বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। এ সবের উর্দ্ধে মূল সূত্র থেকে সত্য প্রতিষ্ঠায় মোর্তজা সাহেবের প্রচেষ্টা সত্যই সাহসিক ও প্রশংসার যোগ্য।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "... সেদিক থেকে বইটি বহুল প্রচারিত ও সর্বজনপঠিত হলে সমাজজীবন আরও উন্নততর হবে নিশ্চিত আশা করা যায়। বইটি বহুল প্রচারিত হোক এই কামনা করি।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার জাহিদ লেখেন "ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও জাতির ভবিষ্যত পথনির্দেশ। ...তিঁর লেখা বিকৃত ইতিহাসের স্থলে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাসের প্রতি ন্যায় বিচার করেছে।

সূচীপত্র

বিষয়

ছবি

বজ্রকলম

অতীতের ইতিহাসই ভবিষ্যত গড়ার মাধ্যম। বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে, ভারতের সঠিক ইতিহাসও সহজলভ্য নয়। তবে একথা সত্য যে, দেশের কোটি কোটি মানুষ সঠিক ইতিহাস জানার জন্য উদগ্রীব।

প্রচণ্ড বুদ্ধিমান বৃটিশ ভারতে ব্যবসায়ীবেশে এসে সক্ষম হয় বাণিজ্যের তুলাদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে। কালক্রমে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দখল করলো সিংহাসন, আর দেশের সম্পদ সম্পত্তি নিয়ে চলে গেল ইংলণ্ডে—তাদের গ্রেট বৃটেনের দারিদ্র দূর হয়ে বয়ে গেল স্বাচ্ছন্দের প্রাচুর্য, আর ভারত হয়ে গেল রস নিংড়ানো ছিবড়ের মত নীরস এক দেশ—মুসলমানদের সাতশো বছরের বেশি রাজত্ব করার ক্ষমতা, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি উড়ে গেল এক ফুৎকারে ! নিশ্চয় তা ম্যাজিক ছিল না, বরং তা ছিল একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বা বুদ্ধির খেলা। সেই হিসাবে স্বীকৃতি দিতেই হয় বৃটিশের বিজয় বা বৃটিশ ব্রেনকে। তাদের ভারতবর্ষে আসার পূর্ব থেকে কয়েকশো বছরের বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তুতি এক অপ্রচারিত চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। তারপর তাদের আগমনের তারিখ থেকে ভারতবর্ষ ত্যাগের তারিখ পর্যন্ত যে কৌশলময় বৌদ্ধিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ—সেও এক উল্লেখযোগ্য অপ্রচারিত বিস্ময়কর ইতিহাস ।

১৯৪৭-এর ১৫ই অগষ্ট বৃটিশ ভারত ছেড়ে স্বদেশে ফিরলেও তাদের কয়েকশো বছরের ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া আজও বলিষ্ঠভাবে চলমান।

প্রশ্ন আসতে পারে এত পুরনো কাসুন্দির ঝুট ঝামেলায় যাওয়ার প্রয়োজন কী ? ঐ পুরনো দিনের কথা, লিপি, ইতিবৃত্ত, ঘটনাই তো ইতিহাস। যা জানা মানুষ জাতিরই একচেটিয়া অধিকার, যা সম্ভয় নয় পৃথিবীর অন্য আর কোন জীবের পক্ষে—মানুষ এবং পশুত্বের অন্যতম ব্যবধান তো সেখানেই। এসব সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরেছি শুধু আমার আগ্রহে নয়, বরং কোটি কোটি মানুষের প্রতীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতেই।

ইতিহাসের আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক যুগ কাকে বলে জানা দরকার। স্বাভাবিকভাবে 'যে সময় হইতে লিপিবদ্ধ ঘটনা পাওয়া যায় সেই সময় হইতে ঐতিহাসিক যুগ গণনা করা হয়'। কিন্তু ভারত তথা পৃথিবীর সৃষ্টি করা 'প্রাচীন ইতিহাস' নামের বিষয়টি একটি মারাত্মক প্রতারণা। আর তার সৃষ্টিকর্তা ইওরোপের পণ্ডিতেরা।

যে যুগে লিপি বা লেখার ব্যবস্থা ছিলনা সে যুগের কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করতে সৃষ্টি করা হয়েছে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ'। 'অতীতকালের যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা বলে। খৃষ্টপূর্ব ছয়শত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়।'

বিদেশী বুদ্ধিজীবী

প্রথম মিশনারী অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে। তিনিই প্রথমে ভারতকে কেমন করে খৃষ্টান ধর্মের আওতায় আনা যায় তার চিন্তা করেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষকে কেমন করে প্রভাবিত করে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির জন্য একটি শোষণক্ষেত্রে পরিণত করা যায় চিন্তা করতে পেরেছিলেন তারও।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন **আলবুকার্ক** [Albuquerque]। তিনি এসেছিলেন পর্তুগাল থেকে। ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে তিনি বেশ খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলা যায়।

সেন্ট জেভিয়ার [St. Xavier] ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৫৫২-তে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন ভারতে খৃষ্টান ধর্মের বিখ্যাত প্রচারক। তাঁকে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ভারতবর্ষে। এখানে এসে তাঁর দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছিলেন অর্থাৎ খৃষ্টানদের ভবিষ্যতের প্রশস্ত পথ তৈরি করতে বেশ কিছু মাইলস্টোন পুঁততে পেরেছিলেন তিনি। ইংলণ্ডবাসী তাঁর যোগ্যতায় খুশি হয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন চীনে। জাতি ও ধর্মের স্বার্থে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ইংলণ্ডের মানুষ তাঁকে অবতার ও পূজ্যব্যক্তি বলে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে।

আলবুকার্ক

রাণী এলিজাবেথ জন্মেছিলেন ১৫৩৩-এ। তিনি সারা জীবন ছিলেন অবিবাহিতা। সিংহাসনে বসেছিলেন ২৫ বছর বয়সে। মোট রাজত্ব করেছিলেন ৪৫ বছর। ঐ সময় ভারতে সম্রাট আকবরের রাজত্ব চলছিল। তিনি যদিও মুসলমান সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র তবুও এক নতুন ধর্ম তৈরি করেছিলেন যেটার নাম 'দ্বীনি-ইলাহি'। তাথ্যিক পণ্ডিত-গণের অনেকের মতে ঐ ধর্মটি ইসলাম ধর্মের বিপরীত। কারণ মদ এবং জুয়া তাঁর ঐ

ধর্মে বৈধ ছিল। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও পাঁচ হাজার পর্যন্ত পাওয়া যায়।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অধিকার দেন এ দেশে বাণিজ্য করার। ১৫৯৯-এর শেষ ভাগে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসাদার মিলে গঠন করেছিল ঐ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ঐ কোম্পানি কালক্রমে জয় করেছিল ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক কারণে ১৮৫৮ তে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রানী ভিক্টোরিয়া তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন ভারতবর্ষ শাসনের অধিকার।

মুসলমান শাসকদের সময়ে বহু বিদেশি শক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছিল তারা। আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে যেমন তাদেরকে বশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি চিরকুমারী রাণী এলিজাবেথের পাঠানো বণিক কোম্পানি তথা রাণীর অনুরোধপত্র হয়ত রঙিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাঁকে। তাই হয়ত বৃহত্তর স্বার্থের আশা নিয়েই ঐ বিলেতি কোম্পানিকে তিনি দিয়েছিলেন অবাধে ব্যবসা করার অনুমতি। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর পিতৃরোপিত অনুপ্রবেশের বিদেশি অঙ্কুরগুলোকে আরও মাথা উঁচু করার সুযোগ করে দেন। রাণী পরলোকগমন করেন ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে।

জাহাঙ্গীরের দরবারে টমাস রো

টমাস রো ছিলেন একজন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ইংলণ্ডের রাজা জেমসের দূত হিসাবে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায়। 'তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সুবিধাজনক শর্তে বাঙলা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন।'

টমাস রো ইংলন্ডের পক্ষ থেকে নানা উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হন জাহাঙ্গীরের দরবারে। টমাস আনুগত্য, ভক্তি, প্রীতি আর অনুনয়ের যে অভিনয় করেছিলেন তাতে সফল হয়েছিলেন তিনি। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল দামী দামী মণিমুক্তোর মালাসহ চিত্তাকর্ষক নানারকমের গহনা, কিছু মূল্যবান পাথর যেগুলো গহনা বা মুকুটে ব্যবহারের উপযুক্ত। সাধারণ দরিদ্র মৃত সৈনিকের বিধবা স্ত্রী নূরজাহান একনজরেই পছন্দ করে ফেলেছিলেন টমাসের বেশির ভাগ নৈবেদ্য। জাহাঙ্গীরকে পছন্দ করানোর

মত উপহার ছিল বিলেতি সুরা আর নেচে গেয়ে মুগ্ধ করতে পারে এমন সঙ্গীতজ্ঞ বেশ কিছু বিদেশী সুন্দরী। দিল্লির দরবার সেদিন ঠিক করতে পারেনি ঐ সুন্দরীদের আসল পরিচয়। সুন্দরীদের প্রত্যেকেই ছিল জটিল রাজনীতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত, সচেতন ও স্বদেশ প্রেমিকা। সুতরাং চিত্তবিনোদন এবং স্ফূর্তির চরম ও পরম মুহূর্তে তারা নানা কায়দায় বাদশার হাতের পাঞ্জার ছাপ আদায় করতো অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ইচ্ছামত সুবিধাগুলো অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিল সহজেই। জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছাধীন শর্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ অবিভক্ত বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার ইংরেজরা পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে। বাণিজ্য করার ও 'কুঠি' স্থাপন করার অধিকারের ভবিষ্যতে কী বিবর্তিত রূপ হবে তা টের করতে পারেননি মদ্যপ জাহাঙ্গীর ও তাঁর পথপ্রদর্শক পরম পিতৃদেব 'মহামতি' আকবর। বাণিজ্যের 'কুঠি'ই পরিণত হয়েছিল রাজনীতির দুর্গে। টমাস রো'র মত একজন নেতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে বা তাঁর শোষণের চক্রান্তের মূল্যায়নে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে দেওয়া হয়েছিল 'স্যার' উপাধি।

মিঃ তাভারনিয়েরও ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্স। অন্যদিকে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসাদার। ইংলন্ডের রাজনীতিবিদ্‌রা তাঁকে বিশেষ এক দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ভারতে। দায়িত্বটি ছিল মুঘল দরবারের অন্দরমহলের খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ। তিনি ঐ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঐসব সংগ্রহ করা তথ্যকে কেন্দ্র করে অতথ্য, অসত্য, মিথ্যা মিশ্রিত করে সৃষ্টি করেছিলেন একটি ইতিহাসের। সেটাকে তাঁর ভ্রমণকাহিনী বলে চালানো হয়েছে, আর তা ইওরোপের প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই মুদ্রিত হয়েছে সগৌরবে। তাঁর জন্ম সাল ছিল ১৬০৫ আর মৃত্যু হয় ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে।

ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ের— এঁর বাড়ি ছিল ফ্রান্সের মঞ্জু প্রদেশের জই নামক স্থানে। জন্ম ১৬২০ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। খুব ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করার পর তাঁকে স্থায়ীভাবে কোন জায়গায় ডাক্তারি করতে না দিয়ে পর্যটকের ভূমিকায় সমগ্র ইওরোপ এবং মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশ ঘুরিয়ে ১৬৫৮ তে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। মিঃ বার্নিয়ের বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও কার ইঙ্গিতে তিনি এতগুলো দেশ, বিশেষত মুসলিম দেশে পর্যটন করলেন এবং কেনই বা তিনি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে ভারতবর্ষে এলেন তার কারণ, আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, ভারত আক্রমণ করলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো ভারতের পক্ষে থাকবে কি বিপক্ষে অথবা থাকবে নিরপেক্ষ তা দেখার জন্যই ছিল তাঁর ঐ ভ্রমণ কার্য। শাহজাহান ছিলেন ধার্মিক লোক। অতএব বিলেতি সুরা আর বিদেশি সুন্দরী দিয়ে

তাঁকে যে মুগ্ধ করা যাবে না এটা বিলেতি রাজনীতিজ্ঞরা জানতেন ভালভাবে। ভাগ্য প্রসন্ন হোল। যে মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিলেন বার্নিয়ের, তা পেয়ে গেলেন তিনি। বাদশার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন বিলাসী। আহমেদাবাদে রাজকুমার দারার সঙ্গে বার্নিয়ের দেখা করেন এবং তাঁর স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসার গ্যারান্টি দেন তিনি। তাঁর চিকিৎসায় রাজকুমারের স্ত্রী কিছুটা সুস্থ বোধ করেন সেইজন্য প্রিন্স দারা তাঁকে পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে বরণ করে তাঁকে বিশেষ এক অনুমতিপত্র দেন যার বলে তিনি রাতে দিনে রুগী দেখার নাম করে দিল্লির রাজদরবারে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে যান অবাধে। সবচেয়ে যেটা মজার কথা, তিনি কোন পারিশ্রমিকই নিতেন না। তিনি নাকি ছিলেন নির্লোভ। তবে যে বিষয়ে লোভ ছিল সেটা হোল, রাজদরবারের বালক-বালিকা থেকে প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে চিকিৎসার নামে আলাপ করা এবং ভিতরের কথা বের করে নেওয়া। দারাকে তিনি প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে সম্রাটের মৃত্যুর পর পরবর্তী সম্রাট হতে পারেন তিনিই। তাতে বার্নিয়েরের স্বার্থ ছিল নতুন যুবক রাজাকে হাতে করে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার। তাঁকে আকবরের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। একটি নতুন ধর্ম তৈরি করতে আকবরের মত দারাশিকোও 'মজমউল বাহরাইন' বলে যে বই লিখেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ উপনিষদের যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন অথবা করিয়েছিলে সেসব ছিল বিলেতি মস্তিষ্কপ্রসূত কৌশল। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের আলোচনা পরে করা হবে বিশেষভাবে।

জব চার্নক

১৬৫৫-র পরে **জব চার্নককে** বিলেত থেকে পাঠানো হয় ভারতে। কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ হন তিনি। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ শুরু হলে কোন ইঙ্গিতে বা কোন পরিকল্পনায় তিনি কাশিমবাজার থেকে চলে এলেন ২৪পরগনার বরিশা। ওখানকার জমিদার ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরী। জমিদারদের সঙ্গে বৃটিশের আঁতাত কেমন ছিল সে আলোচনা হবে পরে। ঐ চৌধুরী মশাইয়ের কাছ থেকে 'কালিকোঠা বা কালিঘাট, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি' এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন করেন তিনি। তখন আমাদের দেশের কেউই আঁচ

করতে পারেননি যে এই কলকাতা একদিন হবে বৃটিশদের প্রধান ঘাঁটি — রাজধানী দিল্লি থেকে উঠে আসবে এই কলকাতাতেই । মুর্শিদাবাদের টাকশালও উঠে এসেছিল এখানেই। এই বিচক্ষণ ব্যক্তির মৃত্যু হয় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে।

ভারতবর্ষ নামক মৌচাকটিতে শুধু ইংলন্ডের মধুকরেরাই আসেননি, ফরাসী যে সব মধুকর এসেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম মিঃ ডুপ্লে [Joseph Francois Dupleix]। ১৬৯৭ এ তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে। ১৭১৫-তে ভারতে এসে ১৭২০-তে পন্ডিচেরি কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন তিনি। ভারতে আরো প্রভাব ফেলতে তিনি প্রচন্ড বাধা পেলেন ইংরেজ ক্লাইভ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে। শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের জয় হয় আর খর্বিত হয় ফ্রান্সের প্রভাব।

ডুপ্লে

মিঃ ক্লেভারিং [Clavering] জন্মগ্রহণ করেন ১৭২২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৭৭-তে হয় তাঁর পরলোকগমন। তিনি ছিলেন একজন সামরিক কর্মী। সারা বাংলার সৈন্য বিভাগটি যখন তাঁর দায়িত্বে ছিল তখন ছিল ১৭৭৪ সাল। তিনি ছিলেন মিঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্ত্রীসভার সদস্য। তাঁর সমস্ত মতামতে ক্লেভারিং একমত হতে পারতেন না। সুতরাং বাংলার এতবড় সামরিক নেতা হয়েও বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। সেই কারণেই 'স্যার' 'লর্ড' ইত্যাদি চটকদার উপাধিও জোটেনি তাঁর ভাগ্যে।

লর্ড ক্লাইভ [Lord Clive] ১৭২৫ এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বলা হয় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বিলেত থেকে তাঁকে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল ১৭৪২-এ। ১৭৪৮-এ সৈন্য বিভাগের কর্মচারি হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় ফরাসীদেরও ভারতে প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ইংরেজ ও ফরাসীদের মূল লক্ষ্য ছিল একই। আর্কটের মুসলিম নবাবের মৃত্যু হলে ফরাসীরা প্রতিনিধি বানান চাঁদ সাহেবকে, অন্যদিকে ইংরেজদের মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন মহম্মদ আলী। এঁদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচন্ড লড়াই। মিঃ ক্লাইভ মহম্মদ আলীর পক্ষে লড়তে বৃটিশ সৈন্য নিয়ে আর্কট আক্রমণ করলেন এবং পরাজিত করলেন ফরাসীদের। ভারতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক

পতন ওখানেই শুরু। আর্কটবাসী মনে করলেন বোধহয় মুসলমান নবাবের আর্কট ইংলন্ডের হাতেই চলে গেল। সারা ভারতের রাজনৈতিক নেতারাও ভাবছিলেন ঐ একই কথা। চতুর ক্লাইভ আর্কট দখল করে মহম্মদ আলীকে সিংহাসনে বসিয়ে চমক লাগিয়ে অবাক করেন সকলকে। বিশেষ করে ভারতের মুসলিম জাতি অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ক্লাইভের উদারতায়। তখন কারও পক্ষে টের করা সম্ভব হয়নি যে ওটা ছিল কৌশল মাত্র। এরপরে আরো কিছু ক্ষেত্রে ক্লাইভ ফরাসীদের পরাজিত করে ফ্রান্সের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করেন একেবারে। এইবার ক্লাইভ নজর দিলেন বাংলা বিহার উড়িয়্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার দিকে। তিনি ঘাঁটি গাড়লেন চন্দননগরে। সময়টা ঠিক এমন ছিল যখন বড় রকমের একটা ষড়যন্ত্র চলছিল সিরাজকে পদচ্যুত করার। এই দুর্যোগকে ক্লাইভ সুযোগ মনে করে যোগ দিয়ে দিলেন ষড়যন্ত্রে। সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ধনকুবের জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রাধাবল্লভ, উমিচাঁদ, গোবিন্দসিংহ, নন্দকুমার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

ক্লাইভ

আর মুসলমান নেতাদের মধ্যে ছিলেন মীর জাফর আলি ও ইয়ার লতিফ। সামরিক ক্ষমতার জোরে ক্লাইভ সিরাজকে পরাজিত করতে পারবেন না তা ভালই জানতেন তিনি। কারণ পূর্বের কলকাতার যুদ্ধে সিরাজের জয়লাভ এবং ইংরেজদের পরাজয়ের বা সেই আলিনগরের সন্ধির কথা তাঁর স্মরণ ছিল। সুতরাং ষড়যন্ত্র ছাড়া সিরাজকে পরাজিত করা যাবে না ভেবেই পূর্বে উল্লিখিত বঙ্গীয় নেতাদের সঙ্গে শর্ত দেওয়া নেওয়ার কাজ শেষ করে ফেললেন অর্থাৎ সিরাজের পদচ্যুতির পর কাকে কী দেওয়া হবে, কে কিভাবে কী পরিমাণ লাভবান হবেন সব জানিয়ে দেওয়া হোল তাঁদের। ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুলাই পলাশীতে যে যুদ্ধ [?] হয়েছিল সেটা ছিল একটা পুতুলখেলা মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রচারের জোরে এটাকে বিশ্বের বিরাট যুদ্ধ বলে চালালেও তা ছিল ভাঁওতা, কারণ সিরাজের সৈন্য যেখানে একলাখের ওপর আর সেই পরিমাণ কামান গোলাবারুদ, ক্লাইভ সেখানে হাজির হচ্ছেন মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে। ক্লাইভ হলেন বিজয়ী আর ভারত প্রতিনিধি সিরাজউদ্দৌলা হলেন বন্দী । কিছুদিনের মধ্যেই

নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হোল সিরাজকে আর ইংলণ্ড প্রাপ্য 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করলো ক্লাইভকে। সেইসঙ্গে চরম বেইমানির পরম পুরস্কার 'ব্যারন' টাইটেল।

এইবার লর্ড ক্লাইভ হয়ে গেলেন সারা বাংলার গভর্নর। ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উন্নতির গতি এত সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চলতে লাগলো যে সাধারণ মানুষ টের করতে পারেনি ভারত স্বদেশীর হাত থেকে চলে গেছে বিদেশীর হাতে। শান্ত অনুগত তাবেদার সেজে ১৭৬৫-তে দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের দরবারে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দেবার চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ আদায় করলো বৃটিশ। ক্রমে মুসলমান রাজত্ব গতি নেয় ধ্বংসের দিকে আর ইংরেজরাজ প্রতিষ্ঠার গতি বৃদ্ধি হতে থাকে দ্রুত।

ক্লাইভ ইংলন্ডবাসীর পক্ষে মহান মানুষ হলেও নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর চোখে তিনি ছিলেন একজন বড় শোষক ধাপ্পাবাজ ও লুন্ঠক। তিনিই হচ্ছেন ভারতের অর্থনৈতিক পতনের মূল আসামী। পূর্বে বর্ণিত বঙ্গীয় নেতাদের ষড়যন্ত্রে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, নাকি ক্লাইভের তৈরি ষড়যন্ত্রে ঐ নেতারা যোগ দিয়েছিলেন তা খানিকটা বিতর্কিত ব্যাপার। তবে উল্লিখিত ভারতীয় নেতারা প্রত্যেকেই যে নিজের নিজের অর্থনৈতিক পার্থিব স্বার্থে ভারতবর্ষকে বৃটিশের হাতে বিক্রি করার রাস্তা খুলে গেছেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত। নিহত সিরাজের বাড়ি লুঠ করে প্রত্যেক লুন্ঠকই ভালরকম নগদ মালকড়ি পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তবে একথা সত্য যে ভারতীয় বেইমান দালাল নেতারা যা পেয়েছিলেন তার চেয়ে বহু বেশি ধনরত্ন অর্থ পেয়েছিলেন বৃটিশ নেতারা। নিরপেক্ষ বিচারে ভারতীয় নেতাদের প্রাপ্তিযোগ সাময়িকভাবে হলেও তাঁরা তা বিদেশে নিয়ে চলে যাননি, কিন্তু বিদেশীরা যা পেয়েছিলেন তার সবটুকুই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন স্বদেশ ইংলণ্ডে। এর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রাপ্তির লিস্ট আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' দেওয়া আছে। ক্লাইভ সেই বাজারে পেয়েছিলেন দু লক্ষ আশি হাজার টাকা আর মীরজাফর ক্লাইভকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। তাছাড়া মেম্বার হিসাবে ক্লাইভ আরো দু লাখ টাকা পেয়েছিলেন আর সেনাপতির যোগ্যতা ও ষড়যন্ত্রের পুরস্কার বাবদ বিশিষ্ট দান পেয়েছিলেন আরো এক লাখ ষাট হাজার। এগুলো সব প্রকাশ্য প্রাপ্তি। কিন্তু গোপনে যা পেয়েছিলেন তার পরিমাণ সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে যখন তিনি ইংলন্ড চলে গিয়েছিলেন তখন তাঁর মালপত্র জাহাজে ওঠাবার সময় যা দেখা গেছে তা হোল— ধনরত্ন, মণি মাণিক্য, সোনা ও রুপোর জিনিসপত্রের জন্য বড় সাইজের ত্রিশটি নৌকা ভর্তি সামগ্রী। সেই বিখ্যাত লর্ড ব্যারন কর্নেল ক্লাইভ দেশে ফিরে গিয়ে হলেন এক বিরাট মামলার আসামী— অপরাধটা শোষণের নয়, যা এনেছিলেন তার থেকে বৃটিশ সরকারকে যা দেবার কথা ছিল তা তিনি

দেননি যথাযথ। আসামী হওয়ার অপমানে ও ক্ষোভে এই বীর [?] নেতা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন।

মিঃ হেস্টিংস [Warren Hastings] জন্মগ্রহণ করেন ১৭৩২ সালে। তাঁকেও শাসন শোষণের ট্রেনিং দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরাণী করে পাঠানো হয়েছিল ভারতবর্ষে। ভারতে এসে দানবীয় পদ্ধতিতে ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের রোলার চালিয়ে কোম্পানি তথা বৃটিশ সরকারকে মুগ্ধ করেন তিনি। পাওনা হিসাবে পেয়ে যান সারা ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদ। দেশীয় নেতাদের সহযোগিতায় রাজা চৈত সিংয়ের বাড়িতে বিশেষ করে তাঁদের মহিলাদের উপর অশ্লীল ও সীমাহীন অত্যাচার করেছিলেন তিনি। আর অযোধ্যার বেগম ও তাঁর বাড়ির মহিলাদের প্রতিও যথেচ্ছ অত্যাচার করে তিনি চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সরকারকে। তাঁর সময়ে ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও চিফ জাস্টিসের পদ গঠিত হয়। এঁর সময়েই তৈরি হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি।

ওয়ারেন হেস্টিংস

যাইহোক হেস্টিংসের আমলেই মুদ্রণ যন্ত্রেরও প্রচলন হয় এই দেশে। মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রভাব সৃষ্টি করা। এত করেও হেস্টিংসের দুর্নামে সোচ্চার হয়ে উঠলো ভারতবর্ষ। সদাশয় ইংরেজ সরকার সুবিচারের নামে তাঁকে সসম্মানে ইংলন্ডে ডেকে নিয়ে আরম্ভ করলো তাঁর অত্যাচারের বিচার। বৃটিশের মহামান্য বিচারকদের সুবিচারে তিনি প্রমাণিত হলেন একেবারে নির্দোষ। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮১৮-তে।

ইলাইজা ইম্পে [Sir Impay Elijah] জন্ম নেন ১৭৩২ সালে। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি করে। নিম্ন আদালত থেকে আসা বিচারগুলো তাঁর কাছে এসেই শেষ হোত অবিলম্বে। সুতরাং ভারতের বৃটিশ বিরোধী ব্যক্তি বা বিপ্লবীদের, বিশেষ করে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে এই রকম আসামীদের, কেমন করে যাবজ্জীবন ও ফাঁসি দেওয়া যায় সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ বিচারক। অনেক ফাঁসির রায়প্রাপ্ত আসামীকে বাহ্যতঃ করুণা প্রদর্শন করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতেন। অবশ্য কারাগারে তাদের মৃত্যুই ঘটানো হোত আর রটিয়ে দেওয়া হোত

হৃদরোগের মৃত্যু বলে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে ফাঁসির দন্ড দিয়েছিলেন ঐ বিচারপতি মিঃ ইম্পে। অথচ সত্যিকথা এটাই, যে অভিযোগে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল সেই অভিযোগটি ছিল মিথ্যা। ঐ ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের ফাঁসির পর বহু হিন্দুর ইংরেজ প্রীতিতে ভাটা সৃষ্টি হয়। বিলেত থেকে খবর এল তাঁকেদেশে ফিরে যেতে হবে, তাঁর বিচার হবে সেখানে। আমাদের ভারতের রাজা, মহারাজা, জমিদার, এমনকি অনেক আশ্রমের সাধুজীরা বিলেতে গাদা গাদা চিঠি লিখলেন যাতে ন্যায়াধিরাজ মহান বিচারপতির শাস্তি না হয়। আর তাই ইংরেজ শাসক মিঃ ইম্পেকে ভূষিত করেছিলেন 'স্যার' উপাধিতে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চলে যান পৃথিবী থেকে।

মিঃ এডোয়ার্ড গিবন [Edward Gibbon] ১৭৩৭ সালে জন্মেছিলেন এবং মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯৪-এ। ইংরেজ সরকারকে তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি ঐতিহাসিক শ্রেণী সৃষ্টি করতে হয়েছিল এবং কর্মকান্ড এমন ছিল যেন তারাই নিয়েছিল সারা পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস লেখার এজেন্সি। ইনিও ইংরেজ প্রচারিত সেইরকম একজন বড় মাপের ঐতিহাসিক। তাঁর সৃষ্ট অনেক ইতিহাসের মধ্যে যেটাকে বিশ্ববিখ্যাত বলে চালানো হয় সেটা হচ্ছে — Decline and Fall of the Roman Empire।

মিঃ লর্ড কর্নওয়ালিশ [Lord Cornwallis] জন্মগ্রহণ করেন ১৭৩৮ সালে। ভারতের গভর্নর জেনারেল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন ১৭৮৬ তে। ১৭৯৩ এ তিনি করেছিলেন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার প্রচলন। ঐ সর্বনেশে প্রথা জমির প্রকৃত মালিককে বঞ্চিত করে নিষ্ঠুরভাবে তার পরিবর্তে জমির নতুন মালিক হয়ে বসেন রাজা মহারাজা বাবু সমাজের বিরাট এক সুবিধাভোগী দল। তাঁর শাসনকালেই হয়েছিল মহীশূর যুদ্ধ। বুদ্ধি ও যোগ্যতায় তিনি আর একবার ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল তাঁর পরলোকগমন।

Cornwallis

কর্ণওয়ালিশ

মিঃ উইলিয়ম জোন্স [Sir William Jones] ১৭৪৬ এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৩ তে তিনি হয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক। পূর্বে হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় যে এশিয়াটিক সোসাইটির কথা বলা হয়েছে তার

জন্মদাতা এই জোন্স সাহেব। ভারতে একটি হিন্দু বুদ্ধিজীবী তাবেদার শ্রেণী তৈরি করতে এবং হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিতে পৃথিবীর 'প্রাচীনতম' 'হিন্দুজাতি', 'হিন্দু সংস্কৃতি', 'বেদ', 'বেদান্ত', 'গীতা', 'উপনিষদ', 'সংস্কৃত' 'ব্রাহ্মী' - 'প্রাকৃত' - 'ল্যাটিন' - 'অবহট্ট' প্রভৃতি নানা ভাষার গবেষণাগার এবং সেইসঙ্গে 'প্রাচীন যুগের পুঁথি', 'তালপত্র', 'মুদ্রা', 'শিলালিপি' প্রভৃতি 'সংরক্ষণে'র জন্য তৈরি করা হয়েছিল এক বিরাট চক্রান্তপূর্ণ কারখানা— যেটির নাম এশিয়াটিক সোসাইটি। এই এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু এটা ছিল লন্ডনের মূল কেন্দ্রের শাখা মাত্র। এই এশিয়াটিক সোসাইটি নামক 'কারখানা'টি এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির হাতে ছিল। তাতে প্রথমদিকে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলেন না, কেননা সেইসময় এমন অনেক কিছু 'সৃষ্টি' করা হচ্ছিল যা ভারতীয়দের সম্মুখে হলে চক্রান্ত প্রকাশ হবার সম্ভবনা ছিল। এই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিঃ জোন্স। ঐ পদটিতে আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা নিয়ে গবেষণা করার অনুশীলন অথবা প্রহসন সৃষ্টি করেন। তিনি ভারতের 'তথা পৃথিবীর' নানা প্রান্ত হতে তাঁদের নির্ধারিত পন্ডিতদের কাছ থেকে পাওয়া ও সৃষ্টি করা সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্য অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়েছিলেন বিরাট পরিকল্পনার মাধ্যমে। তারপর বিচারপতি মিঃ জোন্স নিজেও ঐতিহাসিক সেজে বসলেন রাতারাতি। এবং রচনা করলেন এক গ্রন্থ যাতে ভারতের চাপা পড়া সভ্যতা, চাপা পড়া ভাষা, চাপা পড়া সংস্কৃতিএবং চাপা পড়া অনেক ইতিহাস উপড়ে নিয়ে এলেন একেবারে পাতাল থেকে। গ্রন্থটির নাম দিলেন এশিয়াটিক রিসার্চেস [Asiatic Researches]। তাতে দেখানো হোল ভারতীয় হিন্দুদের ছিল পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা, ছিল প্রাচীন কলেজ, ইউনিভারসিটি, ছিল রাজাদের উন্নতমানের রাজনীতি, ছিল তাঁদের বিজ্ঞানময় শিল্প, ছিল সর্বোন্নত সঙ্গীত সাধনা, ছিল উন্নত মানের বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য প্রণালী, ছিল উঁচুমানের নাট্য সংস্থা আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ছিল ভারতীয়দের সার্বজনীন ধর্ম ও বিশ্বসেরা দর্শন। ভারতের উদীয়মান ভদ্র 'বাবু' সমাজের অবাক বিস্ময়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়নি যে, ভগবানকে ধন্যবাদ! তাদের সবই ছিল! এখন কিছুই নেই! সব নষ্ট করে দিয়েছে বিদেশীরা বা মুসলমানেরা! স্যার জোন্স ও তাঁর দলবল অনেক আকুল ব্যাকুল হয়ে 'হিন্দু'জাতির হিতার্থে বড় শ্রম করে পুনরুদ্ধার করেছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া সবকিছু! কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করে উদ্ভুত উদীয়মান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। যেমন 'শকুন্তলা', 'গীত গোবিন্দ', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি।

খৃষ্টাব্দ অনুযায়ী উইলিয়াম জোন্সের পর চার্লস উইলকিন্সের পরিবর্তে ম্যাক্সমূলারের আলোচনা করতে হচ্ছে বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই।

ম্যাক্সমূলার ঃ বিশ্বের বাছাই করা বুদ্ধিজীবীদের দশজনের একজন ছিলেন অধ্যাপক ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলার [১৮২৩-১৯০০]। আধুনিকবাদীদের মতে, ভারতের সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃতি ও নানা ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টির প্রধান স্রষ্টা এবং মহানায়ক এই মিঃ ম্যাক্সমূলার।

ম্যাক্সমূলার

বিশ্ববিখ্যাত ঐরকম কারিগর পঞ্চাশ বছর ধরে কোন বিষয়ের নাম করে যদি কিছু সৃষ্টি করেন, তারসঙ্গে ইংলণ্ড সরকার যদি সহায়তা করে, সেইসঙ্গে যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলো তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় তার ফলাফল কী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা মোটেই। পণ্ডিতগণ যাই-ই বলুন না কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,'' জানো কি অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার 'নাইন্টিন সেঞ্চুরি' কাগজে একটা লেখা লিখেছেন শ্রী রামকৃষ্ণকে নিয়ে। প্রয়োজনীয় উপকরণ পেলে তিনি সানন্দে তাঁর জীবনী ও বাণী সমেত একটা বই লেখবার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার এক অসাধারণ মানুষ। কদিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আসলে আমি গেছিলাম তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে। ...ম্যাক্সম্যুলার যেন সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি। ...যে যুগে বাস করতেন ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এবং মহৎ বাণপ্রস্থপ্রার্থী মানুষেরা—যে যুগ অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠাদির যুগ। ম্যাক্সম্যুলার ঐ যুগের ঋষিদের চিন্তারাজির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জগতের,ভারতের সেই প্রাচীন যুগের প্রতি মানুষের বিরোধ ও ঘৃণা দূর করেছেন এবং পরম শ্রদ্ধায় দীর্ঘকাল ধরে দুঃসাধ্য কাজে নিবেদিত প্রাণ।......

পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে তিনি বিশ্বে আলোড়ন এনেছেন ঠিকই তবু তাঁর বিদ্যা ও দর্শন তাঁকে ক্রমিক উর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে চৈতন্যসত্ত্বার স্পর্শ দিয়েছে। ভারতের ওপর অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলারের যে অপার অনুরাগ তার শতাংশের একাংশও যদি আমার থাকতো তাহলে আমি ধন্য হোতাম। এই অনন্য মানবাত্মা পঞ্চাশ বছরের ওপর ভারতীয় চিন্তারাজ্যে কাটিয়েছেন, একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতায় তিনি গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত অরণ্যভূমির আলো ও ছায়ার বিনিময়... তিনি এক পরম বৈদান্তিক.... তিনি ছিলেন এই প্রাচীন তত্ত্বের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি, সনাতন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও আগামীকালের ভারতের অগ্রদূত। তাঁর মধ্যে দিয়েই সমস্ত জাতি আধ্যাত্মিক আলো লাভ করবে।.... অথচ কোথা থেকে এসে জুড়ে বসল এই সংস্কৃত! বেশির ভাগ পশ্চিমী পণ্ডিত তখন এর নামও শোনেন নি।... তবে ভারতের এবং ভারতীয় চিন্তাভাবনার সবচেয়ে বড় বন্ধু হলেন পল ডয়সেন (কিংবা নিজেকে তিনি যেমন সংস্কৃতে দেবসেনা বলেন) এবং প্রবীণ ম্যাক্সম্যুলার.... আনন্দের কথা হল ইওরোপে সম্প্রতি একদল নতুন ধরণের সংস্কৃত পণ্ডিত দেখা যাচ্ছে--- যাঁরা শ্রদ্ধাবান সমমর্মী এবং প্রকৃত জ্ঞানী। আর আমাদের ম্যাক্সম্যুলারই ঐ পুরনো এবং নতুন দলের সংযোজক। আমরা হিন্দুরা সংস্কৃতজ্ঞ অন্যান্য পণ্ডিতের চেয়ে তাঁর কাছেই বেশি ঋণী।.... আর একবার এঁর সম্বন্ধে ভেবে দেখ। প্রাচীন হস্তলিপির সেইসব পুঁথি যা হিন্দুদের চোখেও অস্পষ্ট; তিনি তাই ঘেঁটে চলেছেন দিনরাত। সেই পুঁথি এমন এক ভাষায় লেখা যে সেটা আয়ত্ত করতে একজন ভারতীয়রও সারাজীবন লেগে যায়।.... এবং বহু কাল ধরে এই প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি বৈদিক সাহিত্যের অরণ্যের মধ্যে দিয়ে অন্যের এগোবার মত সহজপথ তৈরি করে দিতে পেরেছেন।... ম্যাক্সম্যুলারকে যদি বলি এইসব আন্দোলনের প্রবীণ অগ্রদূত, তবে পল ডয়সেন অবশ্যই তাঁর এক নবীন পতাকাবাহক।'' [দ্রষ্টব্য বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র, পৃষ্ঠা ৬২০-৬২২]

আশ্চর্যের কথা এটাই, এই খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলারের জন্মভূমি জার্মানী হলেও সারা জীবনের কর্মভূমি ছিল ইংলণ্ড। ভারতবর্ষের মাটিতে একদিনের জন্যও না এসে বৃটিশের আদেশে ইংলণ্ড থেকেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতায় ভারতের জন্য সৃষ্টি করে দিলেন সংস্কৃত সভ্যতার নতুন এক বিরাট বেলুন।

যে সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁর প্রদর্শিত পথকে আরো মজবুত করতে জ্ঞানবুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য যোগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন থাডান্স্ আনসেল্‌ম্ রিজনার, ফ্রেডারিক হ্যুগো, জে. ডি. লাঞ্জুইনে, আল্ ব্রেক্ত ওয়েবার, মিসেস চার্লস স্পীয়ার, ম্যাক্সকার্ল ভন ক্রেমপেল হিউবার, মিসেস্ চার্লট ম্যানিং, পল রেগনল্ড, আর্চিবাল্ড গাফ, হার্মান ওল্ডেনবার্গ, লিওপল্ড ভন শ্রেডার, চার্লস রকওয়েল লানমান [হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক], লিপজিগের রিচার্ড গার্ব, হার্বার্ট বেনেস [ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়], ই. ডবলিউ. হপ্‌কিন্স, অ্যানি বেসান্ত, আলফ্রেড গোডেন, হার্ভে গ্রীস ওলড, আর্থার ম্যাকডোনেল, হার্ভার্ডের জেসিয়া রয়েস,আর্থার ইউইং মরিস ব্লুফিল্ড, পল্ এলমার মোর, আর. গর্ডন উইলবার্ণ, জে.এস. স্পেয়ার, আর. ডবলিউ. ফ্রেজার,

নিকল ম্যাকনিকল, জেমস প্রাট, ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন, হেনরিক লুডার্স, ডরোথি জেন স্টিফেন, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, জর্জ উইলিয়াম ব্রাউন, বেটি হাইম্যান, ফ্রেডারিক হেলার প্রমুখ। আধুনিক গবেষকদের মতে, বেদ বৃটিশের চক্রান্তের সৃষ্টি---একথা সত্য হতে হলে এবং বৃটিশ সরকার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থব্যয় করেছে এটা প্রমাণ করতে হলে বিপক্ষীয় পণ্ডিতদের তুলনায় পক্ষীয় পণ্ডিতদের মন্তব্যই বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র ১৩৯ পৃষ্ঠায় আছে—''ম্যাক্সমূলারের সম্পাদিত ঋগ্বেদ তখন ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। স্বামীজী প্রসঙ্গতঃ বলেন, 'মনে হোল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলার রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার আনেকদিন হতেই ঐ ধারণা।...জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি,— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল? তাতেও কুলোয়নি। এদেশের [ভারতের] শত শত বৈদিক পন্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশের এ যুগের.কেউ কি কখনো দেখেছে? ম্যাক্সমূলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসরকাল কেবল ম্যানাসক্রিপ্ট লিখেছেন। তারপর ছাপাতে ২০বৎসর লেগেছে। ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে-পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ, সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!'[দ্রষ্টব্য স্বামী-শিষ্য সংবাদ]''

শ্রীমতী শোভা চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় 'প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা ' বইটি একটি মূল্যবান গবেষণা সম্ভার। এটি কলকাতায় প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে। তাতে লেখক শ্রী বি.আর্য লিখেছেন ঃ '' যদিও ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ 'ইতিহাস' গুরুত্ব দিয়েই পড়ানো হয়— যদিও দেশী-বিদেশী দিকপাল সব ঐতিহাসিক প্রচন্ড পরিশ্রম স্বীকার করেই ঐ ইতিহাস লিখেছেন তবু বলব ওটা ইতিহাসই নয়— বানানো গল্প।... ঐ ইতিহাস তৈরীর পেছনে যে কি বিরাট চক্রান্ত কাজ করেছিল তার হদিস পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের ইতিহাসের কাঁচামাল বলে যা শেখানো হয় তা হচ্ছে পুরনো পুঁথি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।... পুঁথি লেখার এমন কোন উপকরণ হয় না যা দীর্ঘ দু-তিন হাজার বছর অক্ষয় অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে। শিলালিপিও দু-তিন হাজার বছর অক্ষত থাকার কথা নয়। থাকার কথা নয় তাম্র ফলকেরও। কারণ সে যুগের তামা থাকার প্রশ্নটাই ছিল আজগুবি। ... ঐ ধরণের

সন্দেহজনক 'প্রত্নলেখ' সমন্বিত কাঁচামাল সংগ্রহ করতেন কারা? কারাই বা ঐ সমস্ত নিদর্শনের ফটো তুলে বিপুলায়তন বই লেখার আয়োজন করতেন? সন্দেহজনক ঐ কাজকর্ম চালিয়ে যাবার টাকা পয়সা আসত কোত্থেকে? টাকা যোগাতেন বৃটিশ সরকার। কিন্তু কেন? কোন মহান উদ্দেশ্য কি ঐ কাজের পিছনে ছিল? বিপুলায়তন ঐ বইয়ের নামটাই বা কি? [বইটি হল] এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা।

এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকার বিপুলায়তন খন্ডগুলোর গুরুত্ব ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হিসাবে সবচেয়ে বেশি। ওগুলো নাকি ইতিহাসের বেদ। বেদের মতই পবিত্র— বেদের মতই প্রামাণ্য। এপিগ্রাফিয়ার ওপর নির্ভর করেই ইতিহাস রচিত হয়। দেশি বিদেশি সব গবেষককে ঐ 'মহাভারত' থেকেই মালমশলা যোগাড় করে নিতে হয়। ওর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আর ওই বইয়ের তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ করাটা রীতিবিরুদ্ধ। এবং রীতিবিরুদ্ধ বলেই পন্ডিতেরা অম্লান বদনে ঐ আকর গ্রন্থের সবকিছুই বিশ্বাস করে বসেন। ... ঐ এপিগ্রাফিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকতেন তাঁরা দিকপাল পন্ডিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করতেন। তাঁদের পান্ডিত্যের গভীরতা নাকি প্রশ্নাতীত ছিল। এবং প্রশ্নাতীত ছিল বলেই কিনা জানিনা তাঁদের মধ্যে অনেক রায়বাহাদুরের সন্ধান মিলছে। বলে রাখা ভাল ঐ খেতাবটা বৃটিশ সরকারের নানা অভিসন্ধির সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোকেরাই পেতেন। এছাড়া জড়িত থাকতেন নামি দামি আই. সি. এস. আমলারা। ভাবতে অবাক লাগে, এই সব আমলারা একদিকে শাসনের নামে শোষণের ষ্টীম রোলার চালাতেন। অন্যদিকে আমাদের উজ্জ্বল অতীতের সুমহান ঐতিহ্যের ছবি নিরলসভাবে এঁকে যেতেন। আরও মজার কথা ঐ সব জেনারালিষ্টরা (পল্লবগ্রাহী) অবলীলায় আর্কিওলজির 'স্পেশালিষ্ট' সেজে বসতেন। ... একদা প্রশাসক পরবর্তীকালে ভোল পাল্টে প্রত্নতাত্ত্বিক সেজে বসা পন্ডিতদের কেউ সনাক্ত করতে পারেন নি এটাই আশ্চর্যের ।... শুধু এই কথাটুকুই বলব প্রাচীন শিলালিপির বেশিরভাগ শিলালিপিতে এমন সব লিপি ব্যবহার করা হয়েছিল যে সব লিপির অস্তিত্বই ছিলনা। ... একটি শিলালিপিতে 'কুঞ্জরাঘটাবর্ষেণ' নামক একটি উদ্ভট শব্দ পাওয়া গেল। কিছু পন্ডিত ধাঁধার জট খুলে জানালেন, ওটা ৮৮৮ শকাব্দ না হয়ে যায় না। সবাই সে তথ্য মানবেন কেন? পন্ডিতেরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল বললেন হ্যাঁ ওটা অকাট্য ৮৮৮ শকাব্দ ত। আর একদল বললেন না, তা হতেই পারে না। মক ফাইট চলল। একদলে ছিলেন রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পন্ডিত—অন্যদলে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পন্ডিতেরা। ব্যাপারটা কি ? উভয় শিবিরের তাবৎ পন্ডিতই ছিলেন ভাড়াটে।...কোথাও 'অমুক রাজার রাজত্বের এততম বর্ষ'— কোথাও আবার শকাব্দ বা অমুকাব্দ খোদাই করে রাখারও ব্যবস্থা থাকত। শুধু

সাল তারিখ বানিয়ে রেখেই মিথ্যার কারবারীরা ক্ষান্ত হতেন না। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু তথ্য তাঁরা সরবরাহ করতেন। অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে তিথি বা নক্ষত্রের বিবরণও দেওয়া হত। সংক্রান্তি বা গ্রহণের খবরও বাদ পড়ত না। ... শিলালিপি , তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থে 'শকাব্দ' শব্দের ভুরিভুরি প্রয়োগ হয়েছে। গোলমাল যে ঐ শব্দটিকে ঘিরেই রয়েছে। শক বলে কোনও জাতি যে ছিলই না। দুনিয়ার ইতিহাস বানাতে গিয়ে অনেক কল্পিত জাতির অস্তিত্বের গল্প বানাতে হয়েছিল। শক সেই রকমই একটি 'জাতি'। :.. সে যাইহোক, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর আরও কিছু উপকরণ ঐ তাম্রশাসনে থাকত। দাতার ঊর্ধতন তিন পুরুষের নাম এবং কর্মকান্ডের ফিরিস্তি, গ্রহীতার নাড়ীনক্ষত্র, গোত্র পরিচয় তথা তস্য সমসংখ্যক পুরুষের নামধাম 'লেখার' ব্যবস্থা রাখা হোত ঐ 'শাসনে'। ... ক্রাউন সাইজের পাইকা হরফের চারপাতা তামিল বয়ান খোদাই করার জন্য যুদ্ধকেশরী পেরুমবানাইক্করণ পেয়েছিলেন একটি আস্ত বাড়ী, দু 'মা' জলা জমি আর দু 'মা' শুখা জমি। ... তামিলভাষী অঞ্চলে যে সুদূর অতীতেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এই প্রচন্ড মিথ্যাটাও জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল কল্পিত শিল্পীর নামকরণের বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে। আধা-সংস্কৃত আধা-তামিল নামটা বেশ ভালোই বানানো হয়েছিল। উৎস : Tamil Epigraphy গ্রন্থের Select Inscriptions নিবন্ধ। গ্রন্থের লেখক এন. সুব্রাহ্মনিয়াম এবং আর. ভেঙ্কটরামন।

ভারতবর্ষের আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের অফিসটাকে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল কেন? ফ্রান্সের পন্ডিত, জার্মানীর পন্ডিত, নরওয়ের পণ্ডিত—সবই ছিল ঐ সার্ভের অফিসে। ... হুল্ট্‌স , ফুয়েরের, বুহ্‌লার , স্টেনকনো কত নাম করব? বুঝতে কষ্ট হয়না অবিমিশ্র মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে ঐ সব বিদেশী পন্ডিতের নাম জড়ানোর খেলাটা পরিকল্পিতভাবেই খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের মিথ্যার চক্রীরা। ...বেদ-উপনিষদ-পুরাণ যে অত্যন্ত প্রাচীনকালে সুপ্রচলিত ছিল—তথাকথিত চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা যে সুদূর অতীতেই—ভারতে শুরু হয়েছিল— তথাকথিত চতুরাশ্রমের ফরমুলা যে অতীতে হিন্দুরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন— হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-আজীবক নানান ধর্মের জয়জয়কার যে প্রাচীন কালে ভারতে ঘটেছিল— এসব তথ্য বেশ পরিকল্পিতভাবেই রাখা হয়েছিল ঐ এপিগ্রাফিয়ায়। ...আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হিসাবে ওঁরা সবাই একযোগেই প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যাটাকে বানিয়েছিলেন। মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অস্তিত্বহীন বেদের পুঁথির ওপর নির্ভর করে ফরাসী পন্ডিত বুর্নু বা জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমূলারের 'গবেষণা' করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। ... প্রাচীন মুদ্রা কি সত্যিই প্রাচীন? ওগুলো কি সত্যিই মুদ্রা ? ... কিছু বেঢপ সাইজের সোনা বা রুপোর বা তামার চাকতির ওপর অস্পষ্ট কিছু ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী হরফ আর কল্পিত সংবতের

কিংবা অমুকাব্দের একটা সংখ্যা কিংবা বিচিত্র কিছু প্রতীকের ছাপ থাকলেই প্রাচীন বলে মনে করে নেওয়া যায় না। যায়না কারণ মূলেই গোলমাল। ব্রাহ্মী বা খারোষ্ঠী লিপির অস্তিত্বই ভারতে ছিল না। বলা বাহুল্য, ঐ সব মুদ্রা মিথ্যার চক্রীদেরই তৈরী করে নেওয়া। ...কল্পিত রাজারাজড়ার রাজ্যজয়ের গল্পগুলোকে ইতিহাস বলে চালাতে ঐ সব 'মুদ্রা' যে যথেষ্ট কাজে লেগেছিল এটা মানতেই হয়। ... রাষ্ট্র মহাফেজখানা পুষে রাখে আর ঐ মহাফেজখানাকে জালচিঠির এবং জাল লেখার আড়ৎ বানানো হয়। 'বার্নার্ড শ বা রবীন্দ্রনাথের লেখা' জাল চিঠিও ওখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। আর ঐ সার্ভের ওপরেই থাকে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার সোল এজেন্সী। মিথ্যা তৈরী হয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে। সে মিথ্যা কাকপক্ষী টের পাবে এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়না। নিশ্ছিদ্র নিখুঁত সব আয়োজন । ... রাষ্ট্রের হাতে থাকে ইন্টেলিজেন্স। অপূর্ব গোপনতা রক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা থাকে ঐ ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্মে। ইন্টেলিজেন্সের তৈরী করা মিথ্ এবং মিথ্যা বেঁচে থাকে ।... সিদ্ধান্ত নিতেই হয় বেশ কিছু রাষ্ট্রের 'ইন্টেলিজেন্স' বিভাগের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সমঝোতা আছে। এবং সমঝোতা আছে বলেই ক-রাষ্ট্র খ-রাষ্ট্রের মিথ্যা ফাঁস করেনা— খ-রাষ্ট্রও ক-রাষ্ট্রের মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার পরোক্ষ উদ্যোগ নেয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে। মিথ্যাটা কালক্রমে ইতিহাস হয়ে বসে।''

'ফা হিয়েন'— এর কর্মকান্ড সম্পর্কে কমিউনিস্ট চীনেও গবেষণা হয়। 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' সম্পর্কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পন্ডিতও মাথা ঘামান। অস্তিত্বহীন 'ফা হিয়েন' বেঁচে থাকেন সগৌরবে— 'কৌটিল্য' নামক কল্পিত চরিত্রও জীবন্ত হয়ে ওঠে। সোনার প্রাচীন প্রচলনের গল্প সোভিয়েত রাশিয়ার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের তরফ থেকেও বানিয়ে নেওয়া হয়। ... গ্রীসের ইতিহাস গ্রীসের পন্ডিত লেখেন নি। ঈজিপ্টের ইতিহাস ঈজিপ্টের পন্ডিত লেখেননি। অ্যাসিরিয়া , ব্যাবিলোনিয়া, ভারত, চীন কোনও দেশেরই ইতিহাস সে দেশের পন্ডিত লেখেন নি। লিখেছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসের স্রষ্টা ঐ ইউরোপ। জার্মানীর পন্ডিত গ্রীসে ঘুরে আসতেন। ফ্রান্সের পন্ডিত ঈজিপ্টে ।ইংল্যান্ডের পন্ডিত ভারতবর্ষে। 'সুসভ্য' সব দেশেই এঁদের সকলের যাতায়াত ছিল স্বচ্ছন্দ অবারিত। গ্রীসের 'ইতিহাস' লেখার পন্ডিত করিতকর্মার পরিচয় দিয়ে 'ডিউটি' পেতেন ভারতে। একটা আন্তর্জাতিক চক্র গড়ে উঠেছিল । ... স্থানীয় পন্ডিতদের সহযোগিতা ছাড়া ঐ কাঁচামালের পাহাড় যে তৈরী হতেই পারতনা এটা বলাই বাহুল্য। পরিপূর্ণ গোপনতার মধ্যেই কাজকর্ম চলত। কাকপক্ষী টের পেতনা এমনই ছিল সে গোপনতা। ... উভয় দলের পন্ডিতদের কেউ কেউ পরম কারুণিক ব্রিটিশ সরকারের 'স্যার' খেতাব কুড়িয়েছেন। কেউ রায়বাহাদুর— কেউ বা মহামহোপাধ্যায়। ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা

ইতিহাস লেখার আগেই কিছু 'তত্ত্ব' (অর্থাৎ মিথ্যা) তৈরী করে নিয়েছিলেন। পরে ঐ 'তত্ত্বে'র সঙ্গে মিলিয়ে কিছু 'তথ্য' বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ 'তথ্যে'র নাম প্রাচীন ইতিহাস। ... ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি বিভ্রান্তিকর মিথ্যাকে ভারত ইতিহাসের মূল সত্য হিসাবে তুলে ধরলেন। এক, হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং সুসংহত একটি ধর্ম। দুই, ঐ ধর্মের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাটাও সমপরিমাণে সুপ্রাচীন। তিন, হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা শুধু প্রাচীনই নয়—গৌরবোজ্জ্বল অতীতেরও অধিকারী। চার, সর্বভারতীয় মানসিকতার ঐক্যবোধ বেশ মজবুত এবং প্রাচীনও বটে। পাঁচ, হিন্দুধর্মের এবং সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণ-যুগ অতীতে শেষ হয়ে গিয়েছে—পরে দুটিরই অবক্ষয় শুরু। ছয়, ভারত সংস্কৃতির মূল উপাদান ধর্ম। এই ক'টি মিথ্যার সঙ্গে আর এক মোক্ষম মিথ্যা 'আর্যতত্ত্ব' জুড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাস 'তৈরী করার' কর্মকান্ড শুরু করলেন। আর্যতত্ত্বটাকে ভারতের ঐতিহসিকেরা লুফে নিলেন। হিন্দু ঐতিহ্যবাদীদের মহা আনন্দের দিন এসে গেল— রাতারাতি তাঁরা আর্যহিন্দু হয়ে গেলেন। ধর্মের সোনায় আর্যের সোহাগা মিশল। আর্য 'জাতি', সংস্কৃত 'ভাষা' এবং হিন্দু 'ধর্ম'— এই ত্রিতত্ত্বের ত্রিবেণী সংগমে স্নান করে ভারতের ঐতিহাসিকেরা তিনের মহিমাকীর্তনে উঠে পড়ে লাগলেন।"

"শ্বেত দ্বৈপায়ন 'বস' (boss) ভারতে এসে হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। 'বস' মানে arrenger, ব্যাস মানেও তাই। ... ধুরন্ধর মিঃ 'বস' সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। ... রাজ্যের ধর্মপুস্তক লেখানোর ব্যবস্থা হল। উদ্ভট উদ্ভট নামের মুনী ঋষিদের লেখা বলে ওগুলোকে চালানো হল। ষড়দর্শন [ষড়যন্ত্রের আর এক নাম] বানিয়ে নেওয়া হল। বিদিগিচ্ছিরি সব নামের 'দার্শনিক'দের লেখা বলে ওগুলোকে প্রচার করা হল। মহাভারত আর আঠারো দুগুণে ছত্রিশ খানা পুরাণ [এছাড়া আরও কয়েকটি বইও ছিল] লেখানোর ব্যবস্থা করে নিজের নামেই চালিয়ে দিলেন ব্যাসীভূত'বস'। ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য, শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণের বন্যা বয়ে গেল। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বলে প্রচারিত বইগুলোর ওপর পবিত্রতা ও প্রাচীনত্বের বহর চাপানো হল। ...দেড়হাজার বছরের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখানোর কাজে হাজার দেড়েক ইউরোপীয় 'ঐতিহাসিক' কে আসরে নামানো হল। জার্মান,ফরাসী, হাঙ্গেরীয়, ইটালীয়, পোলিশ, রুশীয়— ইউরোপের প্রায় সব জাতের পন্ডিতদের ডাকা হল ঐ কর্মযজ্ঞে। ... রামায়ণ লেখানো হল।"

"ব্রাহ্মী লিপির নামকরণের প্রশংসাই করতে হয়। দেবলোকের বাসিন্দা ব্রহ্মার নাম জড়িয়ে লিপির নামকরণের খেলাটা বেশ ভালই খেলা হয়েছিল। লিপিটা নাকি স্বয়ং ব্রহ্মাই বানিয়েছিলেন। ... ব্রহ্মা শব্দটির সঙ্গে ভারতের অধিবাসীদের পরিচয়ই ছিল না।

শব্দটির উদ্ভট ব্যৎপত্তির বহর বানিয়ে নিলেও বুঝতে কষ্ট হয়না ঐ ব্রহ্মার নাম করা হয়েছিল সেমেটিক কল্পিত 'আদিপুরুষ' আব্রাহাম শব্দ থেকে। ... লিপির ক্রমবিবর্তনের তত্ত্বটা বেশ সুন্দর কায়দায় উপস্থিত করা হয়েছিল। যে উর্বর মস্তিষ্ক থেকে সুপ্রাচীন ঐ ব্রাহ্মীলিপির জন্ম হয়েছিল সেই মস্তিষ্ক থেকেই বিবর্তনের ক্রমনির্দেশও তৈরী হয়ে গেল। লিপির হাত পা গজালো। প্রয়োজনের তাগিদে ঐ হাত-পা বিচিত্র কায়দায় ছোট বা বড় হল কিংবা লুপ্ত হল। কোথাও বা বিচিত্রতর কায়দায় রেখা বঙ্কিম রূপ পেল। ... লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লিপির ক্রমবিকাশের এই ম্যাজিকটা কিন্তু বাইরের কোন নিরপেক্ষ পন্ডিত দেখালেন না। দেখালেন মিথ্যার চক্রীরা। আরও পরিষ্কার করে বলি। প্রচন্ড মিথ্যার ধারকবাহক ঐ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পোষ্য পন্ডিতেরাই ঐ ম্যাজিকটা দেখালেন। এক পন্ডিতের নাম পাচ্ছি। রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। ভদ্রলোক পান্ডিত্যের জোরে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন, না অন্য কোন কারণে তা বলার দরকার আছে কি?"

লিপির নমুনা

"ফিনিশীয়রা নাকি ভারতবাসীদের লিপিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন। ভারতের মানুষ আরবে যেতেন ব্যবসা করতে। আর ওখান থেকেই নাকি লিপির আমদানি। ... রোমক লিপি চুরি করে ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী লিপির 'জন্মে'র ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন তাঁরাই মধ্যপ্রাচ্যের 'প্রাচীন' ভাষার লিপির জন্ম দিয়েছিলেন গ্রীক লিপির পরিকল্পিত বিকৃতির আয়োজন করে। ... এক জায়গায় 'ইয়েখিমিস্ক' লিপির সন্ধান পাওয়া গেল বলে প্রচার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক সাল তারিখ চাপিয়ে দেওয়া হল। চার্ট তৈরি করাই থাকে। ... ব্রাহ্মী নামক জাললিপির আধুনিক কারিগরেরা সহজ সরল লিপি বানাতে গিয়ে বারোআনি অংশ ঐ রোমক আর গ্রীক লিপি থেকে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ... ম্যাকডোনাল সাহেব ব্রাহ্মী লিপির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে একটি তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'This [Brahmi] is the alphabet which is recognised in Panini's great Sanskrit grammar of about the 4th century B.C. and has remained unmodified ever since.'
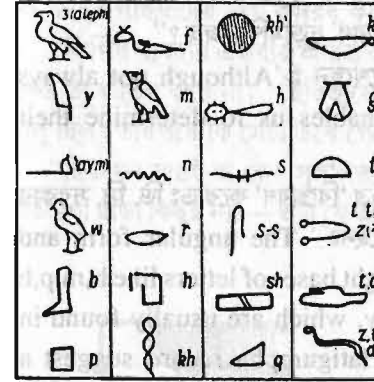
পাণিনি তাঁর ব্যাকরণটা কোন্ লিপিতে লিখেছিলেন? ওটা কি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা হয়েছিল? ইতিহাসে সেরকম কোনও তথ্য পাচ্ছিনা।... লিপি প্রবর্তনের আগে কি লিপিহীন ভাষায় ব্যাকরণ লেখা সম্ভব?... পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী'তে ব্রাহ্মীলিপিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি নাকি প্রাচীন কালের 'বৈয়াকরণ'। ইতিহাস বলছে তিনি নাকি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। আঠারো শতকে তৈরী করে নেওয়া তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির সন্ধান খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঐ পাণিনি মহাশয় পেলেন কি করে? তবে কি ব্রাহ্মীলিপির 'উদ্ভাবিত' হওয়ার পরে ঐ 'বৈয়াকরণ' চূড়ামণির জন্ম?"

" রমেশ চন্দ্র মজুমদার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ 'Although not always dated, the character of the script enables us to determine their approximate age'."

"হাতীগুম্ফা শিলালিপির অক্ষরের রূপবৈচিত্র 'বিশ্লেষণ' করে ডঃ ডি. সি. সরকার লিখেছেনঃ ' The angular form and straight bases of letters like b,m,p,h and y, which are usually found in the Hatigumpha record suggest a date not much earlier than the beginning of the first century A.D.'

m-n
m-s
sh-w
n-w
kh-n
w
kh
m
t-y

লিপির নমুনা

এই তথ্যটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ 'A certain similarity between the shape of the Brahmi letters and those of the oldest phoenician alphabet,both standing for the same of similar sounds gave considerable support to this theory.' মোটকথা ঐ খারোষ্ঠী লিপিতে রোমক লিপির নানান কায়দায় ২০টা অক্ষরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।... 'অ্যারোমেইক' লিপি থেকে খারোষ্ঠী লিপির 'বিবর্তন' সম্পর্কে পন্ডিতেরা কত গল্পই না বানিয়েছেন। সেসবই নেহাৎ পন্ডশ্রম। কারণ ঐ অ্যারোমেইক লিপির প্রচলন ছিলই না।... এসব প্রশ্নের উত্তর পন্ডিতেরা দেন নি। দেন নি কারণ মহান যীশুর মাতৃভাষা আরোমেইকের অস্তিত্বহীনতার গল্পটা যে তাহলে ধরা পড়ে যেত। 'অ্যারোমেইক' নামের কোনও ভাষা কস্মিনকালেও ছিল না।... কিঞ্চিৎ 'ইতিহাস'-মিশ্রিত ঐ বাইবেল দুনিয়ার
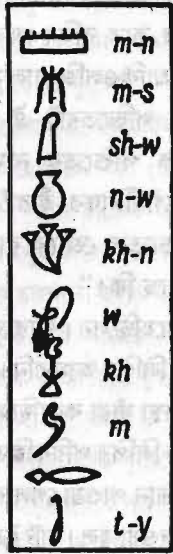
প্রাচীনতম পুরাণ—প্রাচীনতম ইতিহাস— প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ঐ পবিত্র গ্রন্থ দিয়েই মিথ্যার কারবারীদের হাতেখড়ি হয়েছিল।... তবে বুলার সাহেব একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছেন। ব্রাহ্মীলিপির সৃষ্টিটা যে 'বঢ়ে শ্রম্ সে নির্মাণ করণে কা কার্য ' এটা তিনি স্বীকার করেছেন। সত্যিই ত রোমক লিপির একুশটা, তামিলের দুটো, তেলেগুর তিনটে, উড়িয়ার একটা, নাগরীর পাঁচটা, গুরুমুখীর দুটো ও গুজরাতির একটা, গ্রীকলিপির পাঁচটা এবং আরবী-ফার্সী লিপির তিনটে অক্ষর চুরি করে 'লিপিমালা' তৈরী করে নিতে কি সাহেব পন্ডিতদের কম কসরৎ করতে হয়েছে?"

"লিপির ব্যবহার একবার আয়ত্ত করে —লিপির কার্যকারিতায় উপকৃত হয়ে — কেউ তা বাতিল করে না।... ইতিহাসে পাচ্ছি খরোষ্ঠী লিপি নাকি ৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপরে কি সেটা উবে গেল?"

"হিউয়েন সাঙই বা কে? সুললিত মিথ্যা বিস্তারের ঐ 'ললিত বিস্তার' যে একটি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়— ওটা যে আধুনিককালে লেখা একটা 'প্রাচীন' [?] বই এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।... ইতিহাসে পাচ্ছি হিউয়েন সাঙ্ নাকি ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কাটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'ভারতবাসীদের বর্ণমালার অক্ষর ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল আর ঐটারই রূপ [রূপান্তর] আগে থেকে এখনও চলে আসছে' [উৎস— প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা (হিন্দী)—লেখক গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা]"। "সিদ্ধান্ত নিতেই হচ্ছে হিউয়েন সাঙ্ নামের কোনও চীনা পর্যটক ভারতে আসেনই নি—ঐ চরিত্রটি মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া। ভারতীয় মিথ্যার অভারতীয় প্রমাণ রাখার ব্যবস্থা হিসাবেই ওই চরিত্রটি বানানো হয়েছিল। ঐ হিউয়েন সাঙ যদি সত্যিই ভারতে এসে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই জাল লিপি চালু থাকার গল্পটা তিনি বানাতেন না।... আঠারো কিংবা উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া ঐ দুটো জাললিপির কথা সপ্তম শতাব্দীর ঐ হিউয়েন সাঙের জানার প্রশ্নই ওঠে না।... ভাবতে অবাক লাগে আমাদের অশোক - চন্দ্রগুপ্ত - কনিষ্কদের ঐতিহাসিকত্ব নির্ভর করে ভুতুড়ে লিপিতে খোদাই করা ভুতুড়ে শিলালিপির ওপরেই।"

হিউয়েন সাঙ

"মোহেন-জো-দড়ো হরপ্পার তথাকথিত সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে ভারতের মানুষের গর্ববোধের শেষ নেই। ঐ 'সভ্যতার আবিষ্কার' এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার বয়স এক ধাক্কায় দেড়হাজার বছর বেড়ে গেল।... সিন্ধুসভ্যতার প্রত্ন উপকরণের মধ্যে দুর্বোধ্য লিপিযুক্ত সীলমোহর মূর্তিগত সাক্ষ্য প্রমাণ, রোজকার জীবনে কাজে লাগে এমন কিছু কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র—কিছু অস্ত্রশস্ত্র বা ধাতব পদার্থ যা কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যেই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব। সীলমোহর দিয়েই শুরু করা যাক। সীলমোহর কিছু কিছু পোড়া মাটির, কিছু নরম পাথরের তৈরী। তামা এবং ব্রোঞ্জের তৈরী সীলমোহরও কিছু পাওয়া গেছে।... লিপিমালায় ৪১৭ টি চিহ্ন আছে। বিভিন্ন আকৃতির—বিভিন্ন প্রকৃতির।... ঐ লিপিমালায় ৮৫টা চিত্রলিপি রয়েছে—যেগুলোর চিত্রধর্মিতা প্রশ্নাতীত। মাত্র ৮৫ টা চিহ্ন সম্বল করে চিত্রলিপি বানানোর প্রয়াস কেউ নেন না। এই তথ্যটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।... মোট ৩৮টা সংখ্যাবোধক চিহ্ন ঐ 'লিপিমালা'য় আছে, যেগুলো সংখ্যা বোঝাবার অত্যন্ত কাঁচা ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয়।... উত্তরকালের পন্ডিতরা [এঁদের বেশীরভাগই মিথ্যার কারবারীদেরই সাকরেদ] ঐ সব চিহ্নের উপর হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত ইত্যাদি সংখ্যা আরোপ করার খেলা খেলেছেন। বিরাট বিশাল সব সংখ্যা 'আবিষ্কার' করে নিতে ওঁদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। মজার কথা ওঁরা অনেক সংখ্যা আবিষ্কার করে নিয়েছেন। করেন নি শুধু 'শূন্য' চিহ্নটার আবিষ্কার।... শূন্য চিহ্নের ধারণা সৃষ্টির আগে যে বিরাট বিশাল সংখ্যার ধারণা আসতেই পারে না— এই ছোট্ট তথ্যটির ওপর কোন পন্ডিতই গুরুত্ব দেন নি।... একই লিপি একটি লাইনে বাঁদিক থেকে ডানদিকে আবার পরের লাইনে ডানদিকে থেকে বাঁদিকে লেখা হবে আর পাঠক সেটা মেনে নেবে এ তথ্যটাই আজগুবি। picture কে erutcip লেখা হবে আর পাঠক অম্লানবদনে তা সহ্য করবে এটা ভাবাই যায় না। ভাবা যায় না তবু ঐ আজগুবি তথ্যের একটি সুন্দর নামকরণ করা হল 'boustrophedon'। সাহেব পন্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া ঐ শব্দের মহিমা আছে।... আঠারো কিংবা উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া ব্রাহ্মী লিপির খবর পাঁচহাজার বছর আগেকার মোহেন জো দড়োর সুসভ্য নাগরিকেরা পেলেন কি করে? তবে কি ঐ লিপিমালা উনিশ কিংবা বিশ শতকে উদ্ভাবন করা হয়েছিল?"

"সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন উপকরণের বেশ কিছু নমুনা কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বেশ যত্ন করেই রাখা হয়েছে।... পোড়া মাটির তৈরী বেশ কিছু উদ্ভট রূপকল্পনার জীবজন্তুর নিদর্শন ঐ মিউজিয়ামে আছে যার মধ্যে প্রাচীনত্বের ছিটেফোঁটা লক্ষণও নেই। মৃৎ পাত্রের টুকরো-টাকরা নিদর্শন যা রয়েছে তা যে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো নয় তা ঐসব নিদর্শন এক ঝলক দেখেই বুঝে নেওয়া যায়। ...মৃৎপাত্র পরিচয় দেওয়া

ভগ্নাংশগুলো এতই নিখুঁত—গুণগত মান তার এতই উঁচু যে বুঝতে কষ্ট হয় না ওগুলো সিরামিক শিল্পে প্রাগ্রসর আধুনিক ইউরোপের কোনও দেশের তৈরী অর্ডারী মাল।... ওগুলো কিয়ৎকালও যে মাটি চাপা ছিল এটা মনে করে নিতেও কষ্ট হয়।... মার্শাল, রাখালদাস, হুইলার, ম্যাকেদের মিথ্যা সৃষ্টির কর্মকান্ডের স্মারক ঐ সব 'প্রত্ন নিদর্শন'।"

"প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কোদাল-শাবল-খুরপী চালালেই ছুঁ মন্ত্রে সব হাজির হয়ে যায় কেন? ওঁরা কি যাদুমন্তর জানেন?... দেখেশুনে মনে হয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বুঝি সতিাই ম্যাজিক জানেন, না হলে ঐ ঐতিহাসিক যুগের ঢিবিঢাবা খুঁজতে গেলেই রাজ্যের শিলালিপি, অফুরন্ত প্রত্নমুদ্রা, দুচারটে বিষ্ণুমূর্তি কিংবা শিবলিঙ্গ কেন বেরিয়ে আসে? কোথাও বা ধ্যানমুগ্ধ বুদ্ধ—কোথাও বা হস্তমুদ্রায় কিঞ্চিত পার্থক্যযুক্ত মহাবীরের স্ট্যাচুই বা কেন বেরিয়ে পড়ে?"

"মোহেন-জো-দড়োর প্রত্ন উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ. ডি. পুসালকার স্বস্তিকা চিহ্নের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেনঃ 'The swastika design which is found in Crete, Cappadocia, Troy, Susa, Musyan etc. but not in Babylonia or Egypt, appears on particular types of seal (of Mohen - jo - daro) and indicates their religious use or significance.' ... 'প্রাচীন ইতিহাস' তৈরীর নেপথ্য শিল্পীরা বেশ পরিকল্পিতভাবেই দেশে দেশে প্রত্নউপকরণ বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার খেলাটা খেলেছিলেন। ...তথাকথিত 'স্বস্তিকা' চিহ্নটা ভারতে প্রচলিত ছিল এটা মনে করলে ভুল হবে। ঐ প্রতীক চিন্তার জন্ম হয়েছিল ইউরোপে। পরে ভারতে প্রচলনের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ প্রতীকেরই কায়দা করা প্রতিরূপের।"

'ইস্টার আইল্যান্ডের একদা প্রচলিত বলে প্রচারিত লিপিমালার বেশ কয়েকটা অক্ষরের সঙ্গে যে মোহেন্-জো-দড়োর তথাকথিত লিপিমালার সমসংখ্যক অক্ষরের মিল আছে এই মূল্যবান তথ্যটি কে দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন হাঙ্গেরীয় পন্ডিত হেভেসি ভিলমোস। ইস্টার আইল্যান্ডের ঐ 'লিপিমালাটা' যে একটা আধুনিক জালিয়াতি—ঐ 'লিপি' যে কস্মিনকালেও ঐ দ্বীপে চালু ছিল না—এতথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন সুইস-ফরাসী পন্ডিত আলফ্রেদ ম্যাত্রো। যে সব দাঁড়ের (Oar) ওপর খোদাই করা অবস্থায় ঐ লিপিগুলো পাওয়া গেছে তা সবই এমন সব কাঠের যা ইউরোপেই পাওয়া যায়। অন্যত্র পাওয়া যায় না।"

"লিখিত নজির ছাড়া ইতিহাস প্রামাণ্য হয় না। লেখাজোখা নেই তো ইতিহাসও নেই। ঐতিহাসিক যুগের শুরু ঐ লেখাজোখার মধ্য দিয়ে। মজার কথা এই যে দুনিয়ার

প্রাচীন ইতিহাস বানানোর শিল্পীরা ইতিহাসটাকে এমন প্রাচীন যুগে পাঠানোর আয়োজন করেছিলেন, যে যুগে দুনিয়ার কোনও লিপিরই জন্ম হয় নি। আর তা হয়নি বলেই রাজ্যের ভুতুড়ে লিপি ওদের বানিয়ে নিতে হয়েছিল। বানিয়ে নিতে হয়েছিল কাল্পনিক কাহিনীগুলোকে ইতিহাস বলে প্রচার করার তাগিদেই। মোহেন-জো-দড়োর কৃতী 'শিল্পী' — স্যার জন মার্শাল, মার্টিমার হুইলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাকে ইত্যাদি বেশ কয়েকজন পন্ডিত ঐ মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার তথাকথিত প্রাচীন সভ্যতার গল্প তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। করেছিলেন মিথ্যার আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের শরিক হিসেবেই।"

"মোহেন-জো-দড়ো সভ্যতার 'আবিষ্কর্তা' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে বেশ উচুঁদরের চাকরি করতেন। চাকরি জীবনের শেষকালে তাঁর চাকরি গিয়েছিল। গিয়েছিল একটি মূর্তি সরিয়ে ফেলার অপরাধে। ... আসলে রাখালদাস বাবু ঐ মিথ্যা কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন এই সত্যটা যাতে কেউ না ধরে ফেলেন তার জন্যই ঐ ব্যবস্থা। হিঁয়া কা মূর্তি হুঁয়া করার নামই যে মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পা এটাই কেউ বোঝেন নি। ঐ মহেন-জো-দড়োতে শিবলিঙ্গ রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল নানান 'মাতৃকা মূর্তি' রাখারও। ধ্যানমগ্ন'পশুপতি'ও রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল ধর্মীয় বিভ্রান্তি আনার জন্যই।"

"সোনা, রূপো, তামা, টিন ও সীসা এই পাঁচটা মৌলিক ধাতু আর ব্রোঞ্জ নামক মিশ্র ধাতুর ব্যবহার যে মোহেন্-জো-দড়োতে হত এতথ্য পন্ডিতেরা দিয়েছেন। স্যার এডউইন পাস্কো অনুমান করেন যে, 'সোনা, দক্ষিণভারত [হায়দ্রাবাদ, মহীশুর অথবা মাদ্রাজ দেশ] হইতে আনা হইয়াছিল। মহীশুরের অন্তর্গত কোলার খনির ও মাদ্রাজের অন্তর্গত অনন্তপুরের সোনার সঙ্গে মোহেন-জো-দড়োর সোনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়' [উৎস — কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখিত 'প্রাগৈতিহাসিক মোহেনজোদড়ো']। ঐ গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় লেখক ওখানকার তামার প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'প্রত্ন বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় অনুমান করেন, ইহা [তামা] হয়ত রাজপুতানা, বেলুচিস্তান অথবা পারস্য দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। মোহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত তামার গুণবিশিষ্ট তামা আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, রাজপুতানা ও হাজারীবাগেও দেখিতে পাওয়া যায়'। ... 'সাদৃশ্যযুক্ত সোনা' বা একই 'গুণবিশিষ্ট তামার' গল্পটা কম আজগুবি নয়। খাঁটি সোনা ও তামার একটাই জাত।"

"ডেনমার্কের ধনী পুত্তুরের খামখেয়ালের গল্পের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করা ঐ 'আর্কিওলজি' নামক জ্ঞানের শাখাটি প্রচন্ড মিথ্যায় সমৃদ্ধ। প্রাচীনকালে ঐ সব ধাতুযুগ ছিল না।"

"সিন্ধু সভ্যতায় গণিতের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় লিখলেন, 'দৈর্ঘ্য মাপবার জন্যে তারা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার করত তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সরু shell এর উপরে 6.9 মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া একটা মাপকাটি থেকে'। ... অকাট্য যুক্তি ত একেই বলে! 6.9 মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া মাপকাঠি যখন পাওয়া গেছে—আর জনৈক পন্ডিত ব্যক্তি যখন তা জানিয়েছেন তখন তথ্যটি মেনে নিতেই হয়। প্রশ্ন হল মিলিমিটার নামক দৈর্ঘ্য এককটি কি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দুনিয়া জুড়েই চালু ছিল ? এই আজগুবি কথা প্রসঙ্গে আর কিছু লেখার দরকার বোধ করছি না।"

'পুণ্যপবিত্র বেদ উপনিষদের জন্ম রহস্য' ঃ " প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে নাকি ঐ বেদ 'রচিত' হয়েছিল। আর তার শ-পাঁচেক বছর পরে নাকি ঐ উপনিষদ। সূত্র স্মৃতি পুরাণ নাকি 'রচিত'হয়েছিল এর পরে কয়েকশো বছর ধরে। 'রচিত' শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। যে যুগে ঐ বেদ-উপনিষদ 'রচিত' হয়েছিল বলে প্রচার করা হয় সে যুগে লেখার রেওয়াজই ছিল না। ... এবং লিপির জন্ম হয়নি বলেই তখন সবকিছু 'রচিত' হত —লিখিত হত না। সব কিছুই মুখে মুখে চলত। এই আজগুবি তথ্যের একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে—শ্রুতিপরম্পরা। শ্রুতিপরম্পরাতেই নাকি বেদ-উপনিষদ বেঁচে থাকত। ... ভারতের প্রায় তাবৎ পন্ডিত এই জলজ্যান্ত মিথ্যাটা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। ... ভারতের পন্ডিতেরা শুধু তথ্যটি বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হন নি, ঐ দুই গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তি করে নানা তত্ত্ব তৈরী করে নিয়েছেন। রাজ্যের থিসিস তৈরী হয়েছে। ডক্টরেট পেতেও অসুবিধা হয়নি। দরাজ হাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের পান্ডিত্যের। মূলেই যে ফাঁকি এইটাই তাঁরা ধরতে পারেননি।"

উপনিষদের জন্মকথা বলতে গিয়ে লেখক আর্যবাবু লিখেছেন, "এক, ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ্ আঁকেতি দুপের্ঁ ভারতে এসেছিলেন ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে। আট বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঐ ক বছরে সংস্কৃত এবং 'আবেস্তার ভাষা' দু-দুটো ভাষা শিখে নিয়ে তিনি ইউরোপে ফিরে গিয়েছিলেন ১৭৬২ তে। ফেরার সময় বেশকিছু ফারসী পুঁথি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপনিষদের ফারসী অনুবাদের সেইসব পুঁথি থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজ তিনি শুরু করলেন ওখানে গিয়েই। উপনিষদের দু রকম ফারসী অনুবাদ থেকে তুলনামূলক সূক্ষ্মবিচার সেরে...... ১৮০১ [১৮০২?] সালে উপনিষদগুলোর ল্যাটিন অনুবাদের কাজটা শেষ হল। অনুবাদটির ল্যাটিন নাম তিনি রাখলেন Oupnik'hat। নিঃসন্দেহে বিচিত্র বানান। দুই, কঠোপনিষদের ফারসী অনুবাদ থেকে রামমোহন রায় ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে আর ইংরেজী অনুবাদটা ১৮১৯ সালে। এছাড়া বাংলায়

আরও পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ তিনি করেছিলেন [কেন, ঈশ, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক]। হিন্দিতে চারটি উপনিষদের অনুবাদও তিনিই করেছিলেন।

এক, সংস্কৃত উপনিষদ যদি থেকেই থাকবে তবে তার অনুবাদের অনুবাদ করার দরকার পড়ল কেন? সোজাসুজি সংস্কৃত বই থেকে অনুবাদ করার কি কিছু অসুবিধা ছিল? [যেহেতু রামমোহন ভাল সংস্কৃত জানতেন ঃ এই বইয়ের লেখক] দুই, তবে কি সংস্কৃত নামক বইয়ের অস্তিত্বই ছিল না? তবে কি অস্তিত্বহীন সেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ফারসী সংস্করণটা আসলে একটা তৈরী করা [manufactured] বই ? তিন, সাহেব পণ্ডিতদের নির্দেশে লেখা একটা মতলবের নামই কি ঐ ফারসী উপনিষদ? কোনও ভাড়াটে ফারসী পণ্ডিতকে দিয়ে কি ঐ ফারসী উপনিষদগুলো লেখানো হয়েছিল?....... দুপেরঁ সাহেব শিখেছিলেন 'আবেস্তার ভাষা' আর তর্জমা করে বসলেন ফারসী ভাষা থেকে। এটা কি করে সম্ভব হল? অধুনিক ফারসীভাষা তিনি শিখলেন কবে? আর যদি মনে করে নেওয়া যায় উপনিষদগুলো 'আবেস্তার ভাষা'-য় লেখা হয়েছিল তাহলেও ত আর এক প্রশ্ন আসছে। রামমোহন রায়ই বা সেগুলির তর্জমা করলেন কি করে? তিনি ত আধুনিক ফার্সী ভাষাটাই জানতেন—'আবেস্তার ভাষা'-টা নয়।

প্রশ্ন আরও আসছে। যে সংস্কৃত উপনিষদ গ্রন্থাবলীকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে বসলেন—যে উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজে দীর্ঘ ৪০ বৎসর তাঁরা কাটিয়ে দিলেন—সেই সংস্কৃত উপনিষদ ঐ ৪০ বছরের মধ্যে ভারতে প্রকাশ করা হল না কেন? সংস্কৃত বইয়ের সন্ধান নেই—তার ল্যাটিন তর্জমা করারই বা এত দরকার পড়ল কেন? ল্যাটিন ভাষাটা কি দুনিয়ার 'ধার্মিকজালিয়াতি' পুষে রাখার মাধ্যম? তবে কি ঐ তর্জমা করার ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা? তবে কি ঐ চল্লিশ বছর ধরে সংস্কৃত উপনিষদগুলো ভারতে কোথাও লেখানো হচ্ছিল?''

''শাহাজাহানের পুত্র দারাশিকোহ্ কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ১৬৪০ সালে। ওখানে থাকার সময় সংস্কৃত ভাষায় লেখা উপনিষদ গ্রন্থাবলী নাকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে কিনা জানিনা তিনি নতুন উদ্যমে বইটির আর এক প্রস্থ তর্জমা করার ব্যবস্থা করে বসলেন। মতান্তরে মহাপণ্ডিত দারাশিকোহ্ নিজেই নাকি ঐ অনুবাদটা করেছিলেন।....তবে এইটুকু বলতে পারি উপনিষদের তর্জমা করার অপরাধের গল্পটা আরোপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরিকল্পিত ভাবেই। ব্যবস্থা হয়েছিল কারণ মধ্যযুগেও অনেকে 'উপনিষদ'-এর চর্চা করতেন—এই বানানো গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ করার তাগিদ ঐতিহাসিকেরা বোধ করেছিলেন।...... ঐ ফারসী তর্জমা করার সময় কি ঐ উপনিষদ গ্রন্থাবলীটা হারিয়ে গিয়েছিল? আর হারিয়েই যদি না যাবে তবে ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করার দরকারই বা পড়ল কেন? সংস্কৃত

গ্রন্থাবলীটা গেল কোথায়?'' [অ-ব্রাহ্মণেরা বেদ শিখলে যদি তাদের জিভ কেটে ও কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দেবার ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে যবন, অহিন্দু শাহজাহানের পুত্র দারা শিকোহ্ সংস্কৃত শিখলেন কি করে? : লেখক]

''ইন্টেলেকচুয়াল ষড়যন্ত্র করার মানসিকতা যে ১৭৬৩ সালে ইংরাজদের এসে গিয়েছিল তার প্রমাণ স্ক্র্যাফ্টন সাহেবের লেখা A History of Bengal Before and After the Plassey [1739-1758] বইয়ে বর্ণিত 'বিদম' নামক কল্পিত বইয়ের তত্ত্ব প্রচারের সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।''

''ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-কর্তা'দের লেখা গ্রন্থগুলো বা বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্যদের 'রচিত' 'প্রচুরগ্রন্থ' 'প্রকাশিত' হওয়ার খবর রামমোহন রায় পেলেন কোত্থেকে? ওসব বই যে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিতই হয়নি। ওসবই যে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে। তাহলে? ওসব বইয়ের নামগুলোই শুধু তখন পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছিল। কায়দাটা একটু খুলে বলা থাক। মিথ্যার কারবারীরা যে সব বই লেখানোর পরিকল্পনা নিতেন সে সব বইয়ের নামগুলো পূর্বাহ্নে প্রচার করার দায়িত্বও নিয়ে নিতেন। 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' লেখানোর পরিকল্পনা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইটির নামের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। বইয়ের সন্ধান নেই—বইয়ের নামের প্রচারটা শুরু হয়ে যেত। ধুরন্ধর কোলব্রুক সাহেব এ রকম অনেক বইয়ের নাম [লেখকের নাম সহ] পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করেছিলেন যে সব বই তখনও লেখাই হয়নি। দু-একজন লেখকের নাম দেওয়া যাক। 'আর্যভট্ট', 'ব্রহ্মগুপ্ত', 'বরাহমিহির'। মজার কথা আরও আছে। প্রাচীন সমস্ত সংস্কৃত বই-ই 'আবিষ্কার' করেছিলেন বিশেষ জাতের পণ্ডিতেরা। আজ মিঃ জন একটি বই 'আবিষ্কার' করলেন ত কাল করলেন মিঃ বুল। পরের দিন কোন বিশ্বাসভাজন আমলা বা মহামহোপাধ্যায় কিংবা কোনও রায়বাহাদুর।...

দু চারজন ঐ ব্রহ্মের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করলেও বেশির ভাগ লোকই কিন্তু মেনে নিলেন ঐ মিথ্যাটা। তাঁরা মনে করলেন কীটদষ্ট উপনিষদগুলো বুঝিবা শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনও অজ্ঞাত জায়গায় চাপাচোপা দেওয়া ছিল । কয়েকজন উৎসাহী ধর্মবীরের কল্যাণে বুঝিবা ওগুলোর উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। যে বই কস্মিনকালেও ভারতে ছিলনা—যে বইয়ের মূল্যবান [?] তত্ত্ব কস্মিনকালেও ভারতেআলোচিত হতনা—সেই বই প্রচারের ঠেলায় হয়ে দাঁড়াল হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ।

তথাকথিত ব্রহ্মের স্বরূপ রামমোহনের না জানার কথা নয়। তিনি সবই বুঝেছিলেন। সংস্কৃত বইয়ের পাত্তা নেই—তস্য ফারসী অনুবাদের বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাই অনুমান করে নিয়েছিলেন। জালিয়াতি উদ্যোগের শরিক তিনি হয়েছিলেন স্বজ্ঞানেই। ইন্দো ব্রিটিশ ইন্টেলেকচুয়াল

ষড়যন্ত্রের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইংলণ্ডের ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রের ক্রীড়নক রামমোহন নিজে উপনিষদের অনুবাদ করেও বলতে পেরেছিলেন সে তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জন্য নয়।.... ওসব তত্ত্ব শিক্ষিত মানুষের জন্য.... রামমোহনের যুগেই আবার ইংলণ্ডের অ্যাংলিসিস্ট গোষ্ঠী সাময়িকভাবে তৎপর হয়েছিলেন। ওরিয়েন্টালিষ্ট চক্রের নেপথ্য কর্মকাণ্ড চলতে থাকলেও বাহ্যতঃ ঐ অ্যাংলিসিস্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল।''

''ব্রিটিশ সরকারের বানানো বৈদান্তিক ধর্মপ্রচারের দায়দায়িত্ব বেশ কয়েকজন 'মহাপুরুষ' বুঝে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকের রামমোহন [কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের প্রথমার্ধে], উনিশ শতকের নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তথাকথিত আট বা ন' শতকের কল্পিত শংকর.....। রাজ্যের উপনিষদের প্রকাশ ঘটতে শুরু হয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই। প্রচারের উদ্যমও তখন থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কাজ খুব একটা এগোয়নি। ব্রাহ্মধর্মের নেতাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও ঐ উপনিষদকে 'পপুলার' করা সম্ভব হয় নি। সেটা সম্ভব হয়েছিল পরে। 'আবির্ভূত' হলেন উপনিষদের নব্যপ্রচারক নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ..... সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বব্যাধির সর্বরোগহর [Panacia] নাকি ঐ বেদান্ত। প্রচারের কৌশলটা কিছুটা পাল্টানো হল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনীয় জেহাদ থাকলো না। দেবদেবীদের স্বমহিমায় থাকার ব্যবস্থা হল পাকা।... উপনিষদে ফুল-বেলপাতা গোঁজা হল একটু বেশী মাত্রায়। মলাট পালটে নাম দেওয়া বেদান্ত। একই বই মলাট বদল করে দু-দুটো 'যুগের' পত্তন করল।''

লেখক 'বেদ' সম্বন্ধে গবেষণামূলক তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ''বেদ নামের কোন ধর্মগ্রন্থ যে ভারতে ছিল এতথ্য কেউই জানতেন না। আর ঐ ধর্মগ্রন্থে কি ছিল আর কি ছিল না—এটা জানার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। বেদের পুঁথি কেউই দেখেন নি। ব্রিটিশেরা আসার বেশ কিছু পরে বেদ নামটার প্রচার শুরু হয়।...১৭৮৬ সালের আগে ঐ 'আর্যভাষা' বা 'আর্যজাতি'র ধারণার জন্মই হয় নি।... অস্তিত্বহীন পুঁথির ওপরও যে গবেষণা করা যায় এবং সে গবেষণার সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ডাকসাইটে সব পণ্ডিতও যে জড়িত থাকতে পারেন এটা ভাবতেও অবাক লাগে।... বুঝতে কষ্ট হয় না একটা আন্তর্জাতিক সুসংহত এবং সুসংগঠিত চক্রান্ত ঐ কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ করেছিল।...বেদ্ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন এবং 'প্রামাণ্য' যে লেখাটা পাচ্ছি সেটা ছাপা হয়েছিল ১৮০৫ সালে। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ আকারে সেটা ছাপা হয়েছিল। লেখক ছিলেন কোলব্রুক। প্রবন্ধের নাম ছিল 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus'। 'or' শব্দটা তাৎপর্যপূর্ণ। বেদ 'অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র রচনা'। বোঝা যাচ্ছে 'বেদ' নামক শব্দের অর্থটাও তখনও পর্যন্ত

স্থিরকৃত হয় নি। হয়ে থাকলে ঐ 'or' শব্দটা ওখানে বসতোনা।... কোলব্রুকের ঐ নমুনা প্রকাশের দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে ১৮৩৮ সালে 'ঋক' বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সংস্কৃতে নয়, ল্যাটিনে। তাও ভারতে নয় সুদূর লণ্ডনে। সেই খণ্ডটিতে ছিল ঋগ্বেদের ঐ অংশের ল্যাটিন অনুবাদ এবং সেই অনুবাদের ওপরে লেখা অসম্পূর্ণ কিছু ল্যাটিন টীকা। বইটা সম্পাদনা করেছিলেন ফরাসি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রোঝ্যাঁ। ফরাসী পণ্ডিতের সম্পাদিত বই ছাপা হল ইংল্যাণ্ডে [উৎস—নীরদ.সি. চৌধুরীর The Scholar Extraordinary]।... রোঝ্যাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের ঐ বই আর বিবলিওথেক নাশিওনালে রক্ষিত বলে প্রচারিত বেদের পাণ্ডুলিপির [বলাবাহুল্য অস্তিত্বহীন] ওপর নির্ভর করে ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ বুর্নু বেদ সম্পর্কে কিছু গবেষণা করে নিলেন। বক্তৃতাও করে বেড়ালেন। তবে ঐ পর্যন্তই। বিরাট আকৃতির কোন লেখা তিনি প্রকাশ করেন নি। ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন H. H. Wilson। বইটা প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে ১৮৫০ সালে। রিচার্ড রাইটসনের 'The Sacred Literature of the Hindus' ডাবলিন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। থিওডোর বোন্‌ফে 'সাম' বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৪৮ সালে। ভেবার যজুর্বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৫২ সালে। সে যাইহোক ঐ সময়েই বেদের সবচেয়ে বড় বোদ্ধা ম্যাক্সমুলারের প্রয়াস যুক্ত হল বেদ ঘটিত কর্মকাণ্ডে। ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পদনায় প্রকাশিত হোল ১৮৪৯ সালে। ... ছ খণ্ডে সমাপ্ত ঐ ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হোল ১৮৭৫ সালে। জার্মান ঋগ্বেদ আল্‌ফ্রেড লুডভিগ-এর সম্পাদনায় পূর্ণতঃ প্রকাশিতহয় ১৮৭৬ সালে। ফরাসী ভাষায় অনূদিত লাঁলোয়া সম্পাদিত ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ১৮৭০ সালের আগে কোন ভাষাতেই ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় নি।... বেদের বৈদিক বয়ান কেউ দেখলেন না আর তার আগে তস্য ইংরাজি, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান অনুবাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার।... প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ ঐ কর্মকাণ্ডে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন কে? দিয়েছিলেন ঐ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।... কোম্পানীর বকলমে ব্রিটিশ সরকারই কি ঐসব খরচ বহন করেছিলেন? একদিকে ভারত নামক ভূ খণ্ডের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করার ব্যবস্থা আর অন্যদিকে তার অতীতকে উজ্জ্বল বানাবার খেলাই কি শুরু করেছিলেন মহানুভব ব্রিটিশ সরকার?''

''বেদের পুঁথি হয়না। বেদের প্রাচীন পুঁথি থাকতেই পারে না।... বেদ যাতে কোনওক্রমে লিপিবদ্ধ না হয় তারজন্য বিধান ছিল যাঁরা বেদ লিপিবদ্ধ করবেন তাঁরা নরকগামী হবেন। বেদবিক্রয়িনশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ/বেদানাং দূষকাশ্চৈব তৈবৈ নিরয়গামিনঃ।''

''প্রাচীন যুগের ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিংদের মধ্যযুগীয় সংস্করণ ঐ

আলবিরুনী... যে যুগে সংস্কৃত-আরবী অভিধান ছিলইনা [বলে রাখা ভাল এখনও নেই] সেইযুগে এক ফার্সী ভদ্রলোক আরবী ভাষায় ভারত সম্পর্কে এনসাইক্লোপেডিয়া চরিত্রের বিপুলায়তন গ্রন্থটি কোন্ যাদুবলে লিখে ফেললেন তা ভেবেও অবাক হতে হয়। ঐ 'আলবিরুনী' বেদ সম্পর্কে এক জায়গায় লিখলেন ঃ 'They [Indians] do not allow the Veda to be committed to writing, because it is recited according to certain modulations, and they therefore avoid the use of the pen, since it is liable to cause some error, and may occasion and addition or a defect in the written text. In consequence it has happened that they have several times forgotten the veda and lost it.'

নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার। অতীতে নাকি মাঝে মধ্যেঐ ৰায়বীয় বেদটা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। পরে নাকি তা [ভগবৎ কৃপায় কিনা জানিনা] বুদ্বুদ আকারে ভেসে উঠত। সম্ভবত বায়বীয় সত্তা নিয়ে আর এক প্রস্থ বেঁচে থাকার জন্যই। উদ্ভট গল্প কিছু কম বানাননি ঐ আলবিরুনি নামের আধুনিক ভাড়াটে লেখকটিও।''

'দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এর উদ্যোগে প্রকাশিত দ্য কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থের সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তিনজন খ্যাতনামা পন্ডিত।'' ঐ বই হতে লেখক ইংরাজী উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ ''...Rg-Veda, covering1028 hymns or about 10,560 mantras or about 74,000 words, there is only one variant reading, viz-its mamscatoh for mamscatoh in VII-44-3.'' উল্লিখিত ৭৪,০০০ শব্দ যেখানে মওজুদ সেটাকে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ রেখে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারটা যে অবিশ্বাস্য সে সন্ধন্ধে শ্রী আর্য লিখেছেন, ''এর বানানো গল্পটাকে সবাই বিশ্বাস করেন নি। করেন নি ডঃ হীরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও। ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকার একজায়গায় তিনি লিখলেন, 'স্মরনশক্তির সাহায্যে ঋগ্বেদের মত একটি বিরাট গ্রন্থ বংশপরম্পরায় শত শত বছর ধরে যে অভ্রান্তভাবে রক্ষিত হতে পারে এটি কল্পনা করাই আমার ধারণায় যুক্তিসংগত নয়। ঋগ্বেদে দশহাজারের মত ঋক আছে। এমন শ্রুতিধর ব্যক্তি কে আছেন যিনি তার সকল সূক্তগুলি অভ্রান্তভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখবেন?' ... ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ৫২ সূক্তের ৬নং শ্লোকে পাচ্ছি ঃ ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রান্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসর্পঘন্। শত-সহস্রের ছড়াছড়ি বেদে আছে। আছে অযুত-নিযুত-অর্বুদও। গোলমাল যে এর সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর মধ্যেই রয়েছে। শূন্য চিহ্নের আবিষ্কার কি তখন হয়েছিল? লিপিই ছিল না—শূন্য চিহ্নটা থাকে কি করে?''

''যীশুখ্রীষ্টের পর ১,০০০ বৎসর পর্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত। শুধু বেদ নয়

তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ,যত বেদলক্ষণ সব মুখে মুখেই থাকিত। লিখিলে পাপ হইত। জৈন ও বৌদ্ধদেরও শাস্ত্র মুখে মুখে থাকিত। [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]''

সম্রাট অশোকের ছবি ইতিহাসে সহজলভ্য। বেশ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় একটি অপরূপ সুন্দরী মহিলাকে ঢিলেঢালা চাদর পরিয়ে মাথায় মুকুটের মত একটা কিছু চড়িয়ে দিয়ে তাঁকে একজন পুরুষ সম্রাট সাজিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আধুনিক অনেক গবেষকের ধারণা। 'মিথ্যাময় ইতিবৃত্ত' পুস্তকে বিবস্বান বাবু লিখেছেন, ''অশোকের গল্প ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগে কেউ শোনেনেই নি। জানতেনও না। ...সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত আঠারো শতকে কেউ দেখেন নি। দেখেন নি প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, হোমারদের লেখা কোন কেতাবই।''

অশোক

ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে ঐ শয়তানী গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল তাও লেখক জানিয়েছেন। লেখক লিখেছেন, ''বাঁশবেড়ে-কোটালিপাড়া-কালিয়া-বনারস-এর পন্ডিতদের দিয়ে হিন্দু ঐতিহ্যের লজেঞ্চুস যেমন বানানো হত তেমনি বানানো হত ইসলাম ঐতিহ্যের লালিপপ জৌনপুর, ভাগলপুরের মৌলবীদের সহযোগিতায়।''

''আলবিরুনীর নামে লেখা কেতাব লেখা হল আরবী ভাষায়। ভারতের পন্ডিত আরবী ভাষায় কিছু লিখলে ভুলচুক কিছু থেকে যেতেই পারে। তাই তাঁকে আরবী জানা ফারসী [ভদ্রলোক] বলে জানানো হল। ...সে যুগে ভারত সম্পর্কে এন্সাইক্লোপেডিয়া চরিত্রের ঐ ঢাউস সাইজের বইটা কোন্ যাদুবলে লেখা হয়েছিল এ প্রশ্ন কেউ তোলেন নি।''

লেখক আরও লিখেছেন, ''১৮৩৫খৃষ্টাব্দ থেকে পুরাণের প্রকাশ শুরু হলেও সর্বশেষে 'ভবিষ্য পুরাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫খৃষ্টাব্দে। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস'-মহাশয়ের ছদ্মনামের আড়ালে কেশব সেনই ঐ পুরাণটি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন বাইবেলের কায়দা চুরি করে।''

''ফিরিস্তাকে প্রামাণ্য ইতিহাসকার ভেবে নিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দও

মারাত্মক ভুল এক তথ্য দিয়ে বসেছিলেন। মুসলমানদের ভারতে আসার সময় হিন্দুর সংখ্যা যে ৬০ কোটি ছিল এবং উনিশ শতকের শেষভাগে যে কমে গিয়ে মাত্র ২০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে—এই বিভ্রান্তিকর তথ্যটি জানিয়ে তিনি আক্ষেপও করে বসেছিলেন... তথাকথিত ফিরিস্তা যে সময়ের কথা লিখেছেন সে সময় সারা পৃথিবীতে যে ৬০ কোটি লোক ছিল না। তাহলে? জাল বইয়ে জাল খবরই থাকে।" [দ্রঃ ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৩]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজে'র এক জায়গায় লিখেছেন, "ভগবান আর মুনী ঋষিরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন।" [পৃষ্ঠা ২২]

"কলকতার ফোর্ট উইলিয়ামে ভারতের নানান ভাষাভাষী পন্ডিতদের যে ডাকা হয়েছিল এখবর ইতিহাসেই পাচ্ছি। ডাকা হয়েছিল আঠারো শতকের সাতের ও আটের দশকে। মারাঠী পন্ডিতদের, গুজরাতি বিদ্বানদের, উড়িয়া বিদগ্ধ-বিদুরদের। অনেকে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তমলুক মেদনীপুরের করিৎকর্মা [কৃতকর্মনঃ] শিল্পীরা আগে থেকেই ছিলেন।... ইউরোপে ঐ পরিকল্পনায় ল্যাটিন, হিব্রু ও প্রাচীন গ্রীকভাষায় প্রাচীন বলে প্রচার করা নানান কেতাব লেখানোর উদ্যোগ আয়োজন নেওয়া হয়েছিল। ভারতে নেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আরবী, ফারসী কেতাব লেখানোর ব্যবস্থা। সরকারী উদ্যোগে কলকাতা, বনারস, নদীয়া [নবদ্বীপ] ও মিথিলায় গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতমাধ্যম মিথ্যা সৃষ্টির আঁতেলি কর্মশালা। বনারস, গাজীপুরে তথাকথিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার নেপথ্য কর্মকান্ডও চলেছিল।" [পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫]

সংস্কৃত ভাষা বলে যেটি বর্তমানে প্রচলিত ঐ ভাষায় দূরদর্শনের খবর প্রচার, নাটক, গান ছাড়াও ঐ ভাষায় এম. এ. এবং ডক্টরেটও করা হচ্ছে। সংস্কৃত নিয়ে কত কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বাঘা বাঘা অধ্যাপকেরা গবেষণা করছেন। রাজনীতিবিদরা চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয় ঐ সংস্কৃত ভাষা। একদল লোক নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে সংস্কৃত ভাষাকে বলে থাকেন 'মৃত ভাষা'। আবার একদলের মতে তাঁরা বুদ্ধিমানই নন্। যে ভাষার অস্তিত্বই ছিল না সেই ভাষার মৃত্যু ঘটে কিভাবে? যত নিকৃষ্টতম ভাষাই হোক, যত দুর্বলতম ভাষাই হোক, সেই ভাষায় কথা বলার মত সংখ্যালঘু হয়েও একটা সম্প্রদায় থাকবেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কোন দেশে, কোন প্রদেশে, কোন জেলায়, কোন থানায়, কোন গ্রামে বা কোন একটি পরিবারেরও ব্যবহৃত ভাষা নয়। এটা কি সাহেবদের সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক একটা ধাঁধা নয়? দেহ এবং প্রাণের যেমন সম্পর্ক একটি জাতি ও তার ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক তেমনিই। একটি মৃতদেহ দেখলে অবশ্যই অনুমান করা যাবে অতীতে তার প্রাণ ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, বলা যায় না যে একদিন তার দেহ ছিল।

দেশ বিদেশে বহু জাতি আছে যাদের ভাষার কোন লিপি সৃষ্টি হয় নি আজও। তবুও সেইসব ভাষায় কথা বলার মত মানুষ বিশ্বে বিদ্যমান। যেমন 'হোলি' ভাষায় এখনও [১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবানুযায়ী] ৬৫ হাজার লোক কথা বলছে। লিপিহীন বা অক্ষরহীন 'কুমান' ভাষায় কথা বলছে ৭০ হাজার লোক। 'মিল্‌পা' ভাষায় কথা বলছে ৭৫ হাজার লোক। 'এঙ্গা' ভাষায় কথা বলছে ১লাখ ৮০হাজার লোক। 'কুওয়ানুওয়া' ভাষায় কথা বলছে ৮০ হাজার লোক। 'ফর' ভাষায় কথা বলছে ২৫ হাজার লোক। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কিছু লোক 'ক্রিয়ল' ভাষায় বংশানুক্রমিক কথা বলে আসছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৬০হাজার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা 'সংস্কৃত'ভাষা নিয়ে ভারতে এত হৈহৈ রৈরৈ অথচ এখানে একটি পরিবার বা সংসার খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিজস্ব ভাষা হিসাবে 'সংস্কৃত'ভাষাকে বেছে নিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সংস্কৃত ভাষার জন্য লিখেছেন, "আমাদের ভাষা — সংস্কৃত, গদাইলস্করীচাল — ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়— লক্ষণ।" তিনি আরও লিখেছেন, "পান্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট। কিন্তু কটমট ভাষা — যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র — তাতে ছাড়া কি আর পান্ডিত্য হয় না? চলতি ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলায় ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর।... আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ এখনই বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়। শক্তির যত ক্ষয় হয় ততই দু একটা পচাভাব রাশিকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে সে কি ধুম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে 'রাজা অসীৎ'!!!! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ কি, বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ওসব মরার লক্ষণ" [দ্রষ্টব্য বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, ৩য় মুদ্রণ সম্পাদনায় প্রসুন বসু ও শচীন ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা -৫]। শ্রী আর্য তাই লিখেছেন, "আসলে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, পুর্তুগীজ, বুলগেরিয় ইত্যাদি ইউরোপীয় নানান ভাষার শব্দই ঐ সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ল্যাটিন, গ্রীক শব্দও। রাখা হয়েছে আরবী, ফারসী শব্দের আদলে তৈরি করে নেওয়া শব্দও।" উত্তরপ্রদেশের বনারস আর গাজীপুর "জায়গাদুটোতে সংস্কৃত সাজানো ছদ্মবেশে বারানসী ও গর্জতীপুর বলে চালান হল। যশোর জেলার কালিয়া ও ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে বাছাইকরা বেশ কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঐ বনারস আর গাজীপুরে। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওঁদের দিয়ে বেদ লেখানোর কাজটা করিয়ে নিতে। এঁদের সঙ্গে বেশ কিছু মারাঠী, গুজরাতী, ভোজপুরী ও মৈথিলি সাকরেদও ছিলেন। সাকরেদ ছিলেন বাঙলা ভাষী

নানান জেলা থেকে পাঠানো কিছু পণ্ডিতও। এঁদের যৌথ প্রয়াসে গোপনীয়তার পরিমণ্ডল রচনা করেই বৈদিক বুজরুকি লেখা শুরু হয়েছিল।''

''কালিয়া—কোটালিপাড়া থেকে যে সব পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের কেউই যশোর বা ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা ছিলেন না। এঁদের সকলেরই আদি বাসস্থান ছিল মেদনিপুর [সংস্কৃত ছদ্মবেশে মেদিনীপুর] জেলার তমলুকে। সংস্কৃত নামক 'দেবভাষা' সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও নেপথ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনায় করিৎকর্মার [কৃতকর্মণঃ] পরিচয় দিয়ে তমলুক-মেদিনীপুরের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৌজন্যে যশোর, ফরিদপুর সহ নানান জেলায় প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসেছিলেন।'' [ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭]

''সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত যে প্রাচীনকাল থেকে সারা ভারতে [এমন কি বহির্ভারতেও কিছু জায়গায়] ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—এই কথাই পণ্ডিতেরা জানিয়ে আসছেন। তাই যদি হবে তবে বই দুটির পুঁথি মাত্র দু-তিনটি পাওয়া গেল কেন? পণ্ডিতদের ধারণাটা সত্যি হলে যে অনেক বেশী পুঁথি পাওয়ার কথা। যে দু- তিনটি পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে তাও দেখছি সবই ইউরোপে পাচার করা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কি? রামায়ণ - মহাভারতের পূর্ণ কলেবর পুঁথি কি সত্যিই কেউ দেখেছেন, নাকি সেও এক মায়া?.... রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও দু-একটা পুঁথি মেলেনি কেন?''[ঐ পৃষ্ঠা ৫৬] ''কানাড়ীভাষী সংস্কৃত পণ্ডিত সামাশাস্ত্রী কোলেশন-ব্যাপদেশে মহীশূরের রাজার অতিথি হয়ে তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' সম্পাদনা করে মহামহোপাধ্যায় হয়ে বসেছিলেন।...

তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' বইয়ের নামেই গোলমাল। 'অর্থশাস্ত্রের' 'অর্থ' অংশের মানে টাকা পয়সাও নয়—মানে ['meaning'] ও নয়। এমনকি অভিধানেও শব্দটির যেসব অর্থ দেওয়া হয়েছে তার কোনওটাই নয়। ঐ 'অর্থ' শব্দের মানে ' পৃথিবী'। বুঝতে কষ্ট হয় না খাঁটি ও আধুনিক ইংরাজী 'earth' এর উচ্চারণ চুরি করেই ঐ 'অর্থ' শব্দটি বানানো হয়েছিল। বানানো হয়েছিল আধুনিক কালেই । ' অর্থশাস্ত্র' মানে economics নয়—ওর মানে 'পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান'।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮]

''বলে মনে রাখা ভাল 'বেদান্ত' শব্দটা খাঁটি মারাঠি। শব্দটির অর্থ দর্শন। শব্দটি বেশ কিছু উপনিষদের সমার্থক শব্দ হিসাবে সংস্কৃতে ঠাঁই পেয়েছে। যেন কতই না প্রাচীন ঐ শব্দটি। কাঁচা সংস্কৃতে লেখা কঠোপনিষদ রামমোহন রায়ের বাঙলা হিন্দি ও ইংরেজী তর্জমা সহ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে।

যে সব জায়গায় ধর্মগ্রন্থ চক্রের কারখানা ছিল পূর্বে উল্লিখিত বনারস, গাজীপুর, তমলুক, মেদিনীপুর, কোটালিপাড়া ছাড়াও বিক্রমপুর, লাভপুর, পাত্রসায়র, ভাটপাড়া-

নৈহাটি প্রভৃতি জায়গা উল্লেখযোগ্য। লেখক লিখেছেন,''মরে ভূত হয়ে যাওয়া ভাষায় ছাইভষ্ম লিখে রায়বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় হয়ে বসতেন। এঁদের দিয়ে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ- অবহট্ট ভাষায় কেতাব লেখানোর এক মোচ্ছব শুরু হয়েছিল।'' মহেঞ্জদাড়োতে যে ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গেছে লেখক তা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে অসত্য প্রমাণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের আগে যে ব্রোঞ্জ তৈরির কথা কল্পনাও করা যেত না—...সুনির্দিষ্ট অনুপাতে টিন, তামা ও দস্তা ব্যবহার করেই যে ওই ব্রোঞ্জ নামক ধাতুসংকর বানানো সম্ভব হয়েছিল—১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের আগে যে তা বানানো অসম্ভব ছিল এই অষ্টম আশ্চর্যের কথা পণ্ডিতেরা চেপে গেছেন। কর্তৃপক্ষের সেই রকমই নির্দেশ ছিল আর তা ছিল বলেই মোহেন-জো-দাড়োতে ব্রোঞ্জ মূর্তি গুঁজে রাখা দরকার পড়েছিল। তথাকথিত ব্রোঞ্জ যুগ একটি জলজ্যান্ত মিথ্যার আর এক নাম।'' [ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮৭]

''মূল গ্রন্থ প্রকাশের আগেই তার অনুবাদের ব্যবস্থা প্রাচীন অন্য অনেক বইয়ের মতই বৈয়াকরণ চূড়ামণি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশিত হয় ইংরাজীতে—সংস্কৃতে নয়।... বলা হল ওটা সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'র ইংরাজী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত বইটা প্রকাশ না করে তার ইংরেজী অনুবাদটা আগেই কেন প্রকাশ করা হল এ প্রশ্ন কেউ তোলেন নি।... সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে।'' [ঐ,পৃষ্ঠা ৯২] ''আসলে ঐ পাণিনিকে মহাকালের ভারতীয় যীশুখ্রীষ্ট বানাতে গিয়েই ঐ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ভূগোল' রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।'' [পৃষ্ঠা ৯৩]

''সংস্কৃত জানা পণ্ডিতদের ওপরে যে কত রকমের দায়িত্ব চাপানো ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাদের দিয়ে লেখানো হত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর নানান 'গ্রন্থ'। কাউকে দিয়ে 'মূল' গ্রন্থ, কাউকে দিয়ে তার টীকা টিপ্পনী। কেউ সাজতেন ব্যাস বা বাল্মীকি কেউ সাজতেন সায়নাচার্য বা মহীধর। কাউকে দিয়ে লেখানো হত শিলালিপি বা তাম্রশাসনের বয়ান। যেগুলোকে পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাঁচামাল বলে চালানো হত। কাউকে দিয়ে লেখানো হত পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট মার্কা নামের ভাষার কেতাব লেখানোর পূর্বকৃত্য হিসাবে বানিয়ে রাখা সংস্কৃত 'আদিরূপ' যাকে রসিকতা করে বলা হত 'ছায়া'। আর তার ছায়া অবলম্বনে বানানো কাণ্ডকারখানাটাকে বলা হত 'মূল'।'' [পৃষ্ঠা ৯৯]

''সংস্কৃত সাহিত্য বানাতে যেমন প্রধানতঃ বাঙালী পণ্ডিতদের কাজে লাগানো হয়েছিল তেমনি পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য বানাতে গিয়েও ঐ বাঙালীদেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইতিহাসের কাঁচা মাল বানানোর নেপথ্য প্রযোজকদের।'' [পৃষ্ঠা ১০১]

''পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলেছেনঃ তখনকার দিনের স্ত্রী জাতির কেউই সংস্কৃত শব্দ ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না আর তাই তাঁরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতেন। আর সেই জন্যেই সংস্কৃত নাটকের স্ত্রী চরিত্রের অভিনেত্রীদের প্রাকৃতভাষায় কথাবার্তা বলতে হোত। আজগুবি কথা আর কাকে বলে।'' [পৃষ্ঠা ১১৩]

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই বা ছিল না যে জাতির পরিবারের পুরুষগুলো এক ভাষায় কথা বলবে আর নারীরা সে ভাষায় কথা না বলে অন্য ভাষায় উত্তর দেবে—এটা একটা অবান্তর বা অসম্ভব ঘটনা।

''পণ্ডিতেরা আরও বলেছিলেন ঃ শিশুদের কেউই সংস্কৃত ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতো না। আর পারতো না বলেই তারা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত।'' [পৃষ্ঠা ১১৫]

''সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত পুঁথিগুলোর কোনটারই বয়স দুশ বছরের বেশী নয়। পণ্ডিতেরা ঐ সব ভাষায় লেখা বেশ কিছু জাল পুঁথি থাকার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন।'' ''পুঁথির কাগজ যে মেট্রিক পদ্ধতিতে কাটা হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু হাজার হাজার বছরকার পুরনো কাগজ টিকল কি করে? তখন কাগজ তৈরি হয়েছিল কি? কোনরকমে যদি ঐ মিথ্যাটা মেনেই নেওয়া হয় তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সেন্টিমিটার অর্থাৎ মেট্রিক পদ্ধতিতে হয় কি করে?... দৈর্ঘ্য মাপার কাজে মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই। অতএব পুঁথিটা পাঁচশ বছরের পুরনো নয়—ওটা যে উনিশ শতকের জালিয়াতি তাতে সন্দেহ নেই।'' আরও মজার কথা হচ্ছে এই, ''পুঁথির কাগজ আলোর সামনে ধরতেই Made in France জলছবিটা দেখা গেল।'' ''পুঁথির কাগজের রঙ হলদে কারণ পোকামাকড় বা ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু আর্সেনিক ঘটিত যৌগ মিশ্রিত হলুদ গোলা জলও পুঁথির কাগজে মাখিয়ে রাখা হত। পাঁচশ বছর আগে ঐ আর্সেনিক কাকে বলে কেউই জানতেন না।''

''ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে পাচার করা পালি-প্রাকৃত পুঁথির বেশীর ভাগই বাংলা হরফে লেখা হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না নেপথ্য শিল্পীদের বেশীর ভাগই বাংলা ভাষাভাষী ছিলেন। ...'প্রাকৃত কল্পতরু' নামক উদ্ভট নামের কেতাবের পুঁথি যা ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে তা বাঙলা হরফেই লেখা হয়েছিল।'' [পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯]

'আর্য' শব্দটা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে। তবে সেই শব্দটি আর্য ছিল না বরং ছিল আর্যাবর্ত। সে যাইহোক কল্পিত ঐ মূল ভাষা এবং

সেই ভাষাভাষীদের আর্য বলে জানানো হয়েছিল উনিশ শতকে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির পত্র পত্রিকায়। ''একদল বললেন আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন ত, আর একদল বললেন ওঁরা ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড থেকেই এসেছিলেন'' [পৃষ্ঠা ১২২-১২৪]।... কিছু ভারতীয় পণ্ডিত উল্টো এক তত্ত্ব দিয়ে বসলেন,''তাঁরা বললেন ঃ আর্যরা বিদেশ থেকে ভারতে আসেননি ভারত থেকেই তাঁরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। আজগুবি 'তত্ত্ব'কে উল্টে দিলেও যে আর এক আজগুবি কাণ্ড তৈরি হয়— এটাই তাঁরা বোঝেন নি।''

''আর্যমহিমার বৃত্তান্ত পড়ে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর্যদের তিনি এতই ভালবেসে ফেলেছিলেন যে ভাবের আবেগে উল্টোপাল্টা কথাও বলে বসেছিলেন। অহিন্দু কাউকে আর্য বলে মনে করতেও তাঁর কষ্ট হত। তিনি এক তত্ত্ব উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— 'Only Hindus are Aryans'!!! হিন্দু ছাড়া কেউ আর্য নন।'' [পৃষ্ঠা ১২৬]

''প্রাচীনকালে রাজা মহারাজাদের পণ্ডিত পুষে রাখার গল্পটাকে লোকে যাতে সন্দেহ না করে বসে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ঐ ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা মাফিকই। ভারতের দেশীয় করদ রাজ্য মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানা ইত্যাদি নানান রাজ্যের রাজা মহারাজারাও পণ্ডিত পুষতেন।... ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আশ্রয়ে থেকে গণপতি শাস্ত্রী ভাসের লেখা তেরোখানা নাটকের সম্পাদনা করে 'মহামহোপাধ্যায়' খেতাব পেয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল ঐ তেরোখানাই জাল কেতাব। জালিয়াতি করে এই কায়দায় সামাশাস্ত্রীও 'মহামহোপাধ্যায়' হয়েছিলেন। দেশীয় রাজা-মহারাজাদের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা যে ব্রিটিশ সরকারের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করেছিলেন এইটাই কেউ বোঝেন নি। প্রাচীন বলে চালানো বইপত্র লেখানোর দায়টা দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে চাপানোর দরকার ছিল। নেপথ্যে থাকা ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সন্দেহের উর্দ্ধে রাখার ব্যবস্থা করে নিতেন রাজাদের দিয়ে পণ্ডিত পোষার খেলা দেখিয়ে।''

''ভারতের নানান জায়গায় বেশ কয়েকটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গেছে বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরেও ঐ স্তম্ভের দুটি নিদর্শন রাখা আছে .... ঐ সব স্তম্ভের কোনটাতেই অশোকের নাম খোদাই করে রাখা হয়নি—রাখা হয়নি কোনও নামই—রাখা হয়নি কোনও লিপিও। আজ যাঁরা অশোকস্তম্ভের চিত্ররূপের নিচে 'সত্যমেব জয়তে' বাণী লিখে ভারত সরকারের একটি প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বসেছেন তাঁরা জানেন না ঐ স্তম্ভের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক নেই অশোকের—সম্পর্ক নেই বৌদ্ধধর্মেরও। সত্যের জয় ঘোষণার বাণী লেখার ব্যবস্থা হলেও প্রতীকটি অনেক মিথ্যার প্রকাশ ঘটিয়েছে।''

''আঠারোশ আঠারো খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত ইতিহাসে অশোক-এর নামগন্ধ

নেই।...১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এইচ. এইচ. উইলসনের 'স্যানসক্রিট-ইংলিশ ডিক্সনারী'তে 'আশোক' শব্দটা রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল একটি গাছের নাম হিসাবে, কোন সম্রাটের নাম হিসাবে নয়।'' ভারতের 'শ্রেষ্ঠ-সম্রাট' এর নামটা তখনও পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেন নি নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতেরা। 'ইংরেজী ও বাংলা মহাভারতে না থাকলেও ঐ অশোকের প্রসঙ্গ সংস্কৃত মহাভারতে রাখা হয়েছে।... বুঝতে কষ্ট হয় না সংস্কৃত মহাভারতের ঐ অশোকের তথ্যসমৃদ্ধ অংশটি ১৮১৯-এরও পরে লেখা হয়েছে।''

''বাংলার তমলুক স্থান নামটাকে সংস্কৃত সাজিয়ে প্রথমে 'তামলিপ্ত' বানানো হয়েছিল। ১৮১৯-এ প্রকাশিত উইলসনের ওই ডিক্সনারীতে 'তামলিপ্ত' নামটা রাখা হয়েছে। তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত নামটা তখনও বানানো হয়ে ওঠেনি। মজার কথা হল ইংরেজী বা বাংলা মহাভারতে 'তাম্রলিপ্ত' নামটা ব্যবহার করা না হলেও সংস্কৃত মহাভারতে কিন্তু ওই 'তাম্রলিপ্ত' নামটাই ব্যবহার করা হয়েছিল।''

''কীর্তিবাস এর লেখা বাঙলা রামায়ণ আর কাশীদাসের লেখা বাংলা মহাভারতের প্রথম সংস্করণের [প্রকাশকাল ১৮03 খ্রীষ্টাব্দ] বইদুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। বইদুটির কলেবর কালক্রমে বাড়তে বাড়তে আজ যা দাঁড়িয়েছে তা ওই প্রথম সংস্করণের বইদুটির যে দেড়গুণেরও বেশি হবে তা বেশ জোরে দিয়েই বলা যায়।.... তবে কি পুরো ব্যাপরটার পিছনে রাষ্ট্রের বা সরকারের মতলববাজী কাজ করেছিল? তাই তো আসছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ আবিষ্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সাম্প্রতিককালে সুকুমার সেন মহাশয়ও কাব্যটির মধ্যে কিছু 'প্রক্ষেপে'র সন্ধান পেয়েছেন। কম্বল থেকে লোম বাছতে গেলে এই হয়। প্রাচীন সাহিত্যের ষোল আনা অংশই 'প্রক্ষিপ্ত'। ষোল আনাই বেনামে লেখা।''

''উপনিষদ নামক চালাকিটাকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার এক নম্বর ম্যাজিক দেখিয়েছেন রামমোহন রায়। সংস্কৃত উপনিষদগুলোর কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নি। পাওয়া গিয়েছিল কিছু উপনিষদের ফারসী অনুবাদ। অন্ততঃ প্রচারটা সেইরকমই রাখা হয়েছে।... বেশ কিছু উপনিষদের বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ যে রামমোহন রায় নিজেই করেছিলেন —একথাই জানানো হয়েছে। প্রশ্ন আসছেই— এক, রামমোহন সংস্কৃতটা শিখলেন কবে? কোথায়? কতদিন ধরে তিনি ভাষাটা শিখেছিলেন। দুই, তাঁর জীবনীগ্রন্থে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহজনক কিছু তথ্যই রাখা হয়েছিল [যেমন] —'সেকালে শিক্ষার স্থান ছিল তিনটি পাঠাশালা, চতুষ্পাঠী বা টোল ও মক্তব। মক্তবে তিনি ফারসী ও আরবী ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন'। তিনি একসঙ্গে তিন জায়গায় ভর্তি হয়েছিলেন? 'চতুষ্পাঠী' নামের জন্মই তখনও হয়নি। ওড়িয়া 'চউপাড়ি'কে

সজিয়ে গুছিয়ে 'চতুষ্পাঠী' বানানোর কাজটা কি তখন হয়েছিল? তিনি, বাঙলাভাষী নানান জেলায় [বিশেষকরে মেদনিপুর ও চব্বিশ পরগনায়] সংস্কৃত শিক্ষার টোল খোলা শুরু হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে।... ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বনারসে সংস্কৃত 'কলেজ' খোলা হলেও সেখানে ভাষা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই প্রথমদিকে ছিল না। ছিল নানান ভাষার শব্দের গোঁজামিলে সংস্কৃত নামক প্রাচীন[?] এক ভাষা বানানোর আধুনিক এক কর্মশালা।... সে যাইহোক, রামমোহনের ছাত্রাবস্থায় কোনও টোলের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ঘটনা হচ্ছে এই। চার, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই তিনি গোপনে ভাষাটা শিখে নিয়েছিলেন তাহলে আর এক প্রশ্ন এসে যায় তিনি কি ভাষাটা এত ভাল শিখে ফেলেছিলেন যে দুরূহ তত্ত্বে বোঝাই ওই উপনিষদগুলোর অনুবাদ করার দায়িত্বও তিনি নিয়ে বসলেন?

...এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার [১৭৭১] প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটিতে ল্যাটিন ভাষা সম্পর্কে মামুলী এবং অসম্পূর্ণ কিছু তথ্যই রাখা হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয় না তখনও পর্যন্ত ভাষাটির উদ্ভাবনার কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, হয়েছিল আরও বেশ কিছু বছর পরে। দুই, বইটিতে ভারত সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রাখা হলেও সংস্কৃত ভাষার নামগন্ধ কিছুই ছিল না। বুঝতে কষ্ট হয় না সংস্কৃত ভাষা প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকার গল্প তো দূরের কথা — ঐ ভাষার নামই তখনও পর্যন্ত ঐ কোষগ্রন্থের সম্পাদক বা নিবন্ধ লেখক শোনেন নি।''

''বেদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ পন্ডিতদের নামের তালিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও ছিল। প্রশ্ন আসছেই। এক, বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদিক ভাষা শিখলেন কবে?... তিনি সংস্কৃত ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। সে ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তবে তিনি ঐ বৈদিক ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন —তথ্য দৃষ্টে একথা মেনে নিতে কষ্ট হয়।

দুই, বৈদিক ভাষা যদি তিনি জানতেনই তবে সেকথা তিনি গোপন রাখতে গেলেন কেন?'' ''তবে কি ধাঁধাঁ মার্কা ভাষায় লেখা বেদের কিছু অংশ তিনি নিজেই লিখেছিলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ঐ ঋক বেদের বাংলা অনুবাদ করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে ঐ বাঙলা ঋগ্বেদের ভূমিকায়। রমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ঐ অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫খৃষ্টাব্দে।''

''বাঙলা ঋগ্বেদের ভাষার মান খুব উঁচু ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ধরণের ভাষায় লেখার ক্ষমতা একজনেরই ছিল। আর তা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই। বাঙলা ঋগ্বেদের অংশবিশেষ নয়— পুরো বইটির ভাষার মান একই রকম উন্নত ছিল। একজনের লেখা না হলে ভাষার মান সমান থাকার কথা নয়। আসলে পুরো বইটি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই লেখা।''

''তিনি সরকারী চাকরী করতেন। সহযোগিতা না করে তাঁর উপায় ছিল না। যেমন

উপায় ছিল না মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ামের পন্ডিতদেরও। উনিশ শতকে তথাকথিত রেনেসাঁস এবং সংস্কার আন্দোলনের কর্মকর্তাদের কেউই মনে প্রাণে ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না।'' [পৃষ্ঠা ১৫২]

সংস্কৃত ভাষার শব্দ সম্পদের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র সম্পর্কে অনেক পন্ডিতই গবেষণা করেছেন। ''আসলে নানান ভাষার শব্দ এনে হাজির করতে গিয়ে ঐ ভাষার সমার্থক শব্দের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল।'' সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলোকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ''এক— নব্য সংস্কৃত তদ্ভব, দুই— অসংস্কৃত তৎসম, তিন— সংস্কৃত তৎসম, চার— পন্ডিতি শব্দ।... ভারতের ও বহির্ভারতের নানান ভাষায় চালু থাকা শব্দকে ঘেষে মেজে বানিয়ে নেওয়া শব্দকে 'নব্য' বলা হয়। ভারতের নানান ভাষার অনেক শব্দ সংস্কার না করে অবিকৃত ভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে। ভারতের নানান ভাষার বেশ কিছু শব্দকে সংস্কার করে নতুন নতুন শব্দ না বানিয়ে ঐ সব ভাষারই অন্য অর্থযুক্ত প্রচলিত শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন খাঁটি বাঙলা শব্দ কেন্নো, কানাকানি, কালা, কালি, কেঁচো, কুঁচ, কুঁচেমাছ, খুঁচি, কুলো, কুল, কাঁকলাস কে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত বলে চালানো হয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে কর্ণকীট, কর্ণেজলেক, কারস্করাটিকা, কর্ণাকর্ণী, কল্পকালিকা [লেখার কালি], কিঞ্চিলক, কিঞ্চিলুক, কুঞ্চিক, কুল্য, কুবল, কৃকোলাস প্রভৃতি।

খাঁটি উড়িয়া ভাষা থেকে জোগাড় করা শব্দ কছা, কাছু, কইথ, কহুনী, কখারু, কণিঅর ও কুহুডি হতে সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে কচ্ছ, কচ্ছু, কপিত্থ , কফোনি, কর্করু, কর্ণিকার ও কুরহেডিকা। উড়িয়া ভাষার কুদযন্ত্রকে সংস্কৃতে করা হয়েছে কুন্দ। 'নেত' শব্দ থেকে করা হয়েছে নেত্র।

মারাঠী ভাষার শব্দ কাঙ্গ, কারলী, কোরাংটা, কুল্লাল, কালরা, কোপর, কোদ্রকে সংস্কৃত বানিয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে কঙ্গু, কার্বেল্য, কুরন্টক, কুলাল, কুল্য, কূর্প ও কোদ্রব। এভাবে আরও মারাঠী শব্দ সংস্কৃতে আনা হয়েছে। যেমন— করোটি, কল্মশ, কিল্মিশ, কুরঙ্গ, কুহর, কৃষ্টিবল, কোদণ্ড প্রভৃতি। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় মারাঠী শব্দ অগাংতুক, অরুতা, অশ্মা, আততায়ী, আপোশন, আংশ, ইথ্যংভৃত, ওল, গোফা, তুপ, থরু, পঠার, রিডা—মোট এই ১৩টি শব্দকে কিভাবে পরিবর্তন করে সংস্কৃত বানানো হয়েছে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন— আগন্তুক, অর্হতা, অশ্মন, আততায়িন, আপেশান, অক্ষ, ইত্থম্ভুত, ওল্ল, গুলফ, তৃপ্র, থাউ, প্রস্তাব, রীটি।

গুজরাতী ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ পাচার করে আনা হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, কডী, কাথো, কাবরুং, কথীর, কুকডো, কুংচী, কুটনী, কূচো প্রভৃতি শব্দগুলোকে যথাক্রমে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে কণ্ডিকা, কদর, কর্বুর, কন্থীর, কুক্কুট, কুঞ্চিকা, কুট্টনী, কূর্চ প্রভৃতি।

এমনিভাবে সংস্কৃত অভিধানে আরও পাচার করে আনা হয়েছে কঞ্চুক, করমর্দ, কলাচি, কলিকা, কালেয়ক, কুলয ও কেদারিকা প্রভৃতি শব্দগুলো হিন্দিভাষা থেকে ঢোকানো হয়েছে। যেগুলো যথাক্রমে কেংচুলী, করৌংদা, কলাই, কলী, কলেজা, কুলথী ও কিআরী শব্দেরই মাজাঘষা রূপমাত্র। কর্বাল, কবীর, কানন, কুপি, কুন্তল, কুরুবিন্দ, কুবলয়, কেউড় প্রভৃতি 'শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকেই চুরি করা হয়েছে'।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহলী ভাষা থেকেও শব্দ এনে বাসানো হয়েছে। কাশ্মীরি ভাষা থেকেও শব্দ নেওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এমনিভাবে পাঞ্জাবী, নেপালী ও মৈথিলি ভাষার শব্দও যোগাড় করে আনা হয়েছে।

এ ধরনের কতকগুলো শব্দের নমুনা নিচে দেওয়া হল। যেমন— কপট, কমল, কলহ, কলি, কান্তি, কিরণ, কিরীট, কিশোর, কীর, কীর্তন, কীর্তি, কুঞ্জ, কুটিল, কুসুম, কূট,কূম, কৃত্রিম, কৃপণ, কেশর, কেতন, কোটর, কৌশল ইত্যাদি শব্দগুলোকে সংস্কার করার দরকার পড়েনি। এই শব্দগুলো বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় আমদানি করা হয়েছে। এগুলোকে অসংস্কৃত তৎসম শব্দ বলতে হয়।

বাংলা ভাষার আরও শব্দ আঞ্জুনীকে অর্জুন, আঁটিকে অস্থি, আমলা কে অম্লান, উঠানকে উত্থান, কাতলা [মাছ] কে কাতর, ক্যাতরা কে কীর্তি, খুদকে ক্ষুদ্র, মসনে কে মসৃণ, হিংসে কে হংস বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

''নানান প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে বেশ কিছু তত্ত্বসমৃদ্ধ শব্দ বানানোর একটা খেলাও হয়েছিল। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

পজ্জ= শূদ্র। ব্রহ্মার পা থেকে জন্মেছিলেন বলেই ওঁদের এই নাম! উরব্য, উরুজ, উরুজন্মন্ = বৈশ্য। ওই ব্রহ্মার উরু থেকে জন্মেছিলেন বলেই এঁদের ওই পরিচিতি! শিরজ = চুল; ব্রহ্মার মাথা থেকে জন্মেও কেন যে ব্রাহ্মণদের ওই নাম হয়নি— এইটাই আশ্চর্যের। বাহুজ = ক্ষত্রিয়। পজ্জ, উরুজ, শিরজ ও বাহুজমার্কা সব শব্দই পণ্ডিতি শব্দ। একশ্রেণীর পণ্ডিতদের ঠকানোর জন্য আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের বানানো কীর্তি এগুলো।''

বৃটিশ আমলে বা মুসলমান মোগল আমলেও ফারসী ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। বৃটিশেরা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উত্থান ও উন্নতি পুরোপুরিভাবে রহিত করতে সরকারি বা আদালতি ভাষা হিসাবে ফারসী ভাষা রহিত করে। এই ফারসী ভাষা থেকে বহু শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক ছিল নিশ্চয়। দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

ফারসী বা পারসী ভাষাটি আসলে পারস্য বা ইরান দেশের। ফারসী ভাষার 'তরঙ্গ'

শব্দ থেকে করা হয়েছে 'তুরঙ্গ', 'নায়েক' থেকে সংস্কৃতে করা হয়েছে 'নায়ক', 'আস্‌তার' থেকে'অশ্বতর'; 'মওম' শব্দ থেকে করা হয়েছে 'মোম', 'নারজীল' থেকে করা হয়েছে 'নারিকেল', 'বাজ' [পাখি] এর কোন পরিবর্তন না করে 'বাজ'ই রাখা হয়েছে। 'গন্দ' থেকে করা হয়েছে 'গন্ধ', 'দার' কে করা হয়েছে 'দ্বার', 'তাব' কে 'তাপ', 'তাম্বুল' [পান] কে তাম্বুলই রাখা হয়েছে। ' আদ্‌রক' থেকে 'আদ্রক', 'শাক্কর' থেকে 'শর্করা,' 'আস্ত্‌' [হয়] কে 'অস্তি', ' আম' কে 'আম্র', 'আব' [পানি] কে করা হয়েছে 'আপ', 'পূর্ণিমাহ্‌' থেকে 'পূর্ণিমা, 'দাৎ' থেকে 'দৈত্য', 'দেও' থেকে 'দেব', 'দুষনাম' থেকে 'দুর্ণাম', 'গ্রেবান' কে 'গ্রীবা', 'গ্রীবেন', 'অঙ্গুঁশত' কে 'অঙ্গুষ্ঠ' [আঙ্গুল], 'অঙ্গীরা' কে 'অ' ঙ্গীর', ' গাও' কে 'গৌ', 'উশতর' থেকে 'উষ্ট্র', 'হপ্তহিন্দু' থেকে সপ্তহিন্দু, 'মাহ্‌' থেকে 'মাস', 'শেগাল' থেকে 'শৃগাল', 'হফতা' থেকে 'সপ্তাহ' এবং 'শদ' থেকে 'শত' করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে যেগুলো উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে অন্যতম ভাষা হচ্ছে আরবী। এই সমৃদ্ধ আরবী ভাষার অনেক শব্দই আমদানি করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। যেমন, আরবীর 'কলম'কে সংস্কৃতেও 'কলম' করা হয়েছে। আরবীর 'আফিয়ুন'কে সংস্কৃতে করে নেওয়া হয়েছে 'অহিফেন', 'কামরু' কে 'কামরূপ' করা হয়েছে। 'দীনার' কে দীনারই রাখা হয়েছে। 'সন্দল' কে 'চন্দন'। আরবীর 'গেনা'কে করা হয়েছে 'গান', 'সানামাক্কী' কে সংস্কৃতে করা হয়েছে 'সোনামুখী', আরবীর 'শিতা' কে 'শীত', 'বাওম' কে করা হয়েছে 'ব্যাম', 'ফালিতাহ্‌' কে করা হয়েছে পলিতা, 'উম্মা' কে করা হয়েছে 'মা', 'মান' কে 'মণ' [ওজনে ব্যবহৃত], 'কাফুর' কে সংস্কৃতে করা হয়েছে 'কর্পূর', 'কার্বাস' কে করা হয়েছে 'কার্পাস', আরবীর 'সতর' কে সংস্কৃতে করা হয়েছে 'ছতর'।

এইসব প্রতিকূল বিষয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু তাতে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করা মুস্কিল। তা নাহলে সংস্কৃত শব্দগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হওয়ারই কথা। আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন, সংস্কৃতর 'প্রচ্ছ' হিন্দীর 'পুছ্‌' থেকে এসেছে যার অর্থ জিজ্ঞাসা করা। এমনি সংস্কৃতে 'অবতরণ', 'কুঞ্চিকা' ও 'অণ্ড'—এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে 'উতার্‌না' [নামা], 'কুন্‌জি' ও 'আণ্ডা' [ডিম] হিন্দী শব্দেরই বাচ্চা মাত্র। এইভাবে বাংলার 'মাছ' সংস্কৃতে 'মৎস', বাংলার 'ডর' বা ভয় শব্দ থেকে সংস্কৃতে হয়েছে 'দর', বাংলার 'ছাল' থেকে 'ছল্লী', 'মাথা' থেকে 'মস্তক', 'মুণ্ডু' থেকে 'মুণ্ড', 'নাক' থেকে 'নক্র', 'বাচ্চা', থেকে 'বৎস', 'ঘাস' থেকে 'ঘাসি', 'খন' থেকে 'ক্ষণ', বাংলায় ব্যবহৃত 'শশুর'- এর বানান পাল্টে করা হয়েছে 'শ্বশুর'। ইংরেজীর 'End' কে সংস্কৃতে 'আণ্ড', 'Tree' সংস্কৃতে হয়েছে 'তরু', 'Horse' সংস্কৃতে 'হ্রেষা' [ঘোড়ার ডাক] হয়েছে, স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ 'Vagina' সংস্কৃতে হয়েছে 'ভগ', 'Greedy'

হয়েছে 'গৃধ্নু', হঠাৎ আঁকড়ে ধরার ইংরেজী 'Grabbed'কে করা হয়েছে 'গৃভীত', 'Right' কে করা হয়েছে 'ঋত' এবং'Night' কে বানানো হয়েছে 'নও'।

সাধারণ পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে কিভাবে চলেছিল ঐ শব্দ এবং ভাষা আমদানির খেলা।

এর বেশ পূর্বে আমরা স্যার উইলিয়াম জোন্স সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। ঐ জোন্স গ্রুপের আরও কিছু মাসতুতো ভাই, সহকর্মী, সহমর্মী ও সহধর্মী পণ্ডিতদের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার দরকার রয়েছে।

স্যার চার্লস উইলকিন্স [Sir Charles Wilkins] ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকযাত্রা করেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। ইনি বিলেত হতে ভারতে আসেন ২০ বছর বয়সে। অর্থাৎ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার একটা বিশেষ ষড়যন্ত্র করতে সফল ও সক্ষম হন তিনি। তাঁর চেষ্টাতেই রটিয়ে দেওয়া হয় তাঁরাই নাকি উদ্ধার করেছেন আসল 'দুর্লভ গীতা'। ১৭৮৫ তে ইংলণ্ডে ছাপা হয় তার ইংরাজী অনুবাদ। ভারতের নব্যদল এতে অবাক হয়—গীতা এমন এক দামী গ্রন্থ যা কুড়িয়ে পাওয়া হীরের মত! আর তা ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির! আমরা তার মর্যাদাই বুঝলাম না! সুতরাং বৃটিশ সরকার সক্ষম হয় গীতা পড়বার বা জানবার একটা পিপাসা সৃষ্টি করতে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলকিন্স সৃষ্টি করেন একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ। কিন্তু ব্যাকরণটা যদিও 'ব্যাকরণ' হয়নি তবুও ব্যাকরণ রচনা হয়েছে—এটাই একটা নতুন পদক্ষেপ। বাংলা ও পার্শী ভাষায় তিনি টাইপ তৈরি করেছিলেন। একটি গবেষণাগার তৈরির প্রয়োজন হয় যাতে থাকবে অনেক বই পুস্তক, মুদ্রা, পুঁথি প্রভৃতি আর প্রত্নতত্ত্বের তথ্য। সেইজন্য ভারতের কলকাতায় তৈরি হয় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান। যেটি পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিচারপতি স্যার জোনস্‌ ১৭৮৪ তে। এইসব প্রচারের জন্য প্রয়োজন হয় একটি পত্রিকা। তাই 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' [Asiatic Researches] নামে একটি পত্রিকারও সৃষ্টি হয়ে গেল সহজেই। ১৭৮৬ তে তাঁর দায়িত্ব পালন করে স্বদেশে ফিরে গেলেন তিনি। দেশে ফিরে একদল ইংরেজ পণ্ডিত নিয়ে ২২ বছর গবেষণা করে প্রকাশ করলেন আবার একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ। দেখা গেল প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

হ্যালহেড [Halhed] জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন ইংরেজ। বাংলায় তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রথমে তিনি ভারতে আসেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করার জন্য। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি বাংলা ভাষায় অনেকগুলো পুস্তক পুস্তিকা রচনা করতে সক্ষম হন। তাছাড়া একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেও নজির সৃষ্টি করেন তিনি। হুগলীতে স্থাপন করেন একটি ছাপাখানাও। তাঁর সৃষ্টি করা কিছু পুঁথি এবং

এদেশেরই সংগ্রহ করা পুঁথি সবই চালিয়েছেন প্রাচীন পুঁথি বলে। সেগুলো প্রচারের প্রাবল্যে এবং ক্রীত দালালদের দালালিতে মূল্যবান দলিল রূপে সমাদৃত হয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে যাতে যুগযুগ ধরে আগামী প্রজন্মকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো যায় সহজেই। এই নিপুণ নায়কের মৃত্যু ঘটে ১৮৩০-এ।

লর্ড মিন্টো [Lord Minto]ঃ ইনিও জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে। ১৮০৭ হতে ১৮১৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জর্জ এলিয়ট [George Eliot]। ওলন্দাজের অধীনে থাকা জাভা দ্বীপের বার্টাভিয়া শহর দখল করেন লর্ড মিন্টো। তিনি অধিকার করতে সক্ষম হলেন কালঞ্জর দুর্গ। বুন্দেলখণ্ডে শান্তিস্থাপনের অভিনয় করেন তিনি। শিখরাজা রনজিৎ সিং-এর সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু শিখরা বুঝতে পারেন যে ওটা সন্ধি ছিল না বরং ছিল দুরভিসন্ধি। কোল্হাপুর ও সামন্তবাড়ীর রাজাদের দস্যু সাজিয়ে দস্যু দমনের নাম করে ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দমন করেন তাদের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাঁর সময়ে নতুন সনদ বা অধিকার প্রদান করা হয়। দেশীয় ভারতীয়দের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে একলাখ টাকা দান, আর খৃষ্টান মিশনারী বা ধর্মপ্রচারকদের সরকারিভাবে সারা ভারতে বিনা বাধায় বা বিনা দ্বিধায় ধর্মপ্রচার মিন্টোর মূল্যবান অবদান। ইংরেজ সরকার তাঁকে লর্ড উপাধি দিতে কার্পণ্য করেননি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল তাঁর প্রাণবিয়োগ।

মিন্টো

স্যার জন অ্যানস্ট্রুদার ব্যারনেট [Sir John Anstruther Baronet] ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বড়মাপের বুদ্ধিজীবী। ভারতে তাঁকে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ দেওয়া হয়েছিল। তিনিও বিচারের নামে ইংরেজ সরকারের অনুকূলেই তাঁর কর্তব্য করতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের মামলার সময় তিনি ছিলেন একজন এসেসর। পার্লামেন্টের সদস্যও হতে পেরেছিলেন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর একটা প্রতিমূর্তি আছে। তিনিও 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্ব।

মিঃ ময়রা [Mr Moira] সাহেব ভূমিষ্ঠ হন ১৭৫৪ তে। তিনি ১৮১৩ থেকে ১৮২৩ এই দশ বছর ধরে ছিলেন ভারতের বড়লাট। কলাকৌশল বা ছলনা করে গোর্খাজাতির মধ্যে ঢুকে তাদেরকেই আবার যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেন তিনি। গোর্খারা ইংরেজদের হিংস্র থাবার আঘাতে পরাজিত হন মর্মান্তিকভাবে। ইংলণ্ড তাঁর প্রতি খুশী হয়ে তাঁর একটা নাম দিলেন মারক্যুইস অব হেস্টিংস [Murcuis of Hestings]। মোটকথা নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন এবং মারাঠাযুদ্ধে মারাঠাদের সর্বনাশ সাধন করে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করার দিকে অনেকটাই সাহস জুগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে।

ময়রা

অকটারলোনি

স্যার অকটোরলোনি [Sir Ochterlony]ঃ ১৭৫৮ তে হয়েছিল তাঁর জন্ম এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হয় পরলোকগমন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সেনাপতি। লর্ড ওয়েলেসলীর সময় তিনি ছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট কর্ণেল। ১৮০৪- এ তিনি পরাজিত করেছিলেন হোলকারকে। ১৮১৫ তে নেপালী সেনাপতি অমর সিংহকে পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে। কলকাতার গড়ের মাঠে মনুমেন্টটি তাঁরই নামের সাক্ষী।

জেমস্ মনরো [James Monroe]ঃ ইনি জন্মেছিলেন ১৭৫৮ তে আর মারা গিয়েছিলেন ১৮৩১-এ। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে তিনি খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব।

তার কারণ তিনি একটি একতার রজ্জুবন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন যেটির খ্যাতি আছে 'মনরো ডকট্রিন' বলে। ঐ ডকট্রিনের বলে ঠিক হয় যে ইউরোপ ও ইউরোপীয় জাতি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাজ্য সম্পর্কে একে অপরের ব্যাপারে মাথা গলাবে না, কেউ কারও শোষণ-শাসনে বিশেষ করে মৌল স্বার্থে তুলবে না কোন বাধা বা আপত্তি। ফলে বৃটিশের শাসন-শোষণ ব্যাপারে ঐ প্রতিশ্রুত দেশগুলো শুধু নিরপেক্ষ থাকেনি বরং করে গেছে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা। ঐ 'মনরো ডকট্রিন' সৃষ্টি হওয়ার ফলে ইংলণ্ড তাদের পদানত দেশগুলিকে শাসন ও শোষণ করতে নানা দেশে অফিস, ঘাঁটি, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতি তৈরি করতে পেরেছিল সহজেই।

ওয়েলেসলি

উইলিয়াম পিট [William Pit]-এঁর জন্ম ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আর ১৮০৬-এ হয় তাঁর পরলোকগমন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। ২৪ বছর বয়সে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হতে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংলণ্ড প্রশাসনের হাতে নিয়ে আসার।

রিচার্ড ওয়েলেস্‌লি মারকুইস [Richard Wellesly Marquies]—ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আর পরলোকযাত্রা করেন ১৮৪২-এ। আমাদের দেশ যখন অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষে জর্জরিত হয়ে পড়ল তখন মিঃ ওয়েলেস্‌লী ইংলন্ড সরকারকে অভয় দিলেন চিন্তার কারণ নেই। ভারতে সংকট যতই হোক কর আদায় অব্যাহত রাখা যাবে। ১৭৯৭-এ ওয়েলেসলীকে করে দেওয়া হয় ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইংলন্ড তথা সারা পৃথিবীকে হতবাক করে দেন—যেখানে করআদায়কারীরা সে বাজারে ৭০লক্ষ টাকা অদায় করেছিলেন, সেখানে ওয়েলেসলী আদায় করালেন ১৫০ লক্ষ অর্থাৎ দেড়কোটি টাকা। শাসক শ্রেণী খুব খুশী হয়ে নানা পুরস্কার তো দিয়েছিলেনই সেইসঙ্গে 'লর্ড' উপাধি পাওয়া অত্যাচারী শোষক ও শাসককে স্পেনের দূত হিসাবে পাঠানো হয় ১৮০৮-এ।

ডি.ডি.উইলিয়াম কেরি [D.D.William Carey] ঃ ১৭৬১-তে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্মগুরু বা ইংরেজ মিশনারী। কলকাতায় এসে তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্যাপটিস্ট মিশন' এবং বাংলাভাষায় কথা বলা কোটিকোটি মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন তিনি। ওদিকে আগেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত বাংলা ভাষাকে অখ্যাত করে তুলতে কাল্পনিক সংস্কৃত ভাষাকে আকর ভাষা ধরে নিয়ে বাংলা ভাষাকে তার দুহিতার দুহিতা অর্থাৎ কন্যার কন্যা বানাবার ব্যবস্থা।

উইলিয়াম কেরি

১৭৯৯খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীর শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মিশন। তাঁরই চেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হয় একটি ছাপাখানা। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছাপা হোল একটি অভিধান। যেটির শব্দ সংখ্যা ছিল আশি হাজার। সে বাজারে সেটির মূল্য ছিল ১২০টাকা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে বেশির ভাগ শব্দকেই সংস্কৃত থেকে সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা হোল। ব্রিটিশ ব্রেনের বাহাদুরী স্বীকার করতেই হয়—সেই থেকে আজও কোটি কোটি মানুষকে এই বোঝানো হচ্ছে, সংস্কৃত ভাষাই original ভাষা আর বাংলা তার নাতনি ভাষা। তার পরবর্তী কালেই 'ইণ্ডিয়া মেড' সংস্কৃত পণ্ডিতদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে বাংলা ভাষাকে সবসময় যেন নিকৃষ্ট বলে প্রচার করা হয়। পণ্ডিতেরাও প্রভুদের আদেশ পাওয়া মাত্র বাংলা ভাষা সম্পর্কে লিখে গেছেন, ''তখন খাঁটি বাঙলা ভাষার নাম ছিল সংস্কৃত হইতে ভ্রষ্ট— 'অপভাষা' 'অপভ্রষ্ট ভাষা' বা 'ইতর ভাষা'. [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১৯৯১- এ ছাপা, প্রথম ভাগের ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। তাঁর চেষ্টায় বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ। এই সুদক্ষ শিল্পীর পরলোকযাত্রা হয় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে।

স্যার টমাস মনরো [Sir Thomas Monroe] ঃ ১৭৬১-তে এঁর জন্ম এবং ১৮২৭-এ ঘটে তাঁর মৃত্যু। তিনি ছিলেন একজন বৃটিশ সৈনিক। মাত্র ২১ বছর বয়সে ভারতে এসেছিলেন তিনি। 'মহীশূরের বাঘ' বলে পরিচিত বীর হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র বীর

টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধই তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতারণা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ঘুষ ও শঠতায় তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। টিপুর কর্মচারিদের এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সামরিক নেতাদের মন মাতানো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণায় জয়লাভ করেছিলেন তিনি। অবশেষে টিপু সুলতানকে নিহত হতে হয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে।
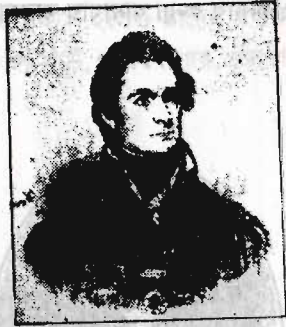
মনরো

মাদ্রাজে Riotwari [রায়তওয়ারী] চুক্তি সম্পাদন করে দ্বিতীয় রেকর্ড করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারি যুদ্ধে ভারতীয়দের নিষ্ঠুর ও হিংস্র কঠোরহাতে নিয়ন্ত্রণ ও দমনের নামে ধ্বংস করেন তিনি। বৃটিশ সরকার তাঁর কাজে খুশি হয়ে তাঁকে বানিয়ে দেয় মাদ্রাজের গভর্নর। সেইসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মহানায়ক মনরো পেয়ে গেলেন 'স্যার' উপাধি।

মিঃ হেনরি টমাস কোলব্রুক [Henry Thomas Colbrook] ঃ ইনি ১৭৬৫ তে জন্মে ১৮৩৭-এ করেছিলেন পরলোকগমন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মূল কাজ ছিল ভারতের অ-মুসলমানদের নতুন কল্পিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকে নিয়ে যাওয়া। সংস্কৃত গবেষকদের মধ্যে তিনিও একজন শিল্পী। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা গবেষণার যে কারখানা তৈরি হয়েছিল সেই কারখানা বা কলেজের তিনি ছিলেন নামকরা অধ্যাপক। ১805-এ তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ তৈরি করেন। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের এবং হাস্যকর সেটা হচ্ছে এই, সংস্কৃত ব্যাকরণটি তৈরি হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়। তাছাড়া বেদ, জৈনধর্ম প্রভৃতি ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ভাষা নিয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি। সাধারণ 'বাবু সমাজ' সহজেই চিন্তা করতে শুরু করল যে, মহাকল্যাণকামী এই বৃটিশ নেতা, সুদক্ষ বিচারপতি, যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেইসব বিষয়ে গবেষণা করা উচিত ছিল বরং ভারতীয়দের! ভারতের নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী অ-মুসলিম সমাজ নতুন কল্পিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকে মুখ ফেরাল সহজেই। কলকাতার বিখ্যাত বৌদ্ধিক কারখানা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি। ঐ পদে ছিলেন সাত বছর। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ' Digest of the Hindu Law on Contacts and Succession' ছেপে বের হয়েছিল ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক [Lord William Bentinck] ১৭৭৪ তে জন্মে মারা যান ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি বিলেত হতে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন এবং ওই পদে তিনি বহাল ছিলেন ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত। ইংলণ্ড ইঙ্গিত দিয়েছিল ভারত থেকে আরও টাকা বিলেতে পাঠাবার। সুতরাং মালবের বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষীদের উপর মোটা মোটা কর নির্ধারণ করে তাদের উপর অত্যাচারের রোলার চালিয়ে মোটা অঙ্কের আয় বাড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনি। চাষীরা যখন বুঝলেন অত্যাচারের সীমা পার হয়ে গেছে তখন তাঁরা বিপ্লব করেছিলেন। বুদ্ধিমান বেন্টিঙ্ক 'ঠগী দমনে'র নাম করে ভীষণভাবে বিপ্লবীদের হত্যা করলেন আর প্রচারের ঠেলায় অশিক্ষিত মানুষেরা বলতে লাগল, যত লোক মরল তারা সবই ছিল 'ঠগী'। কিন্তু আসলে ওটা ছিল বেন্টিঙ্কের নিষ্ঠুর প্রতারণা ও প্রহসন। তাঁর বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন মিঃ মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়।

বেন্টিঙ্ক

বেন্টিঙ্ক আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন হিন্দু সমাজে ধর্মের নামে নরবলী, সতীদাহ, নদীতে জীবন্ত শিশু বিসর্জন ও কন্যা সন্তান হত্যা ইত্যাদি প্রথা। ভারতীয় সামরিক অফিসার ও কর্মচারিদের পেছনে যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তার দেড়কোটি টাকা বাঁচিয়ে খুশী করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইংলণ্ডকে। মুসলমান রাজত্বকাল থেকেই কিছু বিশেষ সম্পত্তি ভারতবাসী ভোগ করতেন যার কোন কর লাগত না। সেইসব নিষ্কর জমির উপর কর নির্ধারণ করে তিনি স্থাপন করেন নতুন কৃতিত্ব। কুর্গ ও কাছাড় রাজ্য গ্রাস করেন তিনি। আর মহীশূরের রাজাকে বৃত্তি দেওয়ার নামে প্রতারণা করে তাঁকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই সাহেব। এতবড় মহান ব্যক্তি তাই সহজেই পেয়েছিলেন 'লর্ড' উপাধি।

ডেভিড হেয়ার [David Hare] ১৭৭৫-তে তাঁর জন্ম এবং ১৮৪২ এ হয় তাঁর জীবন- সমাপ্তি। তিনি ভারতে এসেছিলেন একজন ঘড়ি ব্যবসায়ী হিসাবে। কিন্তু তিনি ছিলেন ঝানু রাজনীতিবিদ। ভারতের ইতিহাসে তাঁকে 'ভারত প্রেমিক' এবং 'মহাত্মা' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের ছাত্রদের জন্য সবসময় তাঁর চিন্তা ছিল যে কি করে

তাদের শিক্ষিত করা যায়। কলকাতার হেয়ার স্কুল গড়ে উঠেছিল তাঁরই প্রযত্নে। সেই বাজারে একসঙ্গে তিনি দিয়েছিলেন ওই স্কুলের জন্য একলক্ষ টাকা। প্রশাসন মহলের ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় বড়কর্তাদের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সারা জীবন ধরে তিনি নাকি শিক্ষাপ্রেমিক হিসাবে দৃষ্টান্ত বিহীন ব্যক্তি। কিন্তু যেটি গোপন আছে সেটি হচ্ছে, এই ভারতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে আমলা দল তৈরি করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু কোটি কোটি হরিজন-তপশিলী-শোষিত-বঞ্চিত গরীবদের এবং গোটা মুসলিম সমাজের কেউ লেখাপড়া শিখুক এটুকু তিনি কেন চাননি তা আজ ভাববার বিষয়। শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষের প্রতি 'মহাত্মা'র এত দরদ আর শতকরা পঁচানব্বইভাগ মানুষের কথা তাঁর স্মরণে এলনা— এটা ছিল সম্ভবত বিলেতি ইঙ্গিত।

স্যার চার্লস্ জেমস্ নেপিয়ার [Sir Charles James Napier] ১৭৮২ তে জন্মে ১৮৫৩-তে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ সেনাপতি। সিন্ধুর আমীরগণের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নেপিয়ারের তৈরি রিপোর্টে এমন এক পরিস্থিতি হয় যে তাঁদের রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ ইংরেজের হস্তগত হয়। তখন দখল করা অংশের ওপর শাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নেপিয়ার স্বয়ং। পরিকল্পনানুযায়ী তিনি সেখানে অসহনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করলেন প্রজাদের উপর। প্রজারা হয়ে উঠলেন বিরোধী। বিপ্লব দমনের অজুহাতে যুদ্ধ সম্ভার নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নেপিয়ার এবং তাঁদের ধ্বংস করে দিলেন চরমভাবে। বিজয়ী হলেন তিনি। ইংরেজরা খুশী হয়ে তাঁকে বানিয়ে দিল সারা ভারতের 'কমান্ডার-ইন-চিফ'। আর সেইসঙ্গে তাঁকে দেওয়া হল বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি।

নেপিয়ের

কর্নেল জেমস্ টড [Col. James Tod] ঃ তিনি জন্মেছিলেন ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আর মারা যান ১৮৩৫-এ। বৃটিশের বাহাদুরীর মধ্যে অন্যতম হোল, যে কোন বুদ্ধিজীবী পন্ডিতকে রাতারাতি ঐতিহাসিক বানিয়ে দেওয়া। জেমস্ টড্ একজন সৈন্যবিভাগের লোকমাত্র। তাঁকে ঐতিহাসিক বানিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল রাজপুতানার ইতিহাস লেখার।

যুদ্ধ-বিশারদ কর্নেল এক পরিকল্পিত সৃষ্টি করা ইতিহাস লিখে ফেললেন। সেই বিখ্যাত ইতিহাসের প্রধান শিক্ষা ছিল ঃ তাদের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা সবকিছু হারিয়ে গেছে মুসলমানদের আক্রমণে। সেই বিখ্যাত ইতিহাসটির নাম 'Analas and Antiquities of Rajasthan'। চটজলদি প্রশংসিত হয়ে গেলেন তিনি। সেটাই বড় কথা নয় তার চেয়েও বড় কথা হোল, এক যুদ্ধ বিশারদকে রাতারাতি ঐতিহাসিক বানিয়ে দেওয়ার বাহাদুরি ব্রিটিশ ব্রেনেরই।

স্যার চার্লস্ মেটকাফ [Sir Charles Metcafe] ঃ ১৭৮৫ তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর পরলোকগমন হয় ১৮৪৬-এ। বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। 'স্যার' উপাধিই প্রমাণ করে বৃটিশ সরকারের গোলামী বা তাবেদারি করতে তিনি ছিলেন স্বার্থক ব্যক্তিত্ব। বিলেত হতে পুরো প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন বড়লাট হয়ে। শাসন, শোষণ ও দমনকার্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা থাকার সময় তিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন তাঁর যোগ্যতার। সংবাদপত্রে খানিকটা স্বাধীনতা দিয়ে উদারতার অভিনয়েও স্বার্থক হয়েছিলেন তিনি। ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতে তাঁর নামে একটি বিরাট অট্টালিকা তৈরি হয় যেটির নাম 'মেটকাফ হল'। ঐ হলেই তৈরি হয়েছিল 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি'। সেই লাইব্রেরি পরে রূপ পেয়েছে ন্যশনাল লাইব্রেরিতে।

মেটকাফ

হোরেস হেম্যান উইলসন [Horace Hayman Willson] ঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৬-তেএবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে করেছিলেন পরলোকযাত্রা। বিলেত হতে এসে কলকাতায় ১৮১৬ হতে ১৮৩২ পর্যন্ত টাঁকশালে কাজ করেছিলেন তিনি। বিখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটির তিনিও ছিলেন একজন সেক্রেটারী। তাঁর আসল কাজ বা গোপন গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন ১৮১১ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত। তখনও ভারতের কোটি কোটি লোক জানতেন না কি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও গবেষণা করে নতুন সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন সভ্যতার জন্ম দেওয়া হচ্ছিল ওই 'সূতিকাগৃহ' এশিয়াটিক সোসাইটিতে।

তিনি সৃষ্টি করেছিলেন একটি ইংরেজী-সংস্কৃত অভিধান। আর লিখে ফেললেন সাতখানা ইংরেজি নাটক এবং প্রচার করা হল ওগুলো নাকি সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। সংস্কৃত নামগুলো যথাক্রমে 'মুদ্রারাক্ষস', 'রত্নাবলী', 'বিক্রমর্ব্বোশী, 'উত্তরাম-চরিত', 'মালতীমাধব', 'মৃচ্ছকটিক' ও 'মেঘদূত'। এই সংবাদে নব্য 'বাবু সমাজে' হৈ হৈ রব পড়ে গেল এবং বলাবলি শুরু হল এইসব মূল্যবান হীরে এতদিন মাটি চাপা ছিল, যা উদ্ধার করেছেন বিলেত হতে আগত করুণাময় ইংরেজ শাসকের দল! ওই নাটকগুলোর মূল লেখক নাকি 'মহাকবি কালিদাস'। অথচ কালিদাসের জীবনীতে আগেই বের হয়েছিল তিনি ছিলেন বোকা এবং মূর্খ; যে ডালে বসে আছেন সেই ডালই কাটছেন। গাছের ডালের ডগায় বসে গোড়ার দিকে কাটা মানেই শাখা বৃক্ষচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়ে গিয়ে হবেন নিহত অথবা আহত। এই 'মূর্খামি' ও 'বোকামি'র মেকআপ দিতে আবার তথ্য দেওয়া হল—সরস্বতী দেবী শুভাশীষ দিলেন যে মুহূর্তে সেই মুহূর্তেই কালিদাস হয়ে গেল 'মহাপণ্ডিত' বা 'মহাকাব্যবিশারদ'।

মিঃ উইলসন আর এক দুরূহ কাজ করে বসলেন — ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ। আধুনিক গবেষকদের ধারণা, প্রথমে সেটা ইংরেজীতে লেখা হয়েছে পরে সংস্কৃত ভাষার কাঠামো গড়ার পর ইংরেজী থেকে ঋগ্বেদের সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে। বিশেষ চিন্তার বিষয় এই, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষের কারও ঘরে এক কপি ঋগ্বেদও পাওয়া গেল না। সাহেব পণ্ডিত মিঃ ম্যাক্সমূলার রাশিয়া থেকে এটা যোগাড় করলেন, আর তা নাকি পৃথিবীতে একটিই ছিল! মিঃ উইলসন আরও প্রচার করলেন, পৃথিবীতে যে যাত্রা-থিয়েটার চলছে তাও প্রাচীন ভারতে ছিল; মুসলমান শাসনেই ধ্বংস হয়ে গেছে সেসব। আর ওইসব নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার প্রমাণে আর এক চিত্তাকর্ষক বই লিখলেন যেটার নাম 'Theatre of the Hindus'।

লর্ড এলেনবরা [Lord Ellenborough] : ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেছিলেন ১৮৭১-তে। তিনি হয়েছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল। ভারতে তৈরি করা 'বাবু সমাজ'কে আরও মুগ্ধ করতে, আরও বশে আনতে, লর্ড এলেনবরা সৃষ্টি করেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন পদ। আর ওই পদটি ভারতীয়দের জন্য ছিল অত্যন্ত সম্মান ও সৌভাগ্যের, যা পাওয়ার জন্য ভারতে নবোদ্ভূত 'বাবু'রা সুকর্ম, কুকর্ম অথবা যে কোন অসম্ভব কর্ম করতেও প্রস্তুত থাকতেন সব সময়ের জন্য। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টে ভারত শাসন বিভাগে মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন তিনি। সরকার খুশি হয়ে তাঁকেও দিয়েছিলেন 'লর্ড' উপাধি।

বপ্ ফ্রান্সিস [Bopp Francis] : ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আর পরলোকগমন করেছিলেন ১৮৬৭-তে। সারা পৃথিবী জুড়ে ইতিহাস সৃষ্টির নামে যে চক্রান্ত চলছিল তাতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ জড়িয়ে ছিল বিশেষভাবে। তাঁর আসল জন্মভূমি ছিল জার্মানীর সেন্সস শহর। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে দেওয়া হয় সংস্কৃত ভাষার উপরে বিশেষ প্রশিক্ষণ। তাঁকেই আবার বসানো হয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষকের পদে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Analytical Comparison of the Sanskrit' প্রকাশিত হয় ১৮২৩-এ। তাছাড়াও অনেকগুলো ব্যাকরণ তৈরি করেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে 'Comparitive Grammar' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌশল একটাই ছিল, এই ভারতের মানুষ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী যেখানেই যাক যেন বুঝতে পারে এইসব দেশে সংস্কৃতের গুরুত্ব আছে ঢের। সুতরাং তারা যেন সংস্কৃত ভাষার প্রতি নমনীয় হয়ে ওঠে অত্যন্ত সহজে। আর ওইসব সভ্যতা ধ্বংসকারী [?] মুসলমান জাতির ওপর যেন হয়ে ওঠে বিদ্বেষভাবাপন্ন।

লর্ড কলিন ক্যাম্পবেল ক্লাইড [Lord Collin Campbel Clide] : ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৮৬৩-তে হয়েছিল তাঁর পরলোকযাত্রা। ১৮৫৭-এর মহাবিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন ভারতের 'কমাণ্ডার-ইন-চিফ'। এই যুদ্ধবিশারদ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সক্ষম হয়েছিলেন নিষ্ঠুর হাতে স্বাধীনতা বিপ্লবীদের দমন ও শায়েস্তা করতে। সেইজন্য ইংরেজ সরকার ওই প্রধান সেনাপতিকে বহু পুরস্কারের সঙ্গে 'লর্ড' উপাধি দিতে ভোলেনি।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান [John Clark Marshman] : জন্মেছিলেন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৭৩-তে। তাঁর পিতা ছিলেন রেভারেন্ড যশুয়া মার্শম্যান। পিতা যশুয়া পাঁচ বছরের শিশু মার্শম্যানকে নিয়ে চলে এলেন ভারতের শ্রীরামপুরে। ২৫ বছর বয়সে খৃষ্টানধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু ইংলণ্ড হতে সদাসর্বদা বুদ্ধি আমদানি করার যে ব্যবস্থা চলে আসছিল সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধি মিলিয়ে মার্শম্যান ঠিক করলেন ভারতে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে হলে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে কোন্ কোন্ জায়গায় বানানো হবে খৃষ্টান ঘাঁটি। ঠিক হয়েছিল ভারতের হৃৎপিন্ড কলকাতা আর হবে বাণিজ্যকেন্দ্রিক স্থান বোম্বাই ও মাদ্রাজে। ওই তিনটি স্থানই সমুদ্র সংলগ্ন যেখানে জলপথে লড়াই করা অথবা লড়াইয়ের মোকাবিলা করা সহজ হবে। সুতরাং অবিভক্ত বঙ্গের ঘাঁটিতেই মার্শম্যান শুরু করলেন তাঁর কাজ।

দেশের মানুষ অধিকাংশই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। বাইবেলের বাণী শোনাতে হলে প্রথমে তাদের শিক্ষিত করতে হবে। তার জন্য দেশীয় ভাষায় বাইবেলভিত্তিক বই ছড়াতে হবে প্রচুর। দেশীয় ভাষায় পত্রিকা সৃষ্টি করে ঐ গতিকে করতে হবে স্রোতস্বতী ও জোরদার। তারপর দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পত্রিকাগুলো পরিচালনা করতে হবে। তার বিনিময়ে তাদের দেওয়া হবে চটকদার উপাধি, চাকরি আর তাদের বংশপরম্পরায় নানা সরকারি সুবিধার সুযোগ।

বাংলায় বর্ণমালা তৈরি, ব্যাকরণ তৈরি, বাংলা মুদ্রণের টাইপ তৈরির কাজ বিলেতের পরিকল্পনা মাফিক পূর্বেই শুরু করেছিলেন মিঃ কেরী। এখন আর এক নতুন পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম পত্রিকা বের করলেন মার্শম্যান। নাম দিলেন 'দিগদর্শন'। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও। নাম রাখা হল 'সমাচার দর্পণ'। ইংরেজ সিভিলিয়ান, কর্মচারি এবং ভারতে ইংরেজী জানা সাহেব- ঘেঁষা মানুষদের জন্য একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হল। সেটির নাম রাখা হল 'Friend of India'। তারপর প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর কলেজ। আরও প্রতিষ্ঠা করা হোল লালবাজারের গীর্জা এবং বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন।

মার্শম্যান এবারে মস্তিষ্ক তৈরির জন্য গবেষণামূলক বই সৃষ্টিতে হলেন তৎপর। হঠাৎ হয়ে গেলেন ঐতিহাসিক। লিখে ফেললেন 'History of India'। আর লিখলেন 'The Life and Times of Carey Marshman and Word' এবং 'Guide to Civil Law In the Presidency of Fort William' প্রভৃতি।

তিনি বহু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। অবশ্য মনে রাখা ভাল ইংরেজ রাজত্বকালে যেসব পত্র-পত্রিকা তাদের স্বার্থে বের হয়েছে তা যে নামেই হোক, তার পিছনে ছিল একটা বড় সংস্থা। সুতরাং ব্যক্তি প্রচেষ্টা শুরু করলেই তত্ত্ব ও তথ্যের ঘাটতি হত না কোনসময়। মিঃ মার্শম্যান ধর্মপ্রচারকের পোশাক পরে থাকলেও ইংরেজ রাজত্ব প্রসারে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা। যেহেতু ইংরেজদের দাক্ষিণাত্য দখলের সময় তিনি স্বয়ং সশরীরে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন; সে প্রমাণ অবিস্মরণীয়।

আর্নল্ড টমাস [Arnold Thomas] ঃ ইনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত রাগ্‌বী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত, বাংলা, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার উপর যে পরিকল্পনা ও গবেষণা হত চক্রান্তকারীরা ওগুলোর নাম দিয়েছিল 'Modern History' অর্থাৎ আধুনিক ইতিহাস। তিনি ওই আধুনিক ইতিহাসের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রমাণিত কাজটি হচ্ছে এই যে, এমন

একটি দল তিনি তৈরি করেছিলেন যাঁরা সারাজীবন পরিকল্পিত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষার গবেষণা ও তার প্রচার প্রসারে করেছিলেন আত্মনিয়োগ।

স্যার পীল লরেন্স [Sir Peel Lawrence] ঃ স্যার পীল লরেন্স জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। বিলেত হতে ভারতে পদার্পণ করেন এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ পেয়ে যান অনায়াসেই। তাঁর বিচারে ভারতের বাঘা বাঘা বিপ্লবীকে বিদায় নিতে হয় বিশ্ব হতে। তাঁর সময়ে বিঘ্নিত হয়নি চিরদিনের জন্য বিপ্লবীদের বন্দী রাখা, বিত্তশালীদের জরিমানার বহরে বিত্তহীন করে দেওয়ার মত নানা চক্রান্ত।

ভারতের সরকারি 'ব্যবস্থাপক সভা'র পদ পেয়েছিলেন তিনি তাঁর যোগ্যতারই বলে। ইংলন্ডের নামজাদা লোক হিসাবে তিনি ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির সম্মানীয় সদস্য। বৃটিশ সরকারের কাছ হতে বহু প্রাপ্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ছিল 'স্যার' উপাধি। ওই স্যার লরেন্স পীলের পরলোকপ্রাপ্তি হয় ১৮৮৪-তে।

ক্রিশ্চিয়ান ল্যাসেন [Christian Lassen] ঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। আর মৃত্যুর বছরটি ছিল ১৮৭৬। তাঁর জন্মস্থান নরওয়ে। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের উপযুক্ত প্রশাসনের প্রেক্ষিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তাঁকে। মিঃ ল্যাসেন বিলেতে বসেই যেসব প্রকল্প তৈরি করেছিলেন ভারতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিস্ফোরণের মত। আরবীয় বা ইরানী সভ্যতা এককথায় মুসলিম সভ্যতাকে আড়াল করে দিয়ে একটা কাল্পনিক সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাস সৃষ্টিতে তিনিও ছিলেন সার্থক কারিগর। তাই মিঃ ল্যাসেন পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় নানা পরিকল্পিত পুস্তক প্রকাশ করে চমক লাগিয়েছিলেন সকলকে। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর নতুন পাঠকদের জন্যে অত্যন্ত 'পুরাতন ও সনাতন' বই বলে যেগুলো চালিয়েছিলেন সেগুলোর নাম 'হিতোপদেশ', 'সাংখ্যদর্শন' ও 'গীতগোবিন্দ'। সবচেয়ে বড় কাজ করে গেছেন তিনি আধুনিকভাবে ভাষাতত্ত্বমূলক 'মহাভারত' অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ 'মহাভারত' পড়তে গিয়ে যেসব চ্যুতি-বিচ্যুতিগুলো ধরা পড়তো সেটাকে তিনি আধুনিক ধাঁচে বানিয়ে নিয়ে প্রকাশ করলেন। অবশ্যই সেটা তাঁর সৃষ্টি-নিপুণতার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। ভারতের লোক তখন না জানলেও বিলেতী শাসক সম্প্রদায় জানত যে এই 'রামায়ণ-মহাভারতই' একদিন কাব্য থেকে মহাকাব্য আর মহাকাব্য থেকে উন্নতি করে হয়ে বসবে পবিত্র ইতিহাস। ওই পবিত্র ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লড়াই করবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভাঙ্গা যাবে কত মন্দির মসজিদ ও গীর্জা আর বয়ে যাবে কত হতভাগ্য মানুষের লাল রাঙা রক্ত।

লর্ড ব্যবিংটন টমাস মেক্‌লে [Lord Babington Thomas Maculey] ঃ জন্ম হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। তাঁরও পরিচিতি আছে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিসাবে। বেণ্টিঙ্কের

আমলে তিনি ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের সদস্য। তিনি অহঙ্কার অথবা সাহসের প্রাবল্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা চান ভারতের মানুষগুলো জন্মগতভাবে ভারতীয় হলেও তাদের চরিত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা তৈরি হবে ইংরেজী কায়দায়। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসের সত্য তথ্যের সঙ্গে অসত্য, বানিয়ে নেওয়া তত্ত্ব ও সৃষ্ট তথ্যকে ইতিহাসে ঢুকিয়ে দেওয়ার শিল্প নিপুণতা। তাঁর লেখা অনেক ইতিহাসের মধ্যে 'History of England', 'Essays' এবং 'Lays of Ancient Rome' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনিও 'লর্ড' উপাধি পেয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই!

মেকলে

মিঃ বর্নুফ ইউজিনি [Burnouf Eugene] জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্যারিসে। সালটা ছিল ১৮০২। তিনি যেমন ইংরেজিতে দক্ষ ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ভাষাতেও নাকি ছিলেন শিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁকে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের একখানি ইতিহাস লেখানো হয়। তখন সাধারণ মানুষ অনুমান করতে শুরু করে যে বৌদ্ধ ধর্ম নামে নাকি এক বিরাট ধর্ম ছিল। বুদ্ধদেব ছিলেন নাকি এক বিরাট ধর্মীয় অবতার। তাঁকে নাকি ভারতের লোক চিনতে বিলম্ব করেছে ঢের। কিন্তু ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা জার্মানীর লোকেরা ওসব নাকি আগেই জানতো। তা না হলে এত উন্নতি করলো কি করে? ভারতের মানুষও ভাবতে শুরু করলো আমরা যদি গভীরভাবে সংস্কৃত, বেদ, বুদ্ধদেব, কালিদাস, পাণিণি, রাম প্রভৃতিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নত হতে পারব — এসবের তথ্যপূর্ণ আলোচনা পরে আসবে। যাইহোক মিঃ বর্ণুফ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে।

মিঃ আউটরাম [Sir James Outram] জন্মেছিলেন ১৮০৩-এ। ভারতে সাধারণ সৈনিক থেকে উন্নতি করে তিনি হয়েছিলেন উচ্চপদস্থ অফিসার। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতীয় বিপ্লব মারাত্মকভাবে দেখা দেয় সেই বিপ্লবকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছল-বল-কল-কৌশল নানা চাতুরীর খেলা দেখিয়ে যারা বিপ্লবীদের ধ্বংস করতে পেরেছিল তাদেরই একজন অন্যতম সার্থক বংশধর এই আউটরাম।

ভারতীয়দের রক্তে রঞ্জিত তাঁর রাঙা হাতে ইংরেজ সরকার তুলে দিয়েছিল মূল্যবান্ প্রাপ্তি হিসাবে ঐ 'স্যার' উপাধি।

মিঃ হ্যালিডে [Sir Frederick James Halliday] ১৮০৬-এ ইংলণ্ডে জন্ম নেন। অত্যাচার করার ট্রেনিং নেওয়ার পর ১৮৫৪-তে তাঁকে করে দেওয়া হয় অবিভক্ত বঙ্গের ছোটলাট। ঐ সময় খেটে খাওয়া সাঁওতাল সমাজ শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে মাথা উঁচু করে বিপ্লব করে। বেইমান ঐতিহাসিকেরা ঐসব পবিত্র বিপ্লবকে 'বিদ্রোহ' বলেছেন, মূল স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলেছেন।
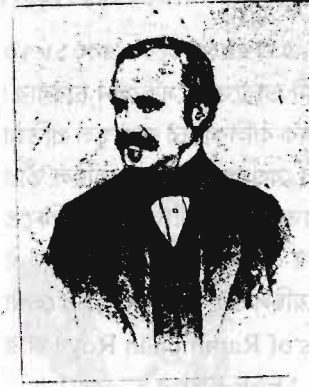
আউটরাম

যাইহোক, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সব একতাবদ্ধ হয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করতে গিয়ে হ্যালিডের নেতৃত্বের সামনে থমকে যেতে বাধ্য হয়। মিঃ হ্যালিডে বাহাদুরি দেখিয়ে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার, পাপাচার প্রদর্শন করেন যাতে সরকার খুশি হয়ে তাঁকে দেয় 'স্যার' টাইটেল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মারা যান তিনি।

ডাফ

মিঃ ডাফ [Rev. Dr. Alexander Duff] ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। বাড়ি স্কটল্যাণ্ড। জন্ম ১৮০৬-এ। ভারতের হৃৎপিণ্ড কলকাতায় ডাফ শুধু পাদরী হিসাবেই আসেননি, তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী ও ঝানু রাজনীতিবিদ্। সেইসঙ্গে শক্তিশালী লেখক। তিনিই ছিলেন ফ্রি চার্চ

ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতায় শুধু রাজধানীই তুলে আনা হয়নি ঐ কলকাতাকে বানানো হয়েছিল নতুন বুদ্ধিজীবী জমিদার ও বাবুশ্রেণী তৈরি করার ঘাঁটি। তখন বেতার বা দূরদর্শন ছিল না। যা ছিল তা হোল সংবাদপত্র বা পত্রিকা। আর এগুলোর মাধ্যমেই বৃটিশ তৈরি করতো তাদের তাবেদার শ্রেণী। একটির পর একটি সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন নতুন পত্রিকা। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ক্যালকাটা রিভিউ'। এটির সম্পাদক ছিলেন ঐ মিঃ ডাফ। আর নানা প্রকারের ছোট বড় পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি ছিলেন সার্থক স্রষ্টা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন তিনি।

মেরী কার্পেন্টার [Mary Carpenter]ঃ ১৮০৭-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭০ সালে মারা যান তিনি। ধর্ম প্রচারের ট্রেনিং নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন চারবার। সেবা করার নাম করে এসেছিলেন এদেশে। অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং আরো ছোটবড় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেগুলোতে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা। ভারত শাসন করার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায়কে সমাজে খুব বড় করে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়েছিল তখন। ঐ প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে একটি বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই মহিলাকে। তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ এর জীবন্ত প্রমাণ। একটির নাম Last Days of Rammohan Roy। আর অপরটি Six Months in India প্রকাশিত হয় ১৮৬৮-তে।

মিঃ গ্রান্ট ১৮০৭ সালে জন্ম নেন ইংলণ্ডে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯৩-এ। স্যার পিটার গ্রান্ট ছিলেন তাঁর পিতা। সুতরাং জন্মসূত্রেই একজন পাক্কা সরকারি তাবেদার হতে পেরেছিলেন তিনি। শোষণ শাসনের আরো ট্রেনিং দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ঐ সিভিলিয়ান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং সরকারকে খুশী করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মধ্যপ্রদেশ ও অবিভক্ত বঙ্গের ছোটলাট হতেও পেরেছিলেন তিনি।

মিঃ ডিরোজিও [Henry Louis Vivian Derozio]ঃ ইনি যদিও সাহেবপুত্র কিন্তু জন্ম এই ভারতেই। তিনি ছিলেন শিক্ষিত উদারচিত্ত কবি। কলকাতার হিন্দু স্কুলের শিক্ষক করে দেওয়া হয়েছিল এই ইংরেজ মনীষীকে। 'হিন্দুস্কুল' নামটিতেই বোঝা যায় তখন ইংরেজরা শুধু হিন্দু অর্থাৎ বর্ণহিন্দুদেরকে সহযোগী ও তাবেদার সম্প্রদায় করে গড়ে তুলতেই ছিল যত্নবান। মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলতে যেটি বোঝায় সেটি হয়েছিল নিঃশেষিত। মুসলমানেরা নাকি অভিমান করে ইংরেজি শেখেনি এই রটনা আজও চলে আসছে। কিন্তু এটা রটনা মাত্র, ঘটনা নয়। বরং ইংরেজ এমন পরিকাঠামো পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যেখানে মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণ করার রাস্তা করে

রাখা হয়েছিল একেবারে রুদ্ধ। তেমনি দলিত অনুন্নত সমাজ, কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতিদেরকে মানুষ বলে মনে করতে কষ্টবোধ করতেন ইংরেজ লর্ড ও স্যারের দল এবং তাঁদের সহযোগী তাবেদার বাবুশ্রেণীর লোকেরা। তাঁদের কাছে এই বঞ্চিতের দল ছিলেন ভোগ্য জীব মাত্র।

ডিরোজিও তাঁর দেশীয় ছাত্রদের স্বাধীন মতামত দেবার ক্ষমতা এবং স্বাধীন রুচিসৃষ্টিতে ছিলেন সক্ষম ব্যক্তি। তাই ছাত্রদের মধ্যে একটি আধুনিক দল সৃষ্টি হয় যাদের বলা হোত 'ইয়ং বেঙ্গল'। তাঁরা স্বাধীন হতে গিয়ে হিন্দু বংশে জন্ম নিয়েও হিন্দু ধর্ম বিরোধী হয়ে ওঠেন। মদ খেতে অভ্যস্ত হন। গরুর মাংসকে প্রিয় খাদ্য মনে করেন এবং ঠাকুর-দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিলেন কঠিনভাবে। এথেকে এটাও মনে করা কঠিন নয় যে, ইংরেজ পুত্র কবি ডিরোজিও যত স্বাধীনতার শিক্ষাই দেননা কেন তাঁরা কিন্তু কখনো ভাবতে শেখেননি যে মুসলমানদের কেন দাবিয়ে রাখা হয়েছে? অনগ্রসর জাতি ও আদিবাসীরা কেন বঞ্চিত? মিথ্যা ইতিহাস কেন লেখা হচ্ছে বা হয়েছে? 'ইয়ং বেঙ্গল' দলে ঠাকুর দেবতাকে গালি দেওয়া, গো-মাংস খাওয়া, মদ পান করার অভ্যাসগুলো কিন্তু খৃষ্টান ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'কে খৃষ্টান ধর্মের দিকেই কয়েক সিঁড়ি উঠিয়ে দিয়েছেন মাত্র। এই মহান কবির সৃষ্টি ইয়ং বেঙ্গল দলে একজনও মুসলমান অথবা 'ছোটলোক' [হরিজন বা উপজাতি] ছিলেন না কেন এটা ভাববার বিষয়। ১৮০৯-এ তাঁর জন্ম হয়ে অকাল মৃত্যু হয় ১৮৩১-এ।

ডিরোজিও

লর্ড ডালহৌসী [Marquis of Dalhousie] জন্মগ্রহণ করেন ১৮১২-তে। শোষণ শাসনে সুদক্ষ এই নেতাকে করে দেওয়া হয়েছিল ভারতের গভর্নর জেনারেল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে হয় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশ যুদ্ধ। তাঁর সময়েই দুটি আইন সৃষ্টি করা হয়। একটি হচ্ছে ঐ প্রকার যুদ্ধ করে কোন অঞ্চল দখল করা চলবেনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাজা মহারাজাদের ঔরসজাত পুত্র না থাকলে দত্তক পুত্র নেওয়ার যে নিয়ম ছিল তার বিলোপ সাধন।

শিক্ষিত তাবেদার ও আমলার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপন করা হয় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক ডাকঘর তাঁর সময়েই বিশেষ রূপ লাভ করে। ভারতে টেলিগ্রাফ ও রেলপথ নির্মাণ তাঁর উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর পদক্ষেপ। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নতুন গবেষকদের ধারণা টেলিগ্রাফ ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নয়, বরং স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ পেয়ে সাহেবদের পক্ষে ভারতবাসীদেরকে শাসন ও শায়েস্তা করার সুবিধার জন্যই স্থাপিত হয়। আর রেলপথ নির্মাণে ভারতের চাল, গম, পাট, তুলো ও নীল প্রভৃতি সম্পদ ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয় বন্দরে বন্দরে। তারপর বিলেতের জাহাজযোগে সেগুলোকে পাচার করতে ইংলণ্ডের জন্য তৈরি হয় একটি স্বর্ণযুগ। সরকারের এই প্রভুভক্ত নেতা 'লর্ড' উপাধি বুকে করে পরলোকগমন করেন ১৮৬০-এ।

ডালহৌসী

লর্ড ক্যানিং [Earl of Canning] জন্মগ্রহণ করেন ১৮১২ সালে এবং পরলোকগমন করেন ১৮৬২-তে। তিনি ১৮৫৬-তে হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল। ১৮৫৭-তে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে রটানো ঐ মহা আন্দোলন বৃটিশ শাসক শ্রেণী তাদের তাবেদার শ্রেণীর সহযোগিতায় দমন করতে সক্ষম হয় কঠিনভাবে। ঐ সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে নিয়ে নেন নিজের হাতে। আর এই সময় হতেই গভর্নর জেনারেল পদটি পরিবর্তিত হয়ে বড়লাট বা

ক্যানিং

ভাইসরয় পদের সৃষ্টি হয়। এই নতুন বড়লাট সাহেব শোষণ শাসনের কাজে বড় বড় নজির সৃষ্টি করে সক্ষম হন 'লর্ড' উপাধি নিতে।

মিঃ জেমস্ লঙ [Rev. James Long] জন্ম নেন ১৮১৪-তে। তিনি ছিলেন একজন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। তাঁকে ১৮৪২-এ চার্চ মিশনারী সোসাইটির প্রচারকের পদে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়। ইংরেজী ভাষার ঐ পণ্ডিত বাংলা ভাষাও জানতেন খুব ভালই। তিনি বাংলা ভাষায় নানা প্রকার বই পুস্তক লিখেছেন। তাছাড়া নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনিই। সেইজন্য নীলকর সাহেবরা মানহানির মামলা দায়ের করে তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে তাঁর একহাজার টাকা জরিমানা আর জেল হয়েছিল একমাস। অনেকের মতে এটা মিঃ লঙ-এর ভারত প্রীতি। আর একদলের মতে ওটা ছিল ইংরেজের কৌশল। জেলখাটা জরিমানা দেওয়া লোকটাকে ব্রিটিশ বিরোধীরা নিজেদের বলে মনে ক'রে, তাদের ভিতরে টেনে নেবে আর সাহেব তাদের গুপ্ত সংবাদ জেনে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারবেন শাসকদের কাছে। শেষের যুক্তিটিও উড়িয়ে দেওয়া যায়না কারণ মিঃ লঙ সারা জীবন নিষ্পেষিত নিপীড়িত মুসলমানদের কাছেই যাতায়াত করতেন বেশি। মিঃ লঙ-এর মুসলিম প্রীতির যেমন আধিক্য তেমনি মিঃ হেয়ারের ছিল হিন্দু প্রীতির আধিক্য। এসবই যেন নিষ্ঠুর রহস্য! তিনি পরলোকগমন করেন ১৮৮৭-তে।

স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম [Sir Alexander Canningham] : ১৮১৪-১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনকাল। তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধ বিশারদ। তাঁর নিজস্ব যোগ্যতায় উন্নত হয়ে তিনি হতে পেরেছিলেন ভারতীয় সেনা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। চটজলদি একদল ঐতিহাসিক বানানোর কাজে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনিও। অতএব অস্ত্রনবীশকে এগিয়ে আসতে হল কলমনবীশ হয়ে। তিনি শুধু একজন বড় ঐতিহাসিকই হলেন না সেই সঙ্গে তাঁকে বানিয়ে নেওয়া হল এক বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদও। তিনি তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলে বিরাট এক গ্রন্থ লিখে ফেললেন, যেটার নাম ছিল 'The Book of Indian Eras'। এছাড়াও তাঁর লেখা আরও অনেক গ্রন্থ আছে তবে এটিতেই তিনি ইতিহাস জগতে হয়ে গেলেন বিখ্যাত। তিনিও পেয়েছিলেন উপযুক্ত পুরস্কারের সঙ্গে 'বোনাস' হিসাবে 'স্যার' উপাধি।

অটোভন বিয়ট লিঙ্ক [Ottovon Boht Link] জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৫-তে আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের সেন্ট পিটার্সবার্গ ছিল তাঁর জন্মস্থান। তিনি ইংরেজী পণ্ডিততো ছিলেনই সেইসঙ্গে ছিলেন আরবী ও সংস্কৃত ভাষারও খ্যাতনামা পণ্ডিত। সংস্কৃত কাব্য 'শকুন্তলা' ও 'পাণিনি ব্যাকরণ' প্রকাশ করে প্রশংসা অর্জন করেন

তিনি। মিঃ ওয়েব, মিঃ রথ এবং মিঃ বিয়ট লিঙ্ক সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন একটি সংস্কৃত অভিধান। কিন্তু মূল কৃতিত্ব বিয়ট সাহেবরই।

স্যার উইলিয়ামস মনিয়ার [Sir Williams Monier] ঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৯-এ এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইংরাজী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। সংস্কৃত ছাড়াও অনেক চাপা পড়া প্রাচীন ভাষারও নাকি পণ্ডিত ছিলেন তিনি। বিলেতের হেলিবিরি ও অক্সফোর্ড কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকও হয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের একটি গবেষণাগারেরও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, যেটার নাম ছিল Indian Institute। ওই গবেষণাগারে ভারত প্রশাসনের যোগ্য মগজ তৈরি হোত তারপরে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হোত ভারতে। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় হিসাবে কয়েকটি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হোল 'Brahminism', 'Hinduism', 'Buddhism', 'Indian Epic Poetry' ও 'Indian Wisdom'। শুধু ইংরেজীতেই নয়, সংস্কৃততেও কেরামতি ছিল তাঁর। 'ইংরেজী-সংস্কৃত' ও 'সংস্কৃত-ইংরেজী'—এই দুটি অভিধান প্রকাশ করেও সরকারের অনুকূলে বিরাট কাজ করেছেন তিনি। সুতরাং 'স্যার' উপাধি পেতে বিলম্ব হয়নি তাঁর।

আলেকজেন্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া [Alexandrina Victoria] ঃ ১৮১৯-এ তাঁর জন্ম হয়েছিল। কুমারী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হওয়ার তিন বৎসর পর বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন প্রিন্স আলবার্ট। ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন উদীয়মান নব্যসমাজ তাঁকে 'ভারতের রাণী' উপাধি না দিয়ে 'ঈশ্বরী' উপাধি দেয়, ফলে তাঁর নামটি দাঁড়ায় 'ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া'। তাঁর সময়ে ঘটেছিল মহাবিপ্লব বা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ আর ঘটেছিল বুয়োর ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ওই 'ঈশ্বরী'র হয়েছিল মৃত্যু।

জন ডাওসন [John Dowson] ঃ এঁর জন্ম হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮১-তে হয় তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। ওই বিলেতী সাহেবের ইতিহাস গবেষণা ভারতের সমগ্র মানুষের জন্য ছিল না, ছিল বরং তথাকথিত উচ্চ বা ভদ্র হিন্দু সমাজের জন্য; তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলোর বিষয় ও নামকরণ লক্ষ্য করলে প্রমাণিত হবে তা। যেমন, 'Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion'। আর একটি চিত্তাকর্ষক বই 'History of India as Told by its Historians'। মোটের উপর এই বই দু'টি লিখে তিনি হয়েছিলেন যশস্বী।

থিয়োডোর গোল্ডস্টুকার [Theodore Goldstucker] ঃ তিনি ১৮২১-এ জন্মে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে করেন পরলোকযাত্রা। তিনি ছিলেন জার্মানীর সংস্কৃত পন্ডিত। বৃটিশ সরকার লন্ডনে এনে কাজের উপযুক্ত বানিয়ে নিয়ে একেবারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক বানিয়ে দেয় তাঁকে। ভারতবর্ষের লোকের অবাক হবারই কথা যে, সংস্কৃত এতবড় আন্তর্জাতিক ভাষা! লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিভাগ আছে! শুধু তাই নয় জার্মানী এবং ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত বিভাগ বিদ্যমান!

বিদেশী সাহেবদের ওইসব সংস্কৃত বা প্রাচ্যভাষা শেখার এত তোড়জোড় এই জন্য ছিল যে তাঁদের তৈরি করা ওইসব ভাষায় কাজ চালাবার যোগ্যতা অর্জন করলেই তাঁরা চাকরি পেয়ে যেতেন সহজে। অথচ বাস্তব সত্য এটাই যে, আজও পৃথিবীর কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতেও সংস্কৃত এবং তথাকথিত ইতিহাসে লিখিত আজগুবি ভাষাগুলোর অস্তিত্ব নেই মোটেই। মিঃ স্টুকার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্যে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিনি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তাছাড়াও তিনি বহু সংস্কৃত পুরাণাদি ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকেরও লেখক।

রোঠ, রুডলফ ফোন [Roth Rudolph Von] জন্মগ্রহণ করেন ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৯৫-এ ঘটে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি। এই সাহেব সারাজীবন বেদ, সংস্কৃত ভাষা, বৈদিক যুগ, বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন। ফলে তিনি পেয়েছিলেন ওইসব বিষয়ের বড় বড় বিভাগীয় গবেষণাকেন্দ্রের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি সংস্কৃত-জার্মান অভিধান লিখেও পেয়েছেন প্রশংসার প্রাচুর্য।

লর্ড মেয়ো [Lord Mayo] ঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল ওই বিখ্যাত নেতার। ১৮৫৭-র মহাবিপ্লবের পর হতে মুসলমানদের দমনের নামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, জরিমানা, জমি-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি কাজ যেভাবে চালিয়েছিলেন তা ছিল ইংরেজ সরকারকে মুগ্ধ করার মতই। তিনি তখন ছিলেন ভারতের শক্তিশালী বড়লাট। আজমীর কলেজের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। শিক্ষার প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান, কিন্তু মুসলমান জাতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল এই পরিকল্পনাগুলো। ছোটলোক সম্প্রদায়ও [?] তাঁদের হিসাবের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। প্রচন্ড অত্যাচারের কৃতিত্বে তাঁকে সরকার দিয়েছিল মনোলোভা 'লর্ড' উপাধি। শের আলি নামে এক মুসলিম বিপ্লবী তাঁকে হত্যার হুমকি দিলে বিচারে তাঁকে ১৪ বছর আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে লর্ড মেয়োকে সরকারের পক্ষ হতে জেল পরিদর্শনে যেতে হয়েছিল ওই আন্দামানে। সেই সময় বিপ্লবী শের আলির সুযোগ আসে। তিনি তাঁকে চিরদিনের মত শেষ করে দেন শাণিত চাকুর আঘাতে। তাঁর মৃতদেহ সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। তাঁর গুণমুগ্ধ বিলেতি বন্ধু ও দেশীয় দালালরা অনেকে যোগ দেন শোকসভায়। তারপর তাঁর মৃতদেহ নেটিভদের এই অপবিত্র [?] দেশে না রেখে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর জন্মস্থান আয়ার্লন্ডে।

স্যার জর্জ ক্যাম্বেল [Sir George Campbell] ঃ ১৮২৪ ছিল তাঁর জন্ম এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ ছিল তাঁর মৃত্যু বর্ষ। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের পঞ্চম গভর্নর। 'রোডসেস' নামে একটি নূতন কর স্থাপন করে ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সাধারণ অসাধারণ প্রত্যেক ভারতীয় কয়েদীর জন্যে সশ্রম কারাদন্ডের প্রচলন তিনিই করেন। সরকারের সহযোগীদের সংখ্যা বাড়াতে সাব ডেপুটি কালেক্টর পদের সৃষ্টি করেন তিনি। তাঁর সময়ে অভাব অনটনে সর্বহারার দল [গাড়ো, দফলা ও আদিবাসী] 'বিদ্রোহী' হয়ে বিপ্লব করেন। জঙ্গী নেতা সেগুলো দমন করেছিলেন মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুরভাবে। তিনি শুধু জঙ্গী নেতাই ছিলেন না, তাঁর লেখার হাতও ছিল মজবুত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে 'A Handbook of the Eastern Questions', 'Statistics', এবং 'Ethnology'। এইরকম একজন জঙ্গী শোষক ও শাসক-বৃটিশের কাছ হতে সহজেই পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

স্যার উইলিয়াম হাগিন্স [Sir William Huggins] ঃ ১৮২৪-এ জন্মগ্রহণ করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ঘটে তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি। বিলেতের 'রয়াল অ্যাসট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি', 'বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'রয়াল সোসাইটি'র তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ওই সংস্থাগুলো ছিল ভারত শাসন ও শোষণের ষড়যন্ত্র করার কারখানা মাত্র। জোতির্বিদ্যাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁকেও 'স্যার' উপাধি দিয়েছিল সরকার।

ফ্রেডারিক ওয়েবের [Albrecht Friedrick Von Weber] ঃ ১৮২৫ হতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনকাল। ইনি জার্মানীর বাসিন্দা। ইংরেজের সংগ্রহ করা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে বানিয়ে নেওয়া তিনিও এক সংস্কৃত জানা পন্ডিত। তিনি 'শুক্ল ও যজুর্বেদ ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন।' এই 'বিশুদ্ধ' শব্দটি বড়ই চমকপ্রদ। অর্থাৎ পূর্বের সংস্করণ ছিল অশুদ্ধ। আসলে বুদ্ধির উপর বুদ্ধি, জ্ঞানের উপর জ্ঞান চড়িয়ে সবসময় বিবর্তিত হচ্ছিল সংস্কৃত ভাষার পরিকল্পিত দেহ।

জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের সরকারি গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুস্তকগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'-এর মত ব্যাপার। ইংলন্ডের বুদ্ধিজীবীরা অনেক পূর্বেই ঐ ব্যবস্থা করে রেখে এসেছিলেন জার্মানীতে।

টমাস হচকিন গ্রিফিথ র‍্যালফ [Thomas Hotchkin Griffith Ralph] ঃ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল এই সাহেব পন্ডিতের। তিনিও নাকি সংস্কৃত জানা এক বিরাট পন্ডিত। তাই বেনারস বা কাশী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক করে পরে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ

প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নামে। ভারতে আরও বেশি বেশি করে সংস্কৃত পন্ডিত তৈরির কথা চেপে বসেছিল তাঁর মাথায়। সেইজন্য তিনি একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেন। যেটার নাম ছিল 'পণ্ডিত'। তাঁর নামানুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যেটার নাম 'গ্রিফিথ' পুরস্কার।

মিঃ ডাফরিন [Mr. Dufferin] ঃ ১৮২৬-এ জন্মে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন তিনি। ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন ১৮৮৪ তে। ১৮৮৮ পর্যন্ত ছিল তাঁর ওই পদ। ব্রহ্মদেশকে জয় করে তিনি ইংলণ্ডকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী লেডি ডাফরিন ছিলেন স্বামীর ছায়ার মত। কলকাতার লেডি ডাফরিন হসপিটাল আজও স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের নাম।

হেলেনা পিট্রোভনা ব্লাভস্কি [Helena Petrovna Blavatsky] ঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৯১-এ করেন পরলোকযাত্রা। তিনি ছিলেন একজন খৃষ্টান মহিলা। তাঁকে আমদানি করা হয়েছিল রাশিয়া থেকে। তাঁর স্বামীকে তিনি ত্যাগ করেন। ওই বিচ্ছেদের পর তিনি পর্যটন করতে আসেন ভারতে। ভারতের হাবভাব বুঝে আবার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যান তিনি। ওই আমেরিকায় ইংরেজদের তৈরি একটি নতুন তত্ত্ব পেলেন যেটিকে বলা হয় 'ভূতপ্রেত তত্ত্ব'। যুদ্ধ বিশারদ কর্ণেল মিঃ অলকট তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'থিওজোফিক্যাল সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজদের টার্গেট ছিল সমগ্র ভারতবাসীকে খৃষ্টান করা। কিন্তু ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মের প্রভাবকে নিষ্প্রভ করতে কিছু কাল্পনিক ভাষা ও সভ্যতার সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাদের। দেশি বিদেশি হাতে গড়া সাধুসন্ত, স্বামীজি-বাবাজি, ঋষি-মহর্ষি তৈরি করারও প্রয়োজন হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম, চৈতন্যধর্ম্য, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, সহজিয়া ধর্ম, বাউল ধর্ম ও তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মগুলোর মধ্যে কোনটির অস্তিত্ব ছিল ক্ষীণ আবার কোনটির অস্তিত্ব অনেকের মতে ভারতে কেন, পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল না। এই 'থিওজোফিক্যাল সোসাইটি' ওগুলোর মতই আর একটি চক্রান্ত। এঁরই লেখা 'Secret Doctrine' পড়ে নাকি 'নাস্তিক' নেত্রী অ্যানি বেসান্ত 'আস্তিক' হয়ে যান। আমেরিকা হতে কোন এক ইঙ্গিতে তিনি আবার চলে আসেন কলকাতায়। আশ্রয় পান ঠাকুরবাড়িতে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একেবারে অন্তঃপুরে ওই 'ভূতের মা' ব্লাভস্কি স্থান পেলেন। সে এক চাপা পড়া বিস্ময়। তিনি অনেক ম্যাজিককে চালাতেন 'অলৌকিক' বা 'Miracle' বলে। কিন্তু আবার কোন এক গোপন ডাকে ইংলন্ডে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে একটি পত্রিকা পরিচালনা শুরু করেন, যেটির নাম 'Lucifer The Light Bringer'।

লর্ড রবার্ট এডওয়ার্ড লিটন [Lord Robert Edward Lytton] ঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৯১-এ যাত্রা করেন পরলোকে। তাঁর বাবা ছিলেন

লর্ড বুলওয়ার। বিলেতের সব রকম প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতে এসে সারা ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হতে পেরেছিলেন। ১৮৭৬-১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বড়লাটের পদে আসীন ছিলেন তিনি। তাঁর সময়েই রাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত রাজরাজেশ্বরী' উপাধি পেয়েছিলেন। আর ঐ সময় ঘটেছিল আফগান যুদ্ধ। তিনিই সমস্ত সংবাদপত্রের উপরে আইন চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমন কোন কিছু ছাপা যাবে না যা বৃটিশ সরকারের স্বার্থ বিরোধী। মুসলমান আমল থেকে প্রয়োজনে অস্ত্র রাখার যে অধিকার ভারতবাসীর ছিল মিঃ লিটন তা রহিত করে নতুন আইন চালু করেন। সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন অস্ত্র রাখতে পারবে না কেউই। এই রকম নেতাকে বৃটিশ সরকার সানন্দেই দিয়েছিল 'লর্ড' উপাধি।

স্যার এডউইন আরনল্ড [Sir Edwin Arnold] : ১৮৩২ এবং ১৯০৪ ছিল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসা হয় ভারতে এবং পুণার সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল পদে বসানো হয়। উচ্চবংশীয় হিন্দুদের মুসলমান সভ্যতা থেকে টেনে বের করে এটা বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল যে, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে মুসলমান শাসকবৃন্দ। আরও বোঝাবার ব্যবস্থা হয় যে, করুণার জীবন্ত প্রতীক ইংরেজ প্রশাসক ও বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উপরে তুলে উন্নত করতে বদ্ধপরিকর। মিঃ এডউইন যেসব মারাত্মক বইগুলো লিখেছিলেন সেগুলো বৃটিশের তৈরি হঠাৎ সৃষ্ট ঐতিহাসিকদের জন্য হয়ে উঠেছিল আকর গ্রন্থের মত। একটি হচ্ছে 'Light of Asia' এবং অপরটি হচ্ছে 'Light of the World'। প্রথম বইটিতে অনেক দুরূহ বুনিয়াদী বিষয় বর্ণিত। এইরকম একজন যোগ্য ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে বিলম্ব হয়নি বৃটিশ সরকারের। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'স্যার' উপাধি।

গ্রাউস, ফ্রেডারিক স্যামন [Growse Frederick Salmon] : ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৮৯৩-এ পরলোকগমন করেন। তাঁকে বৃটিশ সরকার ভারতে এনে দিয়ে দেন ঐতিহাসিকের পদ। তিনি প্রচার করতে থাকেন যে, মথুরা এক বিরাট ঐতিহাসিক স্থান। মথুরার চাপা পড়া বিরাট ইতিহাস—যা নাকি মানুষ ভুলে গিয়েছিল—স্যামন সাহেব অনেক কষ্ট করে তা উদ্ধার করেন তাদের কল্যাণের জন্য! তুলসীদাসের রামায়ণ যা মানুষের তৈরি করা কাব্য বা উপন্যাস মাত্র ; তিনি ওই রামায়ণের একটা ইংরাজী অনুবাদ করে মানুষের মনে এই বীজ রোপন করেন যে, এটি সাধারণ গ্রন্থ নয়, অসাধারণ ধর্মগ্রন্থ! বৃটিশ চেয়েছিল যে ওই রামায়ণই ভারতের হিন্দুদের নিকট বাইবেল হয়ে উঠুক। তাদের চিন্তাধারা সত্যই প্রশংসনীয়! আজ রামায়ণ ভারতীয়দের জন্য যেন বাইবেলের মতই সম্মানীয়।

মিঃ চার্লস টনি [Tawney Charles] : ১৮৩৭-এ জন্ম আর ১৯২২-এ তাঁর মৃত্যু। প্রথমেই কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক করে দেওয়া হোল তাঁকে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে গেলেন ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ। আরও উন্নতি ঘটিয়ে তাঁকে করে দেওয়া হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। উন্নতি আরও বিবর্তিত হয়ে তিনি হয়ে পড়লেন অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর। এইবার শেষ কাজটি করতে শুরু করলেন তিনি। 'উত্তররামচরিত', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি সংস্কৃত বইগুলোর ইংরাজী অনুবাদ করার ফলে হৈচৈ পড়ে গেল চারিদিকে। এতবড় পণ্ডিত! বিরাট পন্ডিত! সংস্কৃতে অগাধ পান্ডিত্য! সংস্কৃত থেকে ইংরেজী করা—সে এক বিরাট ব্যাপার! একদল আধুনিক সূক্ষ্ম গবেষকদের মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজী বইগুলো আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন সংস্কৃত ভাষা খাড়া করে দাঁড় করাবার জন্যে প্রচন্ড চেষ্টা চলছিল বিলেতের সংস্কৃত-কারখানায়। লন্ডনের এইরকম আরেকটি কারখানার নাম 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী'। টনিকে নিয়ে যাওয়া হোল সেই লাইব্রেরিতে এবং করে দেওয়া হল চিফ-লাইব্রেরিয়ান। সারা জীবন তিনি ওই লাইব্রেরিতে থেকে পরিদর্শক ও গবেষকদের অনেককে সংস্কৃতমুখী, সংস্কৃতভক্ত ও সংস্কৃতপ্রেমিক বানিয়েছেন অব্যর্থভাবে।

ভাইকাউন্ট মর্লি [Viscount Morley] : ১৮৩৮-এ জন্মগ্রহণ করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে করেন পরলোকগমন । তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। লর্ড মিন্টোর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন তিনি। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারত সচিবের পদে। ভারতে তাঁদের প্রবল প্রভাব ফেলতে দরকার হয়েছিল আরও উন্নতমানের পত্রিকা। তাই তিনি কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন নিজেই। এগুলো হল যথাক্রমে 'Morning Star', 'Fortnightly Review' এবং 'Pall Mall Gazette'।

উইলিয়াম হান্টার [Sir William Hunter] : ১৮৪০-এ তাঁর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। বিখ্যাত সিভিলিয়ান, সাংবাদিক ও শক্তিশালী লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর যোগ্যতার জন্য Director General of Statistics পদে তাঁকে বসানো হয়েছিল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮১ হতে ১৮৮৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য এবং পরামর্শদাতা। ১৮৮৬-তে তাঁকে করে দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তিনি এডুকেশন কমিশনের প্রেসিডেন্টের পদটিও পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নতুনতম অবদান বড়ই অদ্ভুত ও অমূল্য। সত্য মিথ্যা যত শিলালিপি, পুঁথি, মুদ্রা, মোহর প্রভৃতির উপরে যে সমস্ত লেখা ছিল সেগুলোর ইংরেজী অক্ষরের প্রতিলিপি

তৈরির প্রণালী 'আবিষ্কার' করেন তিনি। আর ওই প্রণালীর নাম দেওয়া হয় 'Huntarian System of Transliteration'। অনেকের মতে এটা প্রগতির নতুন পথের অভিনব পদক্ষেপ আর একদল আধুনিক বিচক্ষণ পন্ডিতের মতে ভারত তথা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে ভুল বোঝাবার এটা একটা প্রকান্ড ধাপ্পাবাজি। সত্যি কথা হচ্ছে এই, যে সমস্ত শিলালিপি ও তাম্রলিপি পাওয়া গেছে বলে রটিত, যেগুলো আঁকাবাঁকা নানা দাগের সমষ্টি; তা পাঠোদ্ধার করা কোন লোকের পক্ষে সম্ভব নয় মোটেই। হান্টার সাহেব সেগুলোকে ইংরাজীতে রূপান্তর বা ভাষান্তরের যে ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তা তাঁর প্রখর বুদ্ধির পরিচয় বহন করলেও সেটা কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক চলমান চক্রান্ত মাত্র।

হান্টার আর এক বিশেষ কাজ করেছেন, যেটা হচ্ছে হিন্দুদেরকে এতদিন বৃটিশ প্রশাসকেরা 'শুয়োরাণী' বানিয়ে নিয়ে কাছে টেনেছে আর 'দুয়োরাণী' মুসলমানদের করা হয়েছে উপেক্ষা। কিন্তু যেহেতু বেশ কয়েকবছর ধরে হিন্দুরাও ইংরেজবিরোধী হয়ে উঠেছে বর্ধমান গতিতে সুতরাং এখন হিন্দুদের উপেক্ষা করে মুসলমানদেরই কাছে টেনে নিয়ে হিন্দুদের শায়েস্তা করা দরকার। তাই মুসলমানদের অবনতির কারণ, মুসলমানদের স্থায়ী বৃটিশ বিদ্বেষের কারণ ইত্যাদি উল্লেখ করে বড় দরদ [!] দিয়ে একটি তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট বের করেন যেটির নাম 'Indian Musalmans'। বইটি পড়ে মুসলমানেরা আশার আলো দেখতে পায়। তারা আরও বুঝতে পারে ইংরেজরা এতদিনে বুঝতে পেরেছে মুসলমান জাতি হিন্দু জাতি অপেক্ষা বেশি যোগ্য [!], চরিত্রবান [!], বীর [!] প্রভৃতি। আরও বুঝলো যে, ইংরেজ তাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে, জমিদারি কেড়ে নিয়ে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ওটাও ছিল বৃটিশের ধোকা বা ধাপ্পাবাজি। কারণ ওই বইটি তিনি তাঁর একান্ত বন্ধু মিঃ হাডসনের নামে উৎসর্গ করেন—সেই মিঃ হাডসন যিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের রাজবাড়ির ২৯ টি কচি বাচ্চা হত্যা করে তাদের কাটা মাথা ঝুড়িতে সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বাদশাহকে।

সে যাইহোক হান্টার সাহেবের প্রত্যেকটি পুস্তক চিত্তাকর্ষক ও প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে 'Annalas of Rural Bengal', 'Statistical Account of Bengal', 'Local Gazetteers' বইগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই 'বিরাট' মানুষটিও পেয়ে গিয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

রীস ডেভিস [T.W. Rhys Davis] ঃ এঁর জন্ম হয় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৩১-এ হয় তাঁর মৃত্যু। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি ছিলেন নাকি এক বিরাট পন্ডিত। ইংরাজীর কথা তো বলতেই হবে না। ১৮৭৮ তে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যেটির নাম 'Buddhism'। আবার আট বছর পরিশ্রম ও গবেষণা করে আর একটি বই লিখলেন যেটির নাম 'Buddhism, Its History and Literature'। সেটা

ছিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন ইসলামধর্ম প্রসারের জোয়ার চলছিল। খৃষ্টান কবলিত দেশের অধিবাসীরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করছিল। কিন্তু একটিও উদাহরণ মিলবে না যে, কোন মুসলিম দেশ খৃষ্টানরা দখল করেছে আর সেই দেশের জনসাধারণ অম্লানবদনে গ্রহণ করেছে খৃষ্টান ধর্ম। অবশ্য একটি মুসলিম দেশ যেটাকে খৃষ্টানরা মুসলিমবিহীন করতে সক্ষম হয়েছে, সেটি হচ্ছে স্পেন। কিন্তু স্পেনের মুসলমানদের খৃষ্টান করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়েছিল সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের হত্যা করা। সেই হত্যাযজ্ঞের তারিখটি ছিল ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। তাই এপ্রিলের ১লা তারিখটিকে বলা হয় 'বোকা এপ্রিল' বা April Fool। যাইহোক, ভারতের উদীয়মান বাবু সমাজের জন্য এমন ইতিহাস সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যেগুলো থেকে প্রমাণিত হবে ইসলাম ধর্ম একটা সামান্য ধর্ম। তার চেয়েও বিরাট ধর্ম ভারতে ছিল যেগুলোর নাম ছিল বৌদ্ধ, হিন্দু, আর্য, জৈন প্রভৃতি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ডেভিস ছিলেন এক সার্থক স্রষ্টা তিনি একটি বই লিখে ফেললেন যেটির নাম 'Buddhist India' [১৯০২]। ভারতের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ধর্ম ও ভাষা সৃষ্টির গবেষণায় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর রত্ন। ইংলণ্ড সরকার লন্ডন ইউনিভার্সিটির মহাপ্রতিষ্ঠানে পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যাপনা করার দায়িত্ব দেয় তাঁকে। বৃটিশ সরকার তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করতে করে দেয় লন্ডনের 'Royal Asiatic Society'র সেক্রেটারী।

অ্যানি বেসান্ত

মিসেস অ্যানি বেসান্ত [Mrs. Annie Besant] ঃ ১৮৪৭-এ হয় তাঁর জন্ম এবং ১৯৩৩-এ হয় পরলোকযাত্রা। তাঁর জন্মভূমি ছিল ইংলণ্ড। দেশ ও জাতিপ্রাণা এই ইংরেজ মহিলার বিয়ের ৫ বছর পরেই হয়ে যায় বিবাহবিচ্ছেদ। তারপর দ্বিতীয় বার তিনি মিঃ ব্রাডলাফ সাহেবের সঙ্গে হন বিবাহিতা। তাঁকে নকল নাস্তিক বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল কোন কমিউনিষ্ট দেশে কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক যোগ্যতা ও লেখার ক্ষমতা দেখে ইংলণ্ড সরকার মতের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতেই পাঠিয়ে দেন তাঁকে। জাতীয়

প্রয়োজনে ভারতে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় প্রয়োজন হয় তাঁকে নাস্তিক হতে আস্তিক বানাবার। পূর্বোল্লিখিত 'Secret Doctrine' বইটি অনুবাদের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ওই সময় অদূরে ও সুদূরে প্রচার চালিয়ে দেওয়া হল যে, ঐ বইটি পড়েই তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং তিনি আর নাস্তিক নন, ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রথম শ্রেণীর মহিলা। আরও প্রচার করা হল যে অ্যানি বেসান্ত একজন ব্রহ্মবাদিনী। আরো নানারকম প্রচারের কায়দায় হিন্দুরা বুঝলেন তিনি তাঁদের, আর রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের লোকেরা জানলেন তিনি তাঁদেরই। বারানসীতে তাঁর দ্বারা ১৮৯৮-এ স্থাপিত হয় 'সেন্ট্রাল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'। নামেই বোঝা যায় ওটাও ছিল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বুদ্ধিজীবী বানাবার কারখানা। ১৯০৭-এ 'থিওজোফিক্যাল সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট হন তিনি। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য কীর্তি হোল দুটি ইংরাজী পত্রিকা তিনি একাই সম্পাদনা করতেন। একটির নাম ছিল 'থিওজোফিস্ট' ও অপরটি ছিল 'নিউ ইন্ডিয়া'। ভারতের নব উদ্ভুত নেতাদের দৃষ্টি পড়ল তাঁর যোগ্যতার প্রতি। তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতের কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্ব করতে দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু মুসলমান সমাজ এবং অনুন্নত হরিজন, সাঁওতাল, কোল-ভিলদের মানুষ বলে মনে করতে স্মরণ ছিল না তাঁরও।

জর্জ ফ্রেডারিক থিবো [George Frederick Thibaut] ঃ ১৮৪৮-এ জন্মগ্রহণ করে ১৯১৫ তে পরলোকগমন করেছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত খৃষ্টান পন্ডিত। জন্মভূমি ছিল জার্মানীর হাইডেলবার্গ। বিলেতে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি সৃষ্টির কারখানার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনিও। মহামতি ম্যাক্সমূলারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হয়ে উঠেছিল আরও উজ্জ্বল। ১৮৭৫ তে জার্মানী থেকে ইংলণ্ড হয়ে একেবারে পৌঁছে গেলেন ভারতের বেনারসে। পেয়ে গেলেন বেনারস কলেজের অধ্যাপকের পদ। কিছুদিনের মধ্যেই থিবোকে করে দেওয়া হল ওই কলেজেরই সংস্কৃতের অধ্যাপক। যোগ্যতার মাপকাঠিতে ওখান থেকে চলে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যোগ দিলেন রেজিষ্ট্রার পদে। কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজী ভাষায় লিখলেন এক সংস্কৃত ব্যাকরণ। দেশের মানুষ ভেবে নিলেন শুধু ইংলণ্ড নয় জার্মানীতেও সংস্কৃত পন্ডিত হওয়া যায়। সুতরাং অনেকে বুঝে গেলেন সংস্কৃত নিয়ে সারা পৃথিবী যেন গবেষণায় মত্ত! তাই সকলকে নজর দিতে হবে সংস্কৃত সমুদ্রের দিকে! মিঃ থিবো ও মিঃ গ্রিফিথ সাহেবের যৌথ চেষ্টায় 'বেনারস সংস্কৃত সিরিজে'র সৃষ্টি।

বৌধায়ণ প্রণীত 'শুল্ব সূত্র' ও 'অর্থ সংগ্রহ' বরাহ মিহির প্রণীত 'সিদ্ধান্তিকা', শাংকর ভাষ্যের সাথে 'বেদান্ত সূত্র', রামানুজ ভাষ্যের সাথে 'বেদান্ত সূত্র' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রের উপরে সৃষ্টিধর্মী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন

এমনভাবে যাতে মানুষের এই ধারণা করতে সহজ হয় যে এসব অঙ্ক-জ্যোতিষাদির যা সব উন্নতি হচ্ছে এর সবই সংস্কৃত-সমুদ্র হতে তোলা মণি-মুক্তো!

মিঃ গ্রীয়ারসন [Mr. Grierson] ঃ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন তিনি। সিভিল সার্ভিস পাশ করে ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা নাকি উল্লেখযোগ্য। আসলে ভারতে আসার আগেই ওইসব সিভিলিয়ানদের ভারতের জন্য রাজনীতির ম্যাজিক দেখাতে 'তৈরি করে' আনা হত। তাঁরই পরিচালনায় সম্ভব হয়েছিল 'Linguistic Survey'। চমক লাগাবার মত কিছু পুস্তক লিখে গেছেন তিনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম করা যায় 'Introduction to Maithaly', 'Language', 'Kaithi Character' এবং 'The Language of India'।

লর্ড হার্ডিঞ্জ [Lord Hardinge] ঃ তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৯৪৪-এ করেছিলেন পরলোকগমন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে ভারতে এসেছিলেন রাজপ্রতিনিধি হয়ে। পদ পেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেলের। তাঁর সময় বিভক্ত বঙ্গকে আবার করা হয় সংযুক্ত। মুসলমান আমলের ভারতের রাজধানী দিল্লী না রেখে কলকাতাকে রাজধানী করে বৃটিশ সরকার। কিন্তু এই লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় আবার কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল রাজধানী। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা তাঁরই কীর্তি। তাঁর সময় ইংলণ্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এলে সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। আর সেই শোভাযাত্রার তিনি ছিলেন একজন প্রত্যক্ষ উদ্যোক্তা। একজন বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় শোভাযাত্রার উপর বোমা নিক্ষেপ করলে হার্ডিঞ্জ সাহেব আহত হন। তাঁকেও 'লর্ড' উপাধি দেওয়া হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই।

লর্ড কার্জন [Lord Curzon] ঃ ১৮৫৯-এ তাঁর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। ভারতে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি আছে। কিন্তু আসলে সেটি সুখ্যাতি ছিল না, ছিল কুখ্যাতি। ১৮৯৯-এ তিনি হয়েছিলেন ভারতের ভাইসরয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন, পুরাতত্ত্ব বিভাগের কার্যের প্রসার এবং বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে আসা বিলাতী নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন তিনি। তারপর ফিরে যান স্বদেশে। দেশে ফিরে তাঁকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় নি বরং ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ভাগ্যবান ব্যক্তিও 'লর্ড' উপাধি পেয়ে ধন্য হন।

লর্ড কারমাইকেল [Lord Carmichael] ঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৯১৬ তে মারা যান তিনি। অবিভক্ত বঙ্গের তিনি ছিলেন শাসনকর্তা। ১৯১১ তে তিনি হয়েছিলেন মাদ্রাজের গভর্নর। তাঁর আমলে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব মঞ্জুর হয়।

তাঁর নামে রংপুরে কারমাইকেল কলেজ ও কলকাতায় স্থাপিত হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ। ব্রিটিশের চোখে যোগ্য বলেই তিনিও পেয়েছিলেন 'লর্ড' উপাধি।

স্যার মাইকেল স্যাডলার [Sir Michael Sadler] : ১৮৬৩ তে জন্মগ্রহণ করে ১৯৪৩-এ হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। অক্সফোর্ডের রাগ্‌বী ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন তিনি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তাঁর এক সম্মানীয় তাৎপর্যপূর্ণ নাম ছিল 'মাষ্টার'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭ তে যে কমিশন বসে তিনি ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। মধ্যশিক্ষা সম্বন্ধে 'রয়েল কমিশনে'রও অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের বিশেষ হিতাকাঙ্খী। তিনি যে একজন বড় বুদ্ধিজীবী তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলোই তার প্রমাণ। সেগুলোর নাম যথাক্রমে 'Moral Instruction and Training' এবং 'Our Public Elementary Schools'। তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করে সরকার তাঁকেও দিয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

স্যার স্টেইন মার্ক অরেল [Sir Mark Stein Aurel] : বুদাপেস্ট শহরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা মিঃ নিকোলাস। ড্রেসডেন ও বুদাপেস্টে শিক্ষা শেষ করে 'ভারততত্ত্ব' শেখার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় ভিয়েনায়। ওই ভিয়েনা ছিল নানাপ্রকার মুদ্রা, সীলমোহর, লিপি প্রভৃতি জন্ম দেওয়ার একটি বিশেষ সূতিকা গৃহ। সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় স্বার্থে তাঁকে আসতে হয় ভারতে।

লাহোর কলেজে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল একেবারে প্রিন্সিপ্যালের পদে। চীন দেশের একজায়গায় খনন কার্য চালিয়ে ও নানা গবেষণার ফলস্বরূপ বিখ্যাত গবেষক বলে প্রচারিত হয়েছিলেন তিনি। যেখানে যত খনন কার্য হয়েছে এবং মাটির তলা থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তা সাধারণ শিক্ষিতদের নিকট বিস্ময় বটে কিন্তু একদল বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন থেকে যায়—হাজার হাজার বছর পূর্বে বিজ্ঞানের এত উন্নতি কি হয়েছিল? পাথর খোদাই করার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাটালি এবং আজকের আধুনিক যন্ত্রপাতি কি তখনও প্রস্তুত ছিল? হিন্দু ও মুসলমান শাসনের সময়েও পুকুর দীঘি খনন, বিল্ডিং, প্রাসাদ, দুর্গ, মিনার ইত্যাদি নির্মাণে মাটি খোঁড়ার দরকার হোত। তখন মাটির তলা থেকে পাওয়া গেল না কিছুই আর বৃটিশের আমলে কি করে সম্ভব হল এই উদ্ভট সব কান্ড? তাছাড়া কোন্ যন্ত্রবলে তাঁরা জানতে পারতেন যে এখানে খুঁড়লেই পাওয়া যাবে মাটি চাপা পড়া প্রত্নতাত্ত্বিক মালমশলা? এ ধাপ্পাবাজি ধরার কাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের দেশে। আমাদের ভারতীয় দালাল সহযোগীদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হয়নি এইসব কর্মকাণ্ড। কেন প্রকাশ করেন নি ভারতীয় সহযোগীরা ওই ষড়যন্ত্রের কথা? তার সোজা উত্তর হচ্ছে তাঁদের দেওয়া হয়েছিল 'স্যার', 'রায়বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি, প্রদান করা

হয়েছিল স্বর্ণপদক, বৃদ্ধি করা হয়েছিল পদমর্যাদা, বেতন, আর দেওয়া হয়েছিল নানা সুযোগ সুবিধা। মিঃ অরেলের লেখা 'The Thousand Buddhas' এবং 'Chronicle of Kings of Kashmir' বই দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন বিশেষ বুদ্ধিজীবী। তাই ইংরেজ সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন শিক্ষা বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেলের পদ। তিনিও সরকারের তরফ থেকে পেয়েছিলেন সম্মানীয় 'স্যার' উপাধি।

সিলভাঁ লেভি [Sylvan Levy] : ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ভূমিষ্ঠ হন এবং ১৯৩৫ ছিল তাঁর মৃত্যুবর্ষ। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও ভারতীয় প্রাচ্যভাষার বড় পন্ডিত। প্রথমে ছিলেন কলেজের অধ্যাপক তার পরে হন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। তাছাড়া তিনি আমেরিকার ওরিয়েন্টাল সোসাইটিরও ছিলেন এক বিশেষ ব্যক্তি।

মনে রাখা ভাল ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী ও রাশিয়ায় একসঙ্গে কাজ চলছিল বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের। এ বিষয়ে তাঁরা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সিলভাঁ ওই সমস্ত দেশ এবং ভারত ঘুরে ঘুরে তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পরিশ্রম করেছিলেন পূর্ণোদ্যমে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পরিবর্তনের যে ধারা চলছিল তা বজায় রেখে সেটাকে মজবুত করতে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে তার সমর্থন করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালনে তাঁর শ্রম উল্লেখযোগ্য। তাই ইংরেজ সরকার ও তাদের ভারতীয় তাবেদার বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে দিয়েছিলেন D. Litt. সম্মান।

মার্গারেট নোবেল

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল [Miss Margaret Elizabeth Nobel] : ইনি ভগিনী নিবেদিতা বলে পরিচিত। ১৮৬৭ তে ভূমিষ্ঠ হয়ে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা বলেই ভারতে তাঁর পরিচয়। ১৮৯৬-এ যখন বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যান তখন তাঁর শিষ্যা হয়ে নিবেদিতা নাম নিয়েছিলেন তিনি। স্বামীজি বেশ আগে থেকেই প্রচার করেছিলেন যে ভারতে তখন নাকি কোন 'মহীয়সী মহিলা'

ছিলেন না। সুতরাং ইংলণ্ড থেকে একটি 'সিংহী' আনতে হবে তাঁকে। সেই সিংহীই হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা।

কলকাতার বোসপাড়ায় বাসা নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাসায় তখনকার ভারতীয় বিখ্যাত রাজনীতিবিদরা আসা যাওয়া করতেন এবং বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের গভীর আলোচনা চলত সেখানে। নিবেদিতা শুধু ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গেই নয় বরং বৃটিশ কর্মচারী, এমনকি ছোটলাট, বড়লাট, ভাইসরয়, লর্ড, কর্ণেল এবং ইংলণ্ডে অবস্থিত নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

বিবেকানন্দ ইংলণ্ড, আমেরিকা বা পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন অনেক মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে। যেটা তিনি পেয়েছিলেন আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে। সেই সময়ের বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনী মিঃ রকফেলার-ই দিয়েছিলেন আশাতীত মোটা অঙ্কের অর্থ। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিশন তৈরি করতে অসুবিধা হয় নি তাঁর। আশ্চর্যের কথা হল এই, বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার ও আমার মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ থাকবে না'। অর্থাৎ রাজনীতির গন্ধে জড়িত কোন শিষ্য মিশন বা স্বামীজির সঙ্গে থাকতে পারবেন না। কিন্তু স্বামীজির শিষ্যা নিবেদিতা কি করে রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্যে গভীরভাবে জড়িয়েছিলেন? অবশ্য এ নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদও হয়। কিন্তু সিংহী-নিবেদিতা পরিবর্তন করেন নি তাঁর নিজস্ব মত ও পথের। তিনি যে সব চমকপ্রদ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বই-পুস্তক লিখে গেছেন সেগুলো পড়লে এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবাসী বিবেকানন্দকে বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক নেতা করুক এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মনে করুক এক বিশ্ববিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে 'The Master as I Saw Him', 'The Cradle Tales of Hindusthan', এবং 'An Indian Study of Love and Death' উল্লেখযোগ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লর্ড লিটন [Lord Lytton]ঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগুণে গুণান্বিত মিঃ লিটন শিক্ষিত হয়ে ভারতে আসার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভারতে নেহাত একজন সাধারণ সিভিলিয়ান হয়ে এলেও ১৯২২ হতে ১৯২৭ পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গের শাসনকর্তা হয়েছিলেন তিনি। পিতৃপ্রদত্ত জ্ঞান তাঁর ছিলই। তাঁর সময়ে ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ইংরেজ বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৃটিশ শাসককে নতুন করে চিন্তা করতে হয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের দাবিয়ে এতদিন বেশ চলছিল। কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি মুসলমানের মত বিদ্বেষী হয়ে যায় আর ঐ দুই সম্প্রদায় যদি মিলেমিশে

একত্রিত হয় তা হলে ভারতে তাদের টিকে থাকা যাবে না। উপরন্তু জান মাল নিয়ে হবে টানাটানি। হোলও তাই। মুসলমান-হিন্দু হাত ধরাধরি করে মৈত্রীর বন্ধনে হতে লাগল অগ্রসর। ইংরেজ শাসনের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল যে, যত পারা যায় তাড়াতাড়ি শোষণের কাজ শেষ করে বিদায় নিতে হবে। আর এই দেশকে পরিত্যাগের আগে করে দিয়ে যেতে হবে টুকরো টুকরো। আর তা করতে বৃটিশ প্রচার চালাতে লাগলো— বন্ধুর মত হিন্দু মুসলমান জাতিকে মিলেমিশে থাকতে হবে। আর তা যদি না পার তাহলে আমরা চলে যাবার পর তোমরা লড়াই লাগলে কে থামাবে তোমাদের? কে বা কারা ন্যায় শাসন, ন্যায় বিচার ও শান্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে?

দেশভাগের বীজ আগেই বোনা হয়ে গেছে বিজ্ঞ বৃটিশের। এবার দরকার হোল হিন্দু মুসলমানে রক্তারক্তির দাঙ্গা। তাহলে শাসকদল বলতে পারবে— 'আমাদের উপস্থিতিতে যদি এত দাঙ্গা হয় তাহলে আমরা চলে যাবার পর অবস্থা হবে আরও ভয়ঙ্কর! সুতরাং দেশভাগ করে নেওয়াই ভাল।'

এই দাঙ্গা লাগানোর কাজটি পর্দার আড়াল থেকে সুনিপুণ শিল্পীর মত যিনি করেছিলেন তিনিই হচ্ছেন অন্যতম প্রশাসক মিঃ লিটন। ভারতের হৃদপিন্ড বঙ্গদেশে দাঙ্গা লেগে যায়। এই সুনিপুণ শিল্পীকেও সরকার দিয়েছিলেন 'লর্ড' উপাধি।

দীনবন্ধু [C. F. Andrews]ঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৪১-এ মৃত্যু হয় তাঁর। বাড়ী ছিল ইংলণ্ড। আসল নাম C.F.Andrews হলেও দীনবন্ধু তাঁর নকল নাম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেমব্রোক কলেজ মিশনের নেতা হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে ভারতে আনা হয় এবং দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক করে দিয়ে পরে ১৯০৮-১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর পদে রাখা হয় তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মাগান্ধীর পরমবন্ধু ছিলেন তিনি।

স্যার স্যামুয়েল রাইট হোর [Sir Samuel Right Hoare]ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩১-এ তিনি হয়েছিলেন 'ভারত সচিব'। 'পররাষ্ট্র সচিব' হয়েছিলেন ১৯৩৫-এ। 'ভারত শাসন আইন' রচনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন তিনিই। তাই তিনি দেশ ও জাতিগতপ্রাণ-চরিত্রের জন্য পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

স্যার ওয়াভেল [Sir Archibald Wavell]ঃ তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ হল যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট। ইংরেজদের বিদায়ের দিন নিকটবর্তী হচ্ছিল। ঐ সময় বিলেতী মানুষদের ভারতের বড় বড় পদে থাকা ছিল বিপজ্জনক। তখন তিনি অনেকগুলো বৈঠক করেছিলেন ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। অভিনয় এমন সুন্দর

হয়েছিল যে ভারতের ঐ মহাশত্রুকে মনে হয়েছিল কতই না ভারত হিতৈষী! এমন যোগ্য
ব্যক্তি যোগ্য 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন পাওনাদারের মতই।

টমাস এডোয়ার্ড লরেন্স [Thomas Edward Lawrence] ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে
জন্মে পরলোকগমন করেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক। তাঁর ছিল
অগাধ পান্ডিত্য ও প্রতিভা। তিনি আরবদেশে তুরস্কের প্রভাব নষ্ট করেন মহাকৌশল
ও ছলচাতুরীর সাহায্যে। এককথায় তুরস্ক ও আরবের একতার বাঁধন ছিন্ন করেন
তিনিই। আরবদের ভিতরের অনেক তথ্য, অনেক পুস্তক এবং অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়
করেন যা বিশেষ সহায়ক হয় ইংরেজদের উন্নতির পথে। তাঁকে আরবে পাঠানো হয়
১৯১৫ তে, তার পূর্বে পাঠানো হয়েছিল আরবের পাশের রাষ্ট্র সিরিয়ায়। একজন সৈন্য
বিভাগের নেতা ঐতিহাসিক ও পর্যটক সেজে নানা কৌশলে আরবে প্রবেশ করে তাদের
বড় রকম ক্ষতি করতে পেরেছিলেন বলেই খুশী হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে একটি
নতুন উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছিল সরকারী সনদ এবং
'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' উপাধি। তাঁর প্রণয়ন করা বিখ্যাত বইটির নাম ছিল'Revolt
in the Desert'। তাছাড়া তিনি ভূগোলেও ছিলেন বিশেষ বিজ্ঞ। তাই যুদ্ধ বিভাগের
এক নতুন যুগান্তর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

মীরা বেন্ [Mira Ben] ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। এই বিলেতী কুমারীর
আসল নাম ছিল মিস্ ম্যাডেলিন স্লেড। এ্যাডমিরাল এডমন্ড স্লেড ছিলেন তাঁর পিতা।
তিনি নাকি রমা রোঁলার 'মহাত্মা গান্ধী' বইটি পড়ে এতই মুগ্ধ হলেন যে একেবারে
ভারতে চলে আসেন গান্ধীজির শিষ্যা হতে। একদলের মতে এটা সরল ও স্বাভাবিক
ব্যাপার, আর অন্য একদলের মতে শিক্ষিতা রাজনীতিজ্ঞ যুবতীর স্লেড নাম পরিবর্তন
করে সারাজীবনের জন্য ভারতের প্রধান রাজনৈতিক নেতার ছায়া হয়ে থেকে যাওয়া
একটা রহস্যময় অধ্যায়। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন
বারবার। ১৯৪৬-এ একটি আশ্রম স্থাপন করেন তিনি। ১৯৪৭-এর পরেও তিনি ছিলেন
উত্তর প্রদেশের ইংরেজ সরকারের উপদেষ্টা। সুতরাং তাঁর শিষ্যা হওয়া নেহাত সাধারণ
একজন কর্মচারীর উচ্ছ্বাস প্রবণতা নয় বরং তিনি ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন
বিচক্ষণ বিলেতী বিদূষী।

স্যার উইলিয়াম স্লীমান [Sir William Sleeman] ঃ ইনি ছিলেন একজন সুদক্ষ
রাজকর্মচারী। ভারতে আসেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়ে। 'ঠগ' নামক দস্যুদলকে
শায়েস্তা করেন তিনি। ঠগীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ভুগছিলেন তখন। ফলে তাঁরা
প্রকৃতই খুশী হন ইংরেজদের প্রতি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'ঠগী দমনের' নামে

ইংরেজ বিরোধীদেরও 'ঠগীদের সঙ্গে যুক্ত' এই অজুহাতে দমন করেছিলেন নিষ্ঠুর হতে। তিনি আবার ছিলেন একজন লেখক। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই 'A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849-'50'। ১৮৪৯ হতে ১৮৫৬ পর্যন্ত তাঁকে লক্ষ্ণৌর 'বৃটিশ রেসিডেন্টে'র পদে বসিয়েছিল বৃটিশ সরকার। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়েই ছিল তাঁর কর্মকান্ড। তিনিও লাভ করেছিলেন ব্রিটিশের দেওয়া 'স্যার' উপাধি।

চেমস্ফোর্ড ভাইকাউন্ট [Chelmsford Viscount] ঃ১৯১৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের শাসনকর্তা। ভারতে আসার পূর্বেও কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলস্-এরও শাসনকর্তা ছিলেন তিনি। তাঁর শাসনকালে পাশ হয় 'রাওলাট এ্যাক্ট' নামে এক কুখ্যাত বিল। তাঁর সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে মিঃ ডায়ারের আদেশে হত্যা করা হয় অনেক বিপ্লবীদের। তাঁর আমলে 'মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফরম' নামে তৈরি হয় নতুন শাসনবিধি।

স্যার জর্জ বার্লো [Sir George Barlow] ঃ ১৮০৫ হতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট। 'হোলকারের সন্ধির' সময় তাঁর বুদ্ধিমত্তায় খুব খুশি হয় ইংরেজ সরকার। খুশি হওয়ার আর একটা বিশেষ কারণ মাদ্রাজের ভেলোরে বিপ্লবীদের প্রচন্ড নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কঠিন হাতে দমন করেছিলেন তিনি। শুধু দমনই নয় তাঁদেরকে এমন অর্থনৈতিক সংকটে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে আর যেন তাঁরা মাথা তোলার চেষ্টা করতে না পারেন। তাঁর রক্তমাখা হাতে বৃটিশ সরকার তুলে দিয়েছিল সেই বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি।

জন বেন্ট্লী [John Bently] ঃ জন বেন্টলীর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ সন্দেহজনক। তিনিও নাকি ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষাবিদ। গণিত শাস্ত্রেও ছিল তাঁর বিরাট পান্ডিত্য। সাহেব নাকি সবসময় 'হিন্দু হিন্দু' চিন্তাতেই থাকতেন অস্থির। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অনীহা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাঁর দুটি বই হিন্দুদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বইদুটি হল — 'Historical View of Hindu Astronomy' এবং 'Principal Eras and Dates of the Ancient Hindus'। এইভাবে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে সঞ্চার হয় এক উগ্রচেতনা। অবশ্য তাঁদের বেছে নেওয়া উচ্চবর্ণকেই হিন্দু বলে মনে করতেন তাঁরা।

ফার্ডিনান্ড হেনরী ব্লকম্যান [Ferdinand Henry Blockmann] ঃ ইংলণ্ডের ড্রেসডেন নগরে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন প্রেস বা ছাপাখানার মালিক। মুদ্রণ বিষয়ে তাঁর ছিল পৈতৃক পাওয়া ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য। প্রখর বুদ্ধি ও চিন্তা

শক্তিতে তিনি ছিলেন অনন্য। একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে আসেন ভারতে। বৃটিশ
সরকার তাঁর যোগ্যতার মূল্যায়ন করে তাঁকে মোটামুটি দক্ষ করে তুললেন আরবী ও
ফার্সী ভাষায়। তারপর তাঁকে বানিয়ে দিলেন কলকাতা মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক।
তাঁর নির্ধারিত মূল কাজটি ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত আরবী-ফারসী জানা মুসলিম
পন্ডিতদের সঙ্গে মেলামেশা ও গভীর আলোচনায় ভাষাতত্ত্বের নানা গবেষণা এবং নানা
দেশের সোনা, রূপো, তামা প্রভৃতি ধাতু নির্মিত মুদ্রার পাঠোদ্ধার প্রভৃতি। ঐ কর্মকান্ডটির
এইজন্য প্রয়োজন হয়েছিল যে, যাতে নানা ধাতুর চাকতি বা মুদ্রা তৈরি করে তাতে নানা
ভাষার অক্ষর, জীবজন্তু ও দেবদেবীর সম্ভাব্য ছবি দিয়ে ইতিহাসের কাঁচামাল বলে
চালাবার ব্যবস্থা করা যায়, আর ওইসব মুদ্রা নিয়েই চলবে মিথ্যা গবেষণা এবং কল্পিত
ইতিহাস সৃষ্টির চক্রান্ত। কলকাতার 'বিখ্যাত কারখানা' এশিয়াটিক সোসাইটির 'ভাষাতত্ত্ব
বিভাগ', যেটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সেই বিভাগের সেক্রেটারি বানিয়ে দেওয়া
হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল এই যে তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভা,
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ছিল না কোন স্বীকৃত ডিগ্রি। সেইজন্য তাঁকে
পাইয়ে দেওয়া হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি M.A. ডিগ্রীর সার্টিফিকেট।

এইবার কিছু উল্লেখযোগ্য 'পণ্ডিতি' বই প্রকাশ করা হল তাঁর নামে। তাদের মধ্যে
'The Prosody of the Persians' এবং অপর এক গ্রন্থ মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখা
'আইন-ই-আকবরী'র ইংরাজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য অনুবাদে ইচ্ছামত পরিবর্তন
ও পরিবর্ধন করতে ত্রুটি করেন নি তিনি।

মেগাস্থিনিস [Megasthenes] ঃ তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষের কুল কিনারা পাওয়ার
উপায় নেই মোটেই। তিনি নাকি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় প্রেরিত হয়ে এসেছিলেন
আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকসের দূত হিসাবে। তাঁর লিখিত বিবরণ সৃষ্টি করেছে
এক প্রখ্যাত ইতিহাস! বৃটিশের সৈন্য, সেনাপতি ও অফিসার, যাঁদের বেছে নিয়ে
রাতারাতি ঐতিহাসিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা নাকি অনেকে বহু তত্ত্ব ও তথ্য খুঁজে
পেয়েছিলেন তাঁর ঐ বিবরণে। আজকের আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের মতে ঐ
অনৈতিহাসিক মেগাস্থিনিসের অস্তিত্বই ছিল না পৃথিবীতে। এ সব ছিল ইংরেজদের তৈরি
কল্পিত কাহিনী বা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। আরবী, ফারসী কিছু তথ্যপূর্ণ [?] ইতিহাস,
মূল ইতিহাস বা আকর ইতিহাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানীদের
মতে ওগুলোর অনেক ইতিহাস জাল এবং ঐতিহাসিকরাও কাল্পনিক। ল্যাটিন, ব্রাহ্মী,
প্রাকৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় লিখিত পুঁথি, পান্ডুলিপি ও পুস্তক বলে যা চালানো হয়
ওগুলো উর্বর ব্রেনের বৃটিশ শিল্পীদের সৃষ্টি করা বা ছকে দেওয়া কৌশল মাত্র। অথচ সেই

সমস্ত কল্পিত পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদগুলোর দেশ-বিদেশ তথা সারা পৃথিবী জুড়ে
চলছে পঠন পাঠন ও গবেষণা। আসলে ওগুলো অনুবাদই নয়, ওগুলো হোল সৃষ্টি করা
চক্রান্ত মার্কা পুস্তক মাত্র।

হিউয়েন সাঙ [Huen Tsang] ঃ মহাপন্ডিতরা বলেন তাঁর জন্ম নাকি সাত শতকে।
তিনি ছিলেন চীনদেশীয় পরিব্রাজক বা ভ্রমণকারী। নানাদেশ ঘুরে ভারতে আসেন রাজা
হর্ষবর্ধনের সময়ে। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের
নিকট 'বৌদ্ধদর্শন' ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী
ঐতিহাসিকদের জন্য যেন ইতিহাসের অভিধান। আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের মতে
এই ব্যক্তি, তাঁর ভ্রমণকাহিনী ও তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ব্যাপার — সবই ইংরেজ
সরকারের পরিকল্পনাপ্রসূত ধাপ্পামাত্র।

চক্রান্তাগার

বৃটিশ বা ইংরেজ জাতি প্রথমে ভারতে এসেছিল ব্যবসা করতে, পরে হয়ে বসে শাসক—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যতটা সহজে এগুলো মনে করা হয় আসলে তা নয়। ভারতে আগমন, তারপর নিজেদের শাসন প্রবর্তন, কোটি কোটি টন চাল, গম, পাট, চা, কয়লা, নীল, তুলো কাঁচামাল সহ কোটি কোটি টাকার সোনারুপো, মণিমানিক্য ইংলণ্ডে প্রেরণের পিছনে ছিল তাদের বিরাট বিজ্ঞান সম্মত সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরিকল্পনা।

১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম প্রচারক টমাস স্টিফেন্স্ ভারতে আসেন সর্বপ্রথম। তারপর একে একে অনেকে আসা যাওয়া করেছেন, তাঁদেরই মাধ্যমে ইংরেজ সরকার জানতে পেরেছেন ভারতের নানা তথ্য। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের পরিচালনায় লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তজার্তিক কারখানা। যেটির নাম দেওয়া হয়েছিল রয়াল অ্যাকাডেমি [Royal Academy]। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে সেখানে একটি প্রদর্শনী হোত যেখানে চারু শিল্প, কারুশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের উৎকৃষ্ট নানা নমুনা দেখিয়ে ব্যবস্থা করা হয় মানুষের মনে পুরনো ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা সৃষ্টি করার। লণ্ডনের আর একটি বিখ্যাত কারখানা, যেটার নাম দেওয়া হয়েছিল, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি [Royal Asiatic society]। এশিয়া মহাদেশে অনেকগুলো এশিয়াটিক সোসাইটি আছে। কিন্তু সেগুলোর মূল কেন্দ্র লণ্ডন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লণ্ডনের শাখা, যা আগে বলা হয়েছে। ভারত তথা প্রাচ্য বিদ্যা, প্রাচ্য তত্ত্ব ও তথ্যের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। লণ্ডনে আরও একটি কারখানা তৈরি করা হয়েছিল যেটার নাম ছিল রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি [Royal Geographical Society]। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক মিলনের ব্যবস্থা—এই সংস্থার একটি বিশেষ অবদান। ভৌগলিক গবেষণা ও আবিষ্কার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর নানা দেশ কিভাবে ভাগাভাগি হয়েছে এবং ভাগাভাগি হবে, কোথায় তারা ঘাঁটি গাড়বে, কেমন করে পৃথিবীর মানচিত্রের সীমান্তরেখা পরিবর্তন করতে হবে, তার জন্য কী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কৌশল গৃহীত হবে, কোন্ রাষ্ট্র কার জন্য কিসের বিনিময়ে কতটুকু সহযোগিতা করবে এসব নির্ধারণ ছিল এই সংস্থার বিশেষ দায়িত্ব।

আর এক কারখানার নাম 'ইণ্ডিয়া অফিস' [India office]। ইংরেজ শাসনকালে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই অফিসের আবির্ভাব। 'ভারত সচিবের সেটা ছিল খাস দপ্তর, এখানেই আছে হাইকমিশনারের অফিস। তাছাড়া এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

গবেষণাগারও। এখানে করা হয়েছে একটি বিরাট লাইব্রেরি। ভারতের সবরকম সত্য ও কল্পিত ভাষার সাহিত্য এবং নানা প্রকার চিত্র সংরক্ষিত আছে এখানে। এর সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃত লাইব্রেরিটিও উল্লেখযোগ্য। এই সংগ্রহশালার মাধ্যমে যে কোন পরিদর্শক এলেই তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারা যাবে যে, ভারতে বহুভাষা ছিল, ছিল প্রাচীন উন্নত সভ্যতা, ছিল নানা প্রকার সাহিত্যসম্ভার! সেই সঙ্গে প্রাচীনকাল হতে হাতে আঁকা নানা চিত্র যা থেকে ভারতের মানুষের পোষাকপরিচ্ছদ, পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপ কী ছিল পাওয়া যাবে তার প্রমাণিক দৃষ্টান্ত। অথচ এই পরিকল্পিত প্রাচীনকালের ছবিগুলো আঁকানো হয়েছে আধুনিক কালেই এবং ছবিগুলোর বেশির ভাগ শিল্পী ভারতেরই। 'এই আফিসের বাড়ীটি ১৯৩০-এ নতুন করিয়া নির্মিত করিতে ৩২৪০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। প্রাচীন চিত্রগুলি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত।'

পূর্বে উল্লিখিত লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির শাখা কলকাতার ১নং পার্কস্ট্রীটে খোলা হয়েছিল ১৭৮৪ তে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। ঐ স্যার ছিলেন তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মারাত্মক পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয় এই সংগ্রহশালাটি। কিন্তু সাধারণভাবে প্রচার করা হয় 'এখানে অসংখ্য মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আছে। এশিয়ার ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্বের নিদর্শন সংগ্রহ ও আলোচনার উদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হয়।'

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল রেডক্রশ সোসাইটি [Red Cross Society] জেনেভায়। এই সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেকে ধারণ করে 'ক্রশ' চিহ্ন। এটাও একটা বিলেতী সংস্থা। হাসপাতাল, অ্যামবুলেন্স প্রভৃতি নিয়ে এঁদের কাজকর্ম দেখে বোঝা যায় এঁরা সমাজসেবী। কিন্তু এঁদের অনেকের দ্বারা পালন করানো হয় আরও অনেক 'গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব'।

আর একটি সংস্থা ১৮৭৮-তে সৃষ্টি হয়েছিল যেটার নাম হিবার্ট লেকচার্স [Hibart Lectures]। মিঃ জন হিবার্টের মৃত্যুর সময় তাঁর উইল করা সম্পত্তির আয় হতে প্রত্যেক বছর বিশ্বের বিশেষ বিশেষ লোকদের দিয়ে ধর্ম-সম্মেলন করানোর সংস্থা এটি। আমন্ত্রিত বক্তাদের আসা যাওয়ার খরচা দেবারও ব্যবস্থা ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককে আনিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের অনেককে দিয়ে কিছু বলিয়ে নিয়ে পুরস্কার ও উপাধি ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে তাঁদের দেশের বিন্দু থেকে সিন্ধু বানিয়ে দেওয়া হত প্রচারের প্রাবল্যে। সেই দেশের সেই নেতার মুখ দিয়ে বা হাত দিয়ে বলিয়ে অথবা লিখিয়ে নেওয়া হোত বিদেশিদের জয়গাথা। আমদের কবি রবীন্দ্রনাথকে এই সংস্থা নিয়ে গিয়েছিল। কবিকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল 'মানবধর্ম' বিষয়ে। তাঁর কবি প্রতিভা অবশ্যই এক জন্মগত সম্পদ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ [Fort William College] ঃ ইংলণ্ড থেকে যেসব আমলা অথবা কর্মচারি ভারতে আসতেন তাঁদের এদেশে কাজ চালাবার মত প্রয়োজনীয় ভাষা যেমন, পার্সী, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি শেখাবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে কলকাতায় স্থাপিত হয় এই কলেজ। এখানে আরও যেসব গোপন কাণ্ডগুলো হোত তা হচ্ছে এই — রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভারতীয় সহযোগী সংগ্রহ করে ওখানে তৈরি হোত নানা অনুবাদ, অনুবাদের অনুবাদ এবং তাঁদের পরিকল্পনা মাফিক অনেক কিছু। বৃটিশের ভারতীয় সহযোগীরাও আর্থিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হতেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ [Archaeology Department] ঃ মিঃ ফ্লিনডার্স্ প্রেটির মতে মানবের ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তই প্রত্নতত্ত্ব। তখনকার ভারত সরকারের ওই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ ক্যানিংহাম। পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন স্যার জন মার্শাল। তিনি 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। কারণ অস্বাভাবিক অভিনব আবিষ্কারের কৌশল ও সৃষ্টিনিপুণতা তাঁর ছিল। তক্ষশীলা, পাটলিপুত্র ও সারনাথের খননকার্য তাঁরই অবদান। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালনায় নালন্দার খননকার্যও তাঁর অবদান। মধ্য এশিয়া হতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন মিঃ অরেল স্টেইন। অনেক গবেষকের মতে সংগৃহীত বস্তুগুলোর বেশিরভাগই ছিল তাঁর প্রযোজিত সৃষ্টি-কৌশল মাত্র। পূর্বোল্লিখিত অরেল স্টেইনও পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। 'স্যার' উপাধি এইজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর সংগ্রহ করা বস্তুতে লুকিয়ে ছিল নাকি লুকিয়ে থাকা ভারতের ইতিহাস লেখার অবদান। সাহেবদের ঐসব চাতুর্যপূর্ণ কাজে ভারতীয় সহযোগীদের উল্লেখযোগ্য নাম হোল—স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, হীরাপ্রসাদ শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ। এঁদের সকলের প্রধান পরিচালক ছিলেন ফরাসী সাহেব মিঃ সিলভাঁ লেভী। উল্লিখিত এইসব সহযোগীরা বেশিরভাগই ছিলেন ইংরেজের দেওয়া উপাধি ও সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম [British Museum] ঃ এটি লণ্ডনের বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও যাদুঘর। সেইজন্য 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'ও 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম'ও বলা হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই যাদুঘরটি। বিল্ডিংটি ছিল 'মন্টেগু হাউস'। কিন্তু পরে সেটিকে সরিয়ে আনা হয়েছে গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে। এই লাইব্রেরিটিএখন পৃথিবীর প্রথম সারির লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হবার শুরু থেকেই দর্শকদের মগজ গড়ার কাজ সুনিপুণভাবে চালাতে কেরাণী ও হেল্পারের নামে পণ্ডিত শিল্পী ও কর্মীরা এখানে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটি মিঃ হ্যান্স্ সোলেনের সংগৃহীত প্রাচীন বস্তুগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল প্রথমে। গভীর গবেষণায় ধরা পড়ে সংগৃহীত

ঐ 'প্রাচীন' বস্তুগুলোর মধ্যে অনেক কিছুই নতুন যুগের সৃষ্টি করা বা তৈরি করে নেওয়া। মিঃ হ্যান্স সোলেনও 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই।

প্রত্নতত্ত্বের কথা ঃ মাটির তলা হতে আবিষ্কৃত নানা ব্যবহৃত বস্তু, অস্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, শিলালিপি অনেক কিছুর ইতিহাস বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেশজুড়ে পড়ানো হচ্ছে। এইসব নিয়ে যদি গভীরভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণা করা যায় তাহলে বুঝতে পারা যাবে এগুলো সব আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মাত্র। কারণ হিসাবে এর গবেষকেরা বলছেন, বৃটিশ ভারতে আসার পূর্বে ভারতীয় রাজা সম্রাটদের সময় আবিষ্কৃত হোল না এসব কিছুই, আর বৃটিশ রাজত্ব যেমনই এল তেমনি মাটি ফুঁড়ে বের হতে লাগল যত প্রত্নতত্ত্বের ম্যাজিক?

মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, ইলোরা, অজন্তা ইত্যাদি নিয়ে নিরপেক্ষ গবেষণা চালালে ফাঁস হয়ে যাবে চক্রান্তের সব কিছু। ধরা যাক অজন্তা গুহার কথাই।

ঔরঙ্গাবাদ জেলার ক্ষুদ্র একটি গ্রামের নাম অজন্তা। গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে পাথরের প্রাচীরের মত। ঐ অখ্যাত গ্রামে কেন করা হোল খননকার্য? এত বড় রাজ্যে কত ভাল ভাল জায়গা থাকতে কেন বেছে নেওয়া হোল এই স্থানটুকু। প্রথমে বিলেতের মিঃ ফারগুসন প্রবন্ধ লিখে প্রচার করেন 'অজন্তার' অজানা কাহিনী। সেটা ছিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। আর 'অজন্তা' গুহাটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮১৭-তে। সাহেব জাতি এই রকম একটি গুহা 'আবিষ্কারের' পর ২৬ বছর চুপ করে বসে থাকবে তা তো অবিশ্বাস্য! প্রথমে গুহার চিত্রগুলোর ছবির ছবি প্রকাশিত হয় লণ্ডনে। সেগুলো ছিল কেনসিংটন প্রাসাদে। ঐ প্রাসাদে আগুন লেগেছিল একবার। তার কিছুদিন পর পুনরায় প্রাসাদটিতে আবার লেগে যায় আগুন। তবুও প্রচার করা হোল 'অজন্তা'র ছবিগুলোর প্রতিলিপি নষ্ট হয় নি। সব নষ্ট হয়ে গেল, শুধু থেকে গেল ছবির প্রতিলিপিগুলো। মিঃ গ্রিফিথ সাহেব তাঁর সম্পাদনায় [?] পুনরায় প্রকাশ করলেন সেগুলো। তারপর লেডি হেভিংহাস্ ঐ ছবিগুলোর অনুলিপি প্রকাশ করলেন পুনরায়।

গুহার সংখ্যা ৩৯। অজন্তা—জলগাঁও স্টেশন থেকে ৩৮ মাইল দূরে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ছোট্ট 'অজন্তা' স্থানটুকু ভাবিয়ে তোলে ভাবুকদের। আসল সত্য এটাই, এই গুহাগুলোতে কাজ আরম্ভের পূর্বেই তৈরি হয়েছিল ছবিগুলো। আর ঐ ছবির মডেলগুলো শিল্পীদের দিয়ে খোদিত হয় পর্বতগুহায়। ইংরেজের তাতে বড় স্বার্থ সাধিত হয় দুদিক দিয়ে। প্রথমতঃ, হিন্দুরা জেনে গেলেন ঐ গুহামন্দিরে উন্নত সভ্যতা ও শিল্প তাঁদেরই পূর্ব গৌরব—সেইজন্য ইংরেজ সরকার ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ খোদিত মূর্তিগুলোকে এমন উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ এবং যৌনমূলক করা হয়েছে যা সন্ধান দেয় ভারতীয়দের নগ্ন চরিত্রের। সুতরাং ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব হিন্দুদের ধাপে ধাপে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অভিজ্ঞ দর্শক লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে

ঐ শিল্পকর্মগুলো মোটেই আদিমযুগের নয়, বরং তা আধুনিক যুগের খ্যাতনামা শিল্পীদেরই তৈরি।

'অজন্তা'র কীর্তিকাহিনী প্রকাশের আগে এর চারিদিক কেন ঘিরে ফেলা হয়েছিল মিলিটারী দিয়ে? তাও সংখ্যা দু-চারজন নয়, বরং সৈন্য ছিল পুরো এক রেজিমেন্ট। যাতে কেউ টের না পায় যে কী হচ্ছে মিলিটারী ব্যারিকেডের মাঝে। একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি— "১৮১৭ সাল। ভারত তখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন। মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার নিচে ব্রিটিশ সৈন্যের একটি রেজিমেন্ট তাঁবু ফেলেছে উল্টোদিকের অজন্তা পাহাড়ের গায়ে। সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ। একদিন তাঁদের কয়েকজন অফিসারের নজরে এল। কৌতুহলী হয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পেলেন পাহাড় কেটে অসংখ্য গুহা তৈরি হয়েছে আর সেসব গুহার দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে দক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা বহু রঙ্গীন ফ্রেস্‌কো বা দেওয়াল চিত্র। তাঁদের পাঠানো বিবরণ পড়ে তৎকালীন 'এশিয়াটিক সোসাইটির' সদস্যরা আগ্রহী হন এবং তাঁরা দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে ঐসব দেওয়ালচিত্রের অনুরূপ চিত্র আঁকানোর উদ্যোগ নেন। এইভাবে অজন্তার লুপ্তপ্রায় অমূল্য সৃষ্টির শিল্পের কথা সভ্য মানুষের কানে এল।" [দ্রষ্টব্য ১৯৯৪-এর ডিসেম্বরের 'ভ্রমণসাথী' পত্রিকা]

আধুনিক গবেষকদের মতে ঐ ধরণের দক্ষ শিল্পী হাজার হাজার বছর আগে ছিল না, ছিল না ঐ তুলি আর ঐ উন্নত মানের রংও। চিত্রকর যখন সূক্ষ্মভাবে তুলির টান শুরু করেন তখন সাধারণ দর্শক অনুমান করতে পারেন না তার পুর্ণাঙ্গ সমাপ্তি কেমন হবে। ঠিক তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মিশনারীর ভারতে আগমন কেমনভাবে একটু একটু করে ১৯৪৭ এর ১৫ই অগষ্ট পর্যন্ত ভারতকে গ্রাস করেছে তা ঐ তুলির টানের মতই সমাপ্তিতে ধরা পড়েছে। বিগত দিনের সেই চিত্তাকর্ষক রহস্যময় ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে জানতে হবে আমাদের— যা ভবিষ্যতে বাঁচার রসদ জোগাবে এবং আমাদেরকে করবে আরও সুসংহত ও সুদৃঢ়।

কাল্পনিক ভাষাসৃষ্টি ও তখনকার প্রচলিত ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নানা কারসাজি করার জন্য প্রথম অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছিল ওই শ্বেতাঙ্গদের দেশেই। তার নাম ছিল 'Accademia Della Crusca'। তৈরি হয়েছিল ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল জার্মান ভাষা অ্যাকাডেমি। ফ্রান্সে অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছিল ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে। স্পেনে হয়েছিল ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। রাশিয়ায় ১৭৮৩ তে, সুইডেনে ১৭৮৬-তে। আমেরিকার কলম্বিয়ায় হয়েছিল ১৮৭১ তে, 'অ্যাকাডেমি ভেনেজুলা ডেলা লিঙ্গুয়া' হয়েছিল ১৮৮২-তে। ১৮৮৫-তে হয়েছিল 'অ্যাকাডেমিয়া চিলিনা ডেলা লিঙ্গুয়া' [সান ডিয়েগোতে] এবং১৮৯৩ এ তৈরি হয়েছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। নাম দেওয়া হয়েছিল 'The Bengal Academy of Literature'। এরই নাম পাল্টে পরে করা হয়েছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। এর পেছনে ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ সিভিলিয়ান মিঃ জন বীম্‌স্।

বৃটিশ ব্রেনের এমনই প্রভাব যে সারা বিশ্ব তাদের অনুসরণ করবে। পরিকাঠামো বা পরিবেশ তৈরিতে তারা দৃষ্টান্তবিহীন সম্প্রদায়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল সিরিয়ার অ্যাকাডেমি। ১৯২২-এ তৈরি হয়েছিল মিশরের অ্যাকাডেমি। ১৯৩৭-এ তৈরি হয়েছিল কাবুলের অ্যাকাডেমি। ১৯৪৮-এ ইরাকের এবং ১৯৫৭ তে সৃষ্টি হয়েছিল ঢাকার 'বাংলা অ্যাকাডেমি'।

চক্রান্তবাজদের চক্রান্তের ঘাঁটিগুলো নানা নামে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হোত। ১৭১৭ তে প্রথম ফ্রী-ম্যাসন লজ স্থাপিত হয় লণ্ডনে। সাধারণতঃ লজ [Lodge] বলতে টুরিস্টদের থাকার জায়গা বোঝালেও এই লজ কিন্তু সেই অর্থে ব্যবহৃত নয় মোটেই। লণ্ডনে ঐ ১৭১৭-তেই মোট চারটি লজ নিয়ে তৈরি হয় 'ইউনাইটেড গ্রাণ্ড লজ'। ইংলণ্ডের এই ঘাঁটিটিকে কেন্দ্র করে নানা দেশে একটির পর একটি লজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ফ্রান্সে লজ তৈরি হোল ১৭২৫-এ। ১৭২৬-এ লজ তৈরি হোল আয়ারল্যাণ্ডে। ১৭২৭-এ হোল ইটিণ্ডয়ায়। ১৭২৯-এ শাখা খোলা হোল জিব্রালটারে। ১৭২৯-এ হয় জার্মানীতেও। আর ১৭৩৫-এ পর্তুগাল ও হল্যাণ্ডে। ১৭৩৬-এ স্কটল্যাণ্ডে এবং ১৭৩৮-এ শাখা খোলা হয় মাদ্রিদে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড এবং ১৭৪২-এ খোলা হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে। ডেনমার্কে শাখা খোলা হয় ১৭৪৫ এ। ১৭৬০-এ হয় ইতালীতে। বেলজিয়ামে হয় ১৭৬৫-তে। ১৭৭১ তে রাশিয়ায় এবং ১৭৭৩-তে সুইডেনে শাখা খোলা হয় ঐ 'লজ' নামের চক্রান্তাগারের।

এইভাবে সারা পৃথিবীকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে নিতে লজ বা ঐ ধরণের নানা নামের চক্রান্তকারী সংস্থার সৃষ্টি। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে ভারতের মানুষ কেউই জানতোনা যে দেশটাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হবে। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ভারতবর্ষ খণ্ডিত করার ২১৮ বছর পূর্বে কলকাতায় ঐ লজ-এর সদস্যেরা কাজ শুরু করে। তারপরে ১৭৩৫-এ তৈরি হয় মাদ্রাজে এবং বোম্বাই-এ হয় ১৭৫৮ তে। ১৭৬৯ তে ঘাঁটি তৈরি হয় লাহোরে। ১৯০৪-এ সেটা ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৬ তে পুনরায় তা মজবুত করে তৈরি করা হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লজ তৈরি হয় ঢাকায়—তখনও দেশের মানুষ জানতে পারেনি যে আর কয়েক বছর পরেই ভারতবর্ষ তিনটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তখন এই দেশের তথাকথিত জাতীয় নেতারা অধিকাংশই তাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে ঐ বিদেশীদেরকে শত্রু মনে না করে বরং মিত্র ভেবেই আত্মসমর্পণ করেন এবং দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে নেতা হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ চক্রান্তকারী নেতাদের পরিকল্পনায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত

হোত। সংস্কৃত বা নব উদ্ভূত সংস্কৃতির নামে যে বিরাট চক্রান্ত চলছিল সেটাকে পরিপূর্ণ করতেও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ তৈরি করেছিল ঐ সব সংস্থা। Indological Research Centre বলে যে সমস্ত সংস্থা ভারতে গড়া হয়েছিল সেগুলো হচ্ছেঃ গৌহাটির কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, পাটনার বিহার রিসার্চ সোসাইটি ও কে. পি. জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদে অবস্থিত গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বেনারসের সংস্কৃত ইউনিভারসিটির সরস্বতী ভবন, বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট—হোশিয়ারপুর, আহমেদাবাদের গুজরাত বিদ্যাসভা এবং বি. জে. রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বোম্বেতে অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন, পুনাতে অবস্থিত ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল এবং ভারত ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল, দিল্লীতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব ইণ্ডিয়ান কালচার, ভুবনেশ্বরের ওড়িশা হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি, মাদ্রাজের অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসার্ট ইনস্টিটিউট, বাঙ্গালোরের মিথীক্ সোসাইটি, তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরী, ত্রিচুরের রামবর্মা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জয়পুরের রাজস্থান পুরাতত্ত্ব মন্দির, বারোদার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, উজ্জয়িনীর সিন্ধিয়া ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ধারওয়ার-এর কন্নড় রিসার্চ ইনস্টিউট, মহিশূরের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, দারভাঙ্গার মিথিলা ইনস্টিটিউট ফর সংস্কৃত, নালন্দায় অবস্থিত নালন্দা ইনস্টিটিউট ফর পালি, মুজফফরপুরে অবস্থিত বৈশালী ইনস্টিটিউট ফর প্রাকৃত প্রভৃতি।

অনুমান করা কঠিন নয় যে, নানা নামের এই সমস্ত সংস্থার কর্মকাণ্ড চালাতে প্রয়োজন হোত কি বিপুল অর্থের। পূর্বের আলোচনায় বোঝা গেছে বৃটিশ সরকার কোথাও সরাসরি আবার কোথাও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে যোগান দিত এই বিশাল অর্থ। শিবনাথ শাস্ত্রীও এ কথার সমর্থনে লিখেছেন, প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন করতে গিয়ে শুধু টোলের পণ্ডিতদের পেছনেই বছরে সে বাজারের একলাখ টাকা খরচ করার ব্যবস্থা করে ঐ বৃটিশ সরকার। [তথ্য রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০]

কিন্তু প্রশ্ন হোল কেন? যারা এদেশকে করতে এল শোষণ, তারাই দিল রাশি রাশি টাকা— এটা কি কম বিস্ময়ের? আসলে এ ছিল এক বিরাট চক্রান্ত। ভারতবাসী সেই চক্রান্তের শিকার হয়ে করছে দাঙ্গা, ভুল বুঝছে একে অপরকে। যার বিস্তারিত আলোচনাই আমরা করছি এই পুস্তকে। উদ্দেশ্য হোল, মিলিয়ে যাক এই ভেদাভেদ, রক্তপাত বন্ধ হোক, অবসান হোক ভুল বোঝাবুঝির।

অমুসলিম বুদ্ধিজীবী

ইংরেজ প্রতিনিধি বা তাঁদের সহযোগী যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু বুদ্ধিজীবীর নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কেমন করে তাঁদের স্যার, লর্ড ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হয়েছিল তুলে ধরা হয়েছে তার ইতিহাস।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে ভারতের বিশাল জনসাধারণের একটি অংশ নিয়ে তৈরি করা হয় 'বাবু সমাজ' নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠী। বাকি বিশাল অংশের মানুষ উপেক্ষিত হয়েছিলেন 'ছোটলোক' বলে। এই 'বাবু সমাজে'র নেতাদেরও দেওয়া হয়েছিল বহু প্রকার উপাধি। উপাধি দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল অদ্ভুত, উদ্ভট ও মারাত্মক।

ইংরেজসৃষ্ট সংস্কৃত কলেজে টাইটেল বা উপাধির একটা চার্ট তৈরি করা ছিল, কাজের উপযুক্ত হলেই বা পাশ করলেই সেই পাশ করা পণ্ডিতকে বেছে নিতে দেওয়া হোত তাঁর পছন্দমত একটি উপাধি। এ তথ্য বড়ই বিস্ময়কর। যে যে উপাধি দেওয়া হোত তার তালিকাটি হচ্ছে এই—বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি, কবিরত্ন প্রভৃতি উপাধিগুলো দেওয়া হোত সাহিত্যের উপরে।

হিন্দু দর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়া হোত ন্যায়রত্ন, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ন, তর্কভূষণ, তর্কালঙ্কার, তর্কচূড়ামণি, তর্কবাচস্পতি, তর্কশিরোমণি, তর্কপঞ্চানন, ন্যায়পঞ্চানন, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেওয়া হোত স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিচূড়ামণি, স্মৃতিশিরোমণি, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ প্রভৃতি। বেদশাস্ত্রে দেওয়া হোত বেদরত্ন, বেদকণ্ঠ, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

"কৃতী ছাত্রগণ ইচ্ছামত উপাধি বাছিয়া লইতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত কলেজে উক্ত উপাধি অর্পণের রীতি প্রবর্তিত হয়।" লেখক শ্রী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় এই তথ্যটুকু দিয়েছেন শ্রী গোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' [দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা] হতে। পরেপরেই তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি তাঁর স্বনির্বাচিত।" [দৈনিক গণশক্তি, ২৮.৭.৯১]

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজ বা বৃটিশ চক্রান্তকারীরা ভারতে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করার পূর্বেই প্রথমে ইংরাজিতে বহু গ্রন্থ বা পুস্তক প্রস্তুত করে নিয়েছিল এবং পরিকল্পিত কিছু উদ্ভট নামের লেখকও ঠিক করে নিয়েছিল। সেইসঙ্গে প্রচার করেছিল ওগুলো নাকি সংস্কৃত, ব্রাহ্মী, পালী ইত্যাদি ভাষার ইংরাজী অনুবাদ! তারপর

তৈরি হয়েছে ঐসব কল্পিত ভাষা, ঐ সব ভাষা প্রচারের উপযুক্ত ব্যাকরণ ইত্যাদি। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বৃটিশ কর্মচারিদের কেমনভাবে বিলেতে শিক্ষা দিয়ে পাঠান হোত ভারতে, তাঁদের কিভাবে ভূষিত করা হোত নানা উপাধিতে। এবার দেখানো হচ্ছে ভারতে এসে তারা অর্থাৎ ইংরেজরা কিভাবে তৈরি করে নিয়েছিল একটি সহযোগী দল, সেই সহযোগীদের ইংরেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কি কি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ধনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং তাদেরকে আরো কি কি উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেমনভাবে।

পাণিনি : তিনি এমন এক মহাপণ্ডিত ছিলেন যাঁর পাণ্ডিত্যে ভারতের পুরাতন সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতায় যেন হিমালয়ের মত দণ্ডায়মান! আশুতোষ দেবের অভিধান থেকে তুলে দিচ্ছি কিছু তথ্য। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে। ''বিখ্যাত বৈয়াকরণ ... হিমালয় প্রদেশে মহাদেবের নিকট গমন করেন এবং মহাদেবের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাহার পর তিনি একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সেই ব্যাকরণই 'পাণিনি ব্যাকরণ' নামে পরিচিত। 'ধাতুপাঠ', 'গণপাঠ শিক্ষা' ইত্যাদিও তাঁহারই প্রণীত।''

আধুনিকবাদীদের মতে পাণিনির জন্মই হয়নি পৃথিবীতে। মহাদেব হিমালয়ে বসে তাঁকে ব্যাকরণ শেখালেন এসব কথাও হাস্যকর।

পতঞ্জলি : এও এক ভুতুড়ে নাম। তিনিও নাকি জন্মেছিলেন যীশুখৃষ্ট জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্বে! 'পতঞ্জলি দর্শন' নামক যোগশাস্ত্রের রচয়িতা তিনি।

কালিদাস : এঁকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'প্রাচীন যুগের শেক্সপীয়র'। তিনিও নাকি জন্মগ্রহণ করেছিলেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। 'তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং পরে সরস্বতীর বরে বিদ্বান হন'। ''ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। তাঁহার রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক বিশ্ববিখ্যাত। 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত।''

হলায়ুধ : এই উদ্ভট নামের মহাপণ্ডিতের জন্ম-মৃত্যুর কোন তারিখ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এঁর রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের নাম 'কবিরহস্যম্'।

ভারবী : তিনি নাকি লিখেছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্'। তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'কবিগুণাকর'।

মহর্ষি বেদব্যাস : সঠিকভাবে বলাই যায় না বেদব্যাস কে ছিলেন, আদৌ তিনি পৃথিবীতে জন্মেছিলেন কি না। কেননা তাঁর জন্মকাহিনী বা জীবনী বড় রহস্যময় ও

অশ্লীল। এইসব নামগুলো ভারতীয় হিন্দু নামের সঙ্গে মেলে না মোটেই। হয় এই নামগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা অথবা অ-ভারতীয়দের সৃষ্টি বলেই এই বিকৃত অবস্থা।

আরও কিছু বিদ্বান ও বিদুষীদের ইতিহাসে আনা হয়েছে যাঁদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখের পাত্তা নেই। **যেমন লীলাবতী**—তিনি নাকি বীজগণিতের জন্মদাত্রী। এমনি আর একজন অজ্ঞাত লেখক **হেমচন্দ্র সুরী**। তিনি নাকি 'প্রাকৃত ব্যাকরণ', 'সিদ্ধশব্দানুশাসন', 'অভিধান-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

ক্ষেমীশ্বর : 'চণ্ডকৌশিক' গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁরও জন্ম-মৃত্যুর সঠিক সন্ধান অনুল্লিখিত।

ক্ষেমরাজ : তিনিও নাকি সাতখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরও জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ অজ্ঞাত।

কৃষ্ণমিশ্র : তিনি নাকি বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক তাঁরই রচনা। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সময় ও জন্মস্থান অজ্ঞাত।

জগদীশ তর্কালঙ্কার : তিনি ছিলেন নবদ্বীপের বাসিন্দা। জানা যায় না তাঁরও জন্ম-মৃত্যুর সময়। ১৮ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্য! 'দীধিতি' টীকা রচনা তাঁর বিশেষ অবদান। ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপাধি পেয়েছিলেন 'তর্কালঙ্কার'। তাঁর পিতাও ছিলেন 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ : বাড়ি ছিল আসামের কামরূপ। 'প্রয়োগ রত্নমালা' নাকি তাঁরই রচনা। সঠিক জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস অজ্ঞাত।

এবার আলোচনা করা হচ্ছে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে সেই সমস্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—যাঁরা অধিকাংশই বৃটিশের সহযোগী হয়ে তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আর তার পরিবর্তে পেয়েছিলেন জমিদারী, চাকরি পদোন্নতি এবং রংবাহারী আকর্ষণীয় উপাধি।

দুর্গাদাস : তিনি 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ ও 'কবি কল্পদ্রুম্' এর টীকা প্রণেতা। 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি পেয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা বাসুদেব 'সার্বভৌম্' উপাধিপ্রাপ্ত। পুস্তকগুলোর লেখক একজন, নাকি কোন সংস্থার শিল্পীবৃন্দ তা ভাববার বিষয়।

জগন্নাথ পণ্ডিত : ১৬২০-তে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে। তিনি লিখে গেছেন 'ভামিনীবিনাশ' ও 'রসগঙ্গাধর'। সে দুটি অলঙ্কার শাস্ত্রের বই। তিনি ছিলেন জন্ম হতেই অন্ধ। তখন অন্ধদের লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। তবু লিখেছেন কিভাবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঃ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৮০৬-এ। ওই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি ছিল ত্রিবেণী। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিচালনায় ও ইঙ্গিতে তিনি স্থাপন করেন গবেষণাগার বা টোল। জমিদার রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সংযুক্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ' ও 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব'—এই দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ তৈরি করে বা সংকলন করে ইংরেজ সরকারের নিকট হতে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণাগারে প্রস্তুত হয়েছিল আরও অনেককিছু। সরকার তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'তর্কপঞ্চানন'।

নন্দকুমার ঃ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৭৭০ তে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। বীরভূমের ভদ্রপুরের বাসিন্দা। নবাব আলিবর্দী ও পরে সিরাজউদ্দৌলার কর্মচারি ছিলেন তিনি। বৃটিশ সরকারের বিশেষ সহযোগী ছিলেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'মহারাজ' উপাধি। আর একটি উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা হল 'ব্ল্যাক কর্ণেল'। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে বিবাদের কারণে তাঁকে জালিয়াতি মামলায় জড়িয়ে ফাঁসির ব্যবস্থা করেছিল বৃটিশ।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় ঃ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৭৮০-তে। ভারতবর্ষ বৃটিশের হাতে তুলে দেওয়ার অন্যতম নায়ক তিনি। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'মহারাজ' উপাধি। 'তিনি ক্লাইভের পক্ষে সিরাজউদ্দৌল্লার বিপক্ষতা করেন।'

রামপ্রসাদ সেন ঃ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৭৭৫-তে। প্রথমে ৩০ টাকা বেতনে কলকাতার এক ধনীর গৃহভৃত্য ছিলেন তিনি। মুসলিম যুগে গান, স্বর ও সুরে মুসলিম 'খান গোষ্ঠী'রই ছিল একচেটিয়া খ্যাতি। পূর্বে উল্লিখিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কিছু নতুন সুর ও গানের স্রষ্টা হয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্ত্তন' নামে গ্রন্থ দুটির সংকলন তাঁর বিশেষ কীর্তি। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'কবিরঞ্জন' উপাধি।

নবকৃষ্ণ দেব ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৩২-এ এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'রাজা' ও 'বাহাদুর'। তাঁর পুরো নাম হয়েছিল রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

রাজা, বাদশা, সম্রাট, রাষ্ট্রনায়ক না হয়েও বৃটিশের দেওয়া 'রাজা' 'মহারাজা, 'প্রিন্স' প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্তি এক বিস্ময়কর তামাশা। কলকাতার শোভাবাজার জমিদার বংশের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন বিশেষভাবে। তাই লর্ড ক্লাইভই ব্যবস্থা করেছিলেন উপাধি দেওয়ার এবং দিয়েছিলেন তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য রাখার অধিকার। লর্ড ক্লাইভকে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সাহায্যের বিনিময়ে তিনি লাভ করেছিলেন সুতানুটির জমিদারী। তাঁর

অধীনে বৃটিশের তত্ত্বাবধানে একটি চক্রান্তাগার তৈরি হয়েছিল। যেখানে অর্থের বিনিময়ে দিবারাত্র কাজ করে যেতেন পণ্ডিত জগন্নাথ ও পণ্ডিত বাণেশ্বর। জগন্নাথকে দেওয়া হয়েছিল 'তর্কপঞ্চানন' ও বাণেশ্বরকে দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি। তাঁরাই নাকি প্রদর্শন করেছিলেন অনেক সংস্কৃত ও ফারসী পুঁথি।

রামকান্ত মুন্সী ঃ ১৭৪১-এ জন্ম এবং ১৮০১-এ হয় তাঁর মৃত্যু। হেস্টিংসের অনুগ্রহে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের মুন্সীর পদে অধিষ্ঠিত হন। স্যার জন শোরের শাসনকাল পর্যন্ত বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন এই মুন্সী। তিনি টাকীর রায়চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণের পূর্বপুরুষ।

জয়নারায়ণ ঘোষাল ঃ ১৭৫১ তে জন্মে ১৮৩৫-এ পরলোকযাত্রা করেন। প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাবের সামান্য বেতনের কর্মচারি ছিলেন তিনি। তারপরে হন বৃটিশের সহযোগী। মিলে যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি। পড়ে যান হেস্টিংসের সুনজরে। অর্থের পাহাড় এসে যায় হাতে। বৃটিশ তাঁকে দেয় 'মহারাজ' ও 'বাহাদুর' উপাধি।

রামমোহন রায়

রামরাম বসু ঃ ১৭৫৭ তে জন্মে মারা যান ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল হুগলী জেলার চুঁচুড়া। বৃটিশের সহযোগী হিসাবে জন টমাসের মুন্সী হয়েছিলেন তিনি। ১৭৯১-এ নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলে শিক্ষা শেষ করিয়ে মিঃ কেরীর মুন্সী করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। মিঃ কেরী তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'। তাঁকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক।

রামমোহন রায় ঃ ১৭৭৪ তে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রামমোহন মারা যান ১৮৩৩-এ। প্রথমে তাঁর পদবি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও ইংরেজি শিখেছিলেন বিশেষভাবেই। প্রথমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন বিধর্মী ও নাস্তিক হিসাবে। পরে নতুন ধর্ম অর্থাৎ 'ব্রাহ্মধর্ম' সৃষ্টি করে ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে পরিচিত হন তিনি। তিনিও ছিলেন বৃটিশের প্রকৃত সহযোগী এবং ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। যখন দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, তখন

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'রাজা' উপাধি। কিন্তু মুসলিম সম্রাটের কোন কল্যাণ হয়নি তাঁর দ্বারা। বেশ সময় ধরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অতিবাহিত করে বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় করেছিলেন তিনি। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে ডেভিড হেয়ারের কুমারী কন্যার কোলে মাথা রেখে মারা যান তিনি। জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁদের দুজনের জীবনী পর্যালোচনা করা হবে পৃথক প্রসঙ্গে।

জয়গোপাল ঃ ১৭৭৫-তে জন্ম এবং ১৮৪৪-এ হয় পরলোকগমন। কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দিয়ে তাঁকে করে দেওয়া হয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। মিঃ কেরী, মিঃ মার্শম্যান ও সহযোগী সাহেবরা তাঁরই বিশেষ সাহায্যে প্রকাশ করেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের বাংলা অনুবাদ। অনেক সংস্কৃত কবিতারও নাকি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তিনি। ফারসী অভিধান সংকলনও তাঁর বিশেষ অবদান। তাঁর পিতা কেবলরামও 'তর্কপঞ্চানন' উপাধিপ্রাপ্ত। পুত্র জয়গোপালও পেয়েছিলেন 'তর্কালঙ্কার' উপাধি।

রামকমল সেন ঃ ১৭৮৩-তে জন্মে ১৮৪৪-এ মারা যান। বৃটিশের সহযোগী ঐ পণ্ডিতকে করে দেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন তাঁর বিশেষ অবদান।

মতিলাল শীল ঃ জন্ম ১৭৯১, মৃত্যু ১৮৯৪। কলকাতার কলুটোলার বাসিন্দা। প্রথমে তিনি ছিলেন বৃটিশের কেরাণী। পরে তিনি হয়েছিলেন তিনটি ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ।

রাধাকান্ত দেব ঃ ১৭৯৩-এ জন্ম এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় তাঁর। ইংরেজের প্রথম শ্রেণীর সহযোগী ছিলেন তিনি। বৃটিশের আদেশ, নির্দেশ ও ইঙ্গিতে লিখে ফেললেন সংস্কৃত-বাংলা অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম'। ভারতের মানুষ জানতে শুরু করল সংস্কৃত ভাষারই বাচ্চাকাচ্চা আমাদের বর্তমান ভাষাগুলি। প্রথম খেলা আরম্ভ হোল বিলেতি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বিলেতে। দ্বিতীয় খেলা আরম্ভ হোল বিলেতী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ভারতে। তৃতীয় খেলা আরম্ভ হল বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বাঙলায়। চতুর্থ খেলা হয়েছিল বঙ্গীয় ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা ভারতে। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় বৃটিশ সহযোগী ও বুদ্ধিজীবী। ইংরেজ সরকার খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে দিয়েছিলেন 'রাজাবাহাদুর' এবং 'স্যার' উপাধি। আর একটি বিশেষ উপাধি পেয়েছিলেন Knight Commander of the Star of India, সংক্ষেপে K.C.S.I.।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ঃ তিনি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ। ১৭৯৪-এ জন্মে মারা যান ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ছিলেন নীলমণি ঠাকুর। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশের বিশেষ সহযোগী ছিলেন তিনি। সারা দেশে ইংরেজ সমর্থক জমিদার শ্রেণীটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুজন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ। রামমোহনের মত হিন্দুধর্ম হতে বের হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনিও। ইংলণ্ডের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। ইংলণ্ডের রাণী ১৮৪৫-এ স্বহস্তে তাঁর স্বামী আলবার্টের মূর্তি উপহার দেন তাঁকে। তাতে কৃতার্থ হয়েছিলেন তিনি। তিনিও বৃটিশের কাছ থেকে পেয়েছিলেন একটি নতুন উপাধি—Indian Prince। তাঁরও মৃত্যু হয় ইংলণ্ডে। সাধারণতঃ রাজপুত্রকেই 'প্রিন্স' বলা হয়। দ্বারকানাথের বাবা নীলমণি রাজা না হয়েও বৃটিশের করুণায় প্রিন্সের পিতা হয়ে গেলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'রাজা' ও 'প্রিন্সে'র আলোচনা পরে করা হবে বিশেষভাবে।

গঙ্গাধর সেনরায় ঃ জন্ম ১৭৯৮-এ এবং মৃত্যু ১৮৮৫ তে। তিনি চরকের টীকা, জল্পকল্প গুরু, উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যা ও ভাগবত গীতার ব্যাখ্যান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা।

দীনশা এদুলজিওয়াচা

জয়াকর মুকুন্দরাম রাও ঃ ১৯৩৭-এ তিনি জজ হন। জজ সাহেব হয়েও বৃটিশের ইঙ্গিতে বেদান্ত দর্শনের উপর একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করতে হয়েছিল তাঁকে।

দীনশা এদুলজিওয়াচা ঃ পার্সী নেতা ছিলেন তিনি। বাড়ি মুম্বই। ১৯০১-এ হয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিও ছিলেন বৃটিশের সহযোগী বুদ্ধিজীবী।

দেবীসিংহ ঃ তিনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারি। বিভাগটি ছিল রাজস্ব বিভাগ। ভারতীয় হয়েও ভারতীয়দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার তিনি করে-ছিলেন তা বর্ণনাতীত। বৃটিশকে টিকিয়ে রাখা এবং তাদের উন্নতি সাধন করার আন্তরিকতার অভাব ছিল না তাঁর। ইংরেজ-অনুগ্রহে বিস্তৃত জমিদারী ও প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'মহারাজ' উপাধি। ১৮০৫-এ হয়েছিল তাঁর মৃত্যু।

পীতাম্বর ঃ তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ পাওয়া যায় না। আদৌ জন্মেছিলেন কিনা অনেকের কাছে তা চিন্তার বিষয়। 'শ্রাদ্ধ কৌমুদী', 'কিথি কৌমুদী', 'দায় কৌমুদী' প্রভৃতি পুস্তকগুলো তাঁর রচিত বলে প্রচারিত।

বাণেশ্বর ঃ তাঁর পিতা ছিলেন রামদেব। নবদ্বীপের জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনস্থ পণ্ডিত ছিলেন তিনি। হেস্টিংসের ইঙ্গিতে ও আদেশে একদল নির্ধারিত পণ্ডিত নিয়ে লেখা হয়েছিল 'বিবদার্ণব সেতু' নামক স্মৃতিগ্রন্থ। তাঁকেও বৃটিশ দিয়েছিল 'বিদ্যালঙ্কার' এবং তাঁর পিতাকেও দিয়েছিল 'তর্কবাগীশ' উপাধি।

মৃত্যুঞ্জয় ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা চক্রান্তাগারে সাহেবদের বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন তিনি। 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'পুরুষ পরীক্ষা'-র বঙ্গানুবাদ তাঁর কীর্তি। তাছাড়াও 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থেরও প্রণেতা ছিলেন তিনি। 'তর্কালঙ্কার' উপাধি পেয়ে মারা যান ১৮১০ খৃষ্টাব্দে।

রমানাথ ঠাকুর ঃ জন্ম ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৭৭-তে। প্রিন্স দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গভর্নর জেনারেল শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন তিনি। বৃটিশের সহযোগী হিসাবে উপাধি পেয়েছিলেন 'মহারাজা'।

প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ঃ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৬৮-তে। সরকারি উকিল ছিলেন তিনি। বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য। বৃটিশের হাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সে বাজারে তিনলক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে দিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। বৃটিশের সহযোগিতায় আরও সহযোগী তৈরি করতে 'অনুবাদক' নামে একটি বাংলা ও 'Reformer' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন তিনি।

জয়নারায়ণ ঃ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৭২-তে তাঁর মৃত্যু। ২৪ পরগণার মুচাদিপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ইনি এগারোখানি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' তাঁর বিশেষ গ্রন্থ। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র পেয়েছিলেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি এবং তিনি পেয়েছিলেন 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি।

তারানাথ ঃ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৮৮৫-তে। তিনি লিখেছিলেন 'শব্দস্তোমমহানিধি', 'আশুবোধ ব্যাকরণ' এবং 'বহুবিবাদ' গ্রন্থ। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কাশী ও কলকাতা কলেজের অধ্যাপকের পদ। তাঁর বাবা কালিদাসকে দেওয়া হয়েছিল 'সার্বভৌম' উপাধি ও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি।

প্রেমচাঁদ ঃ ১৮০৬-এ জন্ম এবং মৃত্যু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। সংস্কৃত অনুবাদের কার্যে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁকে খুব ভালবাসতেন উইলসন সাহেব। বর্ধমানের ঐ সংস্কৃত পণ্ডিতকেও দেওয়া হয়েছিল 'তর্কবাগীশ' উপাধি।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৮০৮ এবং মৃত্যু ১৮৮৮-তে। ভরতপুর দুর্গ অধিকার করতে ইংরেজরা যখন হানা দেয় তখন তিনি সাহায্য করেন বৃটিশকে। ফলে বৃটিশের সহযোগিতায় বিশাল জমিদারীর মালিক হতে পেরেছিলেন তিনি।

কালীকৃষ্ণ দেব ঃ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৭৪-তে। বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের দমনে কালীবাবু বৃটিশদের সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন। ফলে তাঁর দখলে এল এক বিশাল জমিদারী এবং পেয়েছিলেন বৃটিশের দেওয়া 'রাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ঃ ১৮১০-এ জন্ম। মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি। কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, নাগপুর ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দেওয়ানো হোত তাঁকে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছিল তাঁকে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ বঙ্গাব্দ ১২১৮-তে জন্মে ১২৬৫-তে মারা যান তিনি। ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় 'প্রভাকর' নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন, যেটা পরে হয় দৈনিক পত্রিকা। তাঁর লেখায় মুসলিম-বিদ্বেষ ও ইংরেজপ্রেম ফুটে উঠত বিশেষভাবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুসলিম বিদ্বেষী। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনেক সহযোগীদের গুরু ছিলেন তিনি।

রামতনু লাহিড়ী ঃ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৯৮-এ। মিঃ ডিরোজিওর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৮৫-তে। তিনি শুধু বৃটিশ প্রেমিকই ছিলেন না, ছিলেন খৃষ্ট প্রেমিকও। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হন ডাফ সাহেবের কাছে। ঠাকুরবাড়ীর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি মধুসূদন দত্তকেও দীক্ষিত করেন খৃষ্টান ধর্মে।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঃ ১৮১৪-তে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন তিনি। 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা মহাবিপ্লবের সময় ইংরেজকে তিনি সাহায্য করেন যথেষ্ট মাত্রায়। বৃটিশ সহযোগিতায় 'Oudh Talukadars Association' নামক সমিতি স্থাপন তাঁরই কীর্তি। 'সমাচার হিন্দুস্তানী', 'ভারত পত্রিকা' ও 'Lucknow Times'—এই পত্রিকা তিনটির তিনিই ছিলেন প্রাণপুরুষ। বৃটিশ প্রেমিক এই বুদ্ধিজীবীও পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি।

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ ১৮১৪-তে জন্মে মারা যান ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ছদ্মনাম ছিল টেকচাঁদ ঠাকুর। 'মাসিক পত্রিকা' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অনেক বইয়েরও লেখক ছিলেন তিনি।

মদনমোহন ঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৮৫৮-তে পরলোকগমন করেন তিনি। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা পেয়ে হয়েছিলেন ওই কলেজেরই অধ্যাপক। ইংরেজ সহযোগী হিসাবে তিনি হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের 'জজ-পণ্ডিত'। বৃটিশের সহায়তায় হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'তর্কালঙ্কার' উপাধি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯০৫-এ। কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন তিনি। তিনিও ছিলেন হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশের সহযোগী হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা বৃটিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই। প্রিন্স দ্বারকানাথের এই পুত্র পেয়েছিলেন 'মহর্ষি' উপাধি।

দিগম্বর মিত্র ঃ ১৮১৭ তে জন্মে পরলোকযাত্রা করেন ১৮৭৯ তে। তাঁর কর্তব্যে ও কর্মে খুশি হয়ে তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলো বৃটিশ সরকার। ঐ অর্থে এবং নিজের অর্থে বহু জমিদারী কিনেছিলেন তিনি। বৃটিশের পক্ষ থেকে তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'রাজা' উপাধি।

জঙ্গবাহাদুর ঃ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৭৭-তে। তিনি ছিলেন বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। ইংলণ্ড গিয়েছিলেন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। সেখানেই 'টোপ' গিলেছিলেন বৃটিশের। ১৮৫৭-র 'সিপাহী বিদ্রোহে' বৃটিশ পরাজিত হওয়ার উপক্রম হলে তাদেরকে সীমাতীত সাহায্য করেছিলেন জঙ্গবাহাদুর। বৃটিশের জয়লাভের পরেই তিনি পেয়ে গেলেন 'স্যার', 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' তিনটি উপাধি।

রাজেন্দ্র মল্লিক ঃ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর। নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র ছিলেন তিনি। বৃটিশকে টিকিয়ে রাখার সহযোগী হিসাবে তিনিও পেয়েছিলেন 'রাজাবাহাদুর' উপাধি।

দীনকর রাও ঃ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১৮৯৬-এ। ১৮৫৭-তে বৃটিশকে পূর্ণ সাহায্য করে লাভ করেছিলেন বেনারসের একটি বড় জমিদারি। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন বহু পুরস্কার আর পেয়েছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদ। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'রাজা' উপাধি।

মহতাব চাঁদ ঃ জন্ম ১৮২০ এবং মৃত্যু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। রামায়ণের পদ্যানুবাদ মহাভারতের গদ্যানুবাদ এবং নানা ফারসী গল্পের অনুবাদে বৃটিশ-প্রকল্পকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পেয়ে গিয়েছিলেন বড় বড় জমিদারী এবং উপাধি পেয়ে হয়েছিলেন বর্ধমানের 'মহারাজা'।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ঃ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৬৭ তে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্ম ত্যাগী। ব্রাহ্মধর্মের সভাপতি ছিলেন তিনি। কলকাতার বাসিন্দা। পেশায় ছিলেন উকিল। তাঁর নামে ভবানীপুরে আছে একটি রাস্তা ও হাসপাতাল।

বাপুদেব ঃ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর। পিতা ছিলেন সীতারাম দেব। 'সেহোরের পলিটিক্যাল এজেন্ট এল. উইলকিন্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সেহোরে লইয়া যান এবং হিন্দু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।' লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'শাস্ত্রী' উপাধি।

রামনারায়ণ ঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৮৬-তে মৃত্যু হয় তাঁর। বৃটিশ দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পুস্তক প্রণয়ন, পত্রিকা পরিচালন ও আরও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের প্রবর্তন করাতে চেয়েছিলেন এবং প্রচার করা হয়েছিল যে, প্রাচীন যুগের সংস্কৃত নাটকের অনুকরণেই সেগুলো তৈরি। তাঁর পিতাও সে বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী নেতা। তাঁর নাম ছিল 'নাটুকে রামধন'। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'শিরোমণি' আর রামনারায়ণকে দেওয়া হল 'তর্করত্ন' উপাধি। সংস্কৃত কলেজে পড়েছিলেন ১৮৪৩ হতে ১৮৫৬ পর্যন্ত। ঐ সংস্কৃত কলেজেই অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন তিনি। 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'মালতী মাধব' প্রভৃতি নাটকগুলো তাঁরই রচিত।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ঃ ১৮২২ ও ১৯০৩ হোল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বৃটিশের প্রথম শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন তিনি। হতে পেরেছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও। পরে উন্নতির চরম পর্যায়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন সহজেই। পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। সেইসঙ্গে আরও পেয়েছিলেন 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি। তাঁর বাবা রাজকৃষ্ণও পেয়েছিলেন 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি। তাঁর পিতামহ নবকৃষ্ণও পেয়েছিলেন 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি। ইতিহাসে তিনি শোভাবাজারের জমিদার বলে বিখ্যাত।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৮৭৩-তে। তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোটভাই। বৃটিশ-পরিকল্পনার পূর্ণ সহযোগী। ইংরেজদের ইংরেজী পত্রিকা 'Calcutta Review'-এর প্রথম বাঙালী লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে। ইংরেজী পত্রিকা 'Indian Field'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। ঐ পত্রিকার মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্বাচন করা হয় বৃটিশের 'বড় দায়িত্ব' পালনের জন্য।

গিরিশচন্দ্র ঃ ১৮২২-এ জন্মে পরলোকগমন করেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। 'শব্দসাগর' অভিধান তাঁর বড় অবদান। সরকারের সহযোগিতায় প্রচার ও প্রকাশনার কাজে স্থাপন

করেছিলেন 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে ছাপাখানা। ২৪ পরগণার রাজপুরের ঐ সংস্কৃত পণ্ডিত বংশগতভাবেই ইংরেজের সহযোগী। তাঁর পিতা পেয়েছিলেন 'বিদ্যাবাচস্পতি' এবং তিনি পেয়েছিলেন 'বিদ্যারত্ন' উপাধি।

দুর্গাচরণ লাহাঃ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯০৪-এ হয় তাঁর মৃত্যু। তাঁর পিতা ছিলেন রামকৃষ্ণ লাহা। দুর্গাচরণ হয়েছিলেন প্রথম বাঙালী 'পোর্ট কমিশনার'। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। বহু জমিদারী কিনে জমিদার হন এবং সরকারের নিকট হতে পান 'মহারাজ' উপাধি।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ ১৮২৪ ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ দুটি হল তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বৃটিশ সরকারের অধীনে মাসিক ২৫ টাকা বেতনের কর্মচারি ছিলেন তিনি। পরে এসিস্ট্যান্ট মিলিটারী অডিটর হন এবং বেতন বেড়ে হয় মাসিক ৪০০ টাকা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট নামক পত্রিকাখানির পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই কাগজে লিখিয়াই তিনি প্রমাণ করেন যে, বাঙ্গালী রাজদ্রোহী নয়।'

মূল শংকরঃ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৮৩-তে মৃত্যু হয় তাঁর। নাম পাল্টে হয়ে গেলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টিতে বিষবৃক্ষের মত 'আর্য সমাজ' এর তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। 'ঋগ্বেদভাষ্য' ও 'সত্যার্থ প্রকাশ' বই দুটিতে ফুটে উঠেছে তাঁর মতামত।

মধুসূদন দত্তঃ ১৮২৪-এ জন্মে মারা যান ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। তিনিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩-এ। তিনি ছিলেন বৃটিশ অনুগত। 'Madras Circulation', 'Hindu' এবং 'Madras Spectator' পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিলেন, তিনি। পরপর দুইজন খৃষ্টান কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে হয়েছিলেন ব্যারিষ্টার। প্রকৃত কবি-সুলভ হৃদয় থাকার জন্য বৃটিশের সীমাহীন দালালি করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে তিনি অর্থাভাবে মারা যান সাধারণ হাসপাতালে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রঃ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৮৯১-এ মারা যান তিনি। ১২৮ খানি পুস্তকের লেখক এবং ঐতিহাসিক। বাংলা, ইংরাজী, ফার্সী, জার্মান, হিন্দী, উর্দু, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাতে তিনি নাকি ছিলেন পণ্ডিত। বৃটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক পরিকল্পিত বিষয় যুক্ত করে তাঁকে দিয়ে লেখানো হয়েছে অনেককিছু। যেমন 'শিবাজীর জীবনী', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রভৃতি। উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্যগুলো তিনি নাকি সংগ্রহ করেছিলেন নানা ভাষার বই থেকে। পূর্বেই প্রচারিত

হয়েছিল যে, তিনি বহুভাষাতে সিদ্ধ পণ্ডিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদ। তিনিও হতে পেরেছিলেন বিরাট ধনী ও জমিদার এবং পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি।

সূর্যকুমার চক্রবর্তীঃ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৭৪-তে মৃত্যু হয় তাঁর। লণ্ডনের এম. ডি. পাশ করা ডাক্তার ছিলেন তিনি। বৃটিশের প্রথম শ্রেণীর সহযোগী ছিলেন এবং সহযোগিতার মাত্রা বাড়িয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে গুডিভ সাহেবের আদেশে খৃষ্টান হয়ে নিজেকে পরিচয় দিতেন গুডিভ চক্রবর্তী বলে।

দাদাভাই নৌরজী

দাদাভাই নৌরজীঃ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১৯১৭-তে। জাতিতে ছিলেন অ-হিন্দু, পারসিক। বৃটিশ সরকারের একান্ত গুণগ্রাহী। এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। গুজরাটী প্রত্রিকা 'গোফতার' এর তিনি ছিলেন সম্পাদক। তিনি ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। বৃটিশের গুণগ্রাহী ঐ ব্যক্তি ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীঃ ১৮২৫ এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ ছিল তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। তিনিও ছিলেন বৃটিশের অনুগত ভক্ত। বুদ্ধিজীবী লেখক নির্বাচনের যে প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা হোত সেটার নাম ছিল সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা। তাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। ঢাকা কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন তিনি। পূর্বে অঙ্কশাস্ত্রের যে সব শব্দ ব্যবহৃত হোত বৃটিশের ইঙ্গিতে সেগুলো বাতিল করে ''তিনিই প্রথম বাঙ্গালা 'গণিত গ্রন্থ' ও 'গণিত পরিভাষা' লিপিবদ্ধ করেন।'' তাঁর বাড়ি ছিল হুগলী জেলার রাধানগর।

রাজনারায়ণ বসুঃ ১৮২৬-এ জন্মে ১৮৯৯-এ মারা যান তিনি। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ''তাঁহার লিখিত রচনা সমূহ লইয়া ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে

বহুবার বহু আলোচনা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিধবা বিবাহের প্রচার করিতে থাকেন।'' উপনিষদ সমূহের ইংরাজী অনুবাদ তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজনারায়ণ বসু

লালবিহারী দে ঃ ১৮২৬-এ জন্মে মারা যান ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার পলাশী। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছিলেন তিনি। বৃটিশের পূর্ণ সহযোগী যে ছিলেন ধর্মান্তরই তার বড় প্রমাণ। 'তাঁহার রচিত বই Bengal Peasant Life, Govinda Samanta এবং Folk Tales of Bengal তাঁহার ইংরাজী ভাষার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৯৪-এ মৃত্যু হয় তাঁর। বংশগতভাবেই তাঁরা ছিলেন রাজ-অনুগত। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন 'তর্কভূষণ' উপাধি। হুগলী জেলায় ছিল তাঁদের আদিবাস। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক হয়ে যান তিনি। স্কুলের নামকরণেই পরিস্থিতি অনুমেয়। পরে উন্নতি করে তিনি হন স্কুল-ইন্সপেক্টর। কিছুদিনের জন্য হয়েছিলেন বঙ্গের Director of Public Instruction। শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণ করতে 'Education Gazette', 'শিক্ষাদর্পণ' ও 'সংবাদসার' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন তিনি। বাবার নামে নির্মাণ করেন 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' এবং মায়ের নামে নির্মাণ করেন 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়'। ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার ভিত্তিপত্তন তাঁরই অবদান।

অদ্বৈতদাস বাবাজী ঃ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯২৯-এ। তাঁর আসল নাম ছিল ভীমকিশোর রক্ষিত। বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলা। সারা ভারতবর্ষে গান বাজনায় মুসলমান খান বংশ ছিল একচেটিয়া প্রশংসিত। বৃটিশের আদেশ ও ইঙ্গিতে সঙ্গীত বিভাগে প্রয়োজন হয় একটি নতুন ধারা সৃষ্টির। বৃন্দাবনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁকে। পরে কাশিমবাজারেই তিনি শিক্ষা দেন কীর্তন গান। তাঁর চেষ্টায় 'হরিণামৃত' গীত ব্যাকরণটি

'সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডে' বিদেশী ও দেশী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯১৪-তে। বৃটিশের উচ্চ পর্যায়ের সহযোগী ছিলেন তিনি। প্রচারের প্রচণ্ড স্রোতে তিনি ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রাতাত্ত্বিক ও বহু মৌলিক [?] ইতিহাসের জন্মদাতা। কণিষ্ক, পালরাজগণের ইতিহাস প্রভৃতি তাঁর নতুন আবিষ্কার। 'ধর্মপাল', 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'পাষাণের কথা' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ [?] তাঁর রচনা। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা প্রভৃতি খননকার্যে তিনি ছিলেন বৃটিশের প্রথম শ্রেণীর সমর্থক, প্রচারক ও স্তাবক। এই সমস্ত বহুমুখী কাজের জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'স্যার', 'নায়রত্ন' ও 'মহামহোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধি। আখের গুছিয়ে ধনী হওয়ার সুযোগে ব্যাঘাত ঘটেনি তাঁর।

দীনবন্ধু মিত্র ঃ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মে ১৮৭৩-তে মারা যান তিনি। ইংরেজের সহযোগী হিসাবেই ডাকবিভাগের সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন ইনি। একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। বেশি প্রমাণের প্রয়োজন হবেনা এইজন্য যে, বৃটিশের দেওয়া 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ার পর একটু কমে গিয়েছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার।

তারকনাথ পালিত ঃ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯১৪-তে মৃত্যু ঘটে তাঁর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা বুদ্ধিজীবীরা বেশিরভাগই ছিলেন বৃটিশ অনুগত। কারণ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেইভাবেই সাজানো। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন ১৫ লক্ষ টাকা।

জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর ঃ জন্ম হয় ১৮৩১ ও মৃত্যু হয় ১৯০৮-এ। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা সভার সদস্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন তিনি। অশিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে প্রচলিত মনগড়া ইতিহাস এবং সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস তুলে ধরার জন্য সর্বপ্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত করেন তিনিই। উপকৃত সরকার জমিদার বংশে জন্মানো জ্যোতিন্দ্রমোহনকে আরও বড় জমিদার হওয়ার সুযোগ দিলেন সহজে এবং তাঁকেও 'স্যার' উপাধির সঙ্গে দেওয়া হল 'মহারাজা' উপাধি।

রামগতি ঃ বাংলা ১২৩৮-এ জন্মে ১৩০১ সালে মারা যান তিনি। বাড়ী ছিল হুগলী জেলার ইলছোবা। ''তাঁহার রচিত 'বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্য বিষয়ক' বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস।'' তিনিও ন্যায্য পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধি।

মঙ্গলদাস নাথুভাই ঃ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৮৯০-এ। লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডন জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সদস্য। মৃত্যুর আগে বৃটিশের হিতার্থে দিয়ে গেছেন কয়েক লক্ষ টাকা। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'Justice of the Peace' উপাধি।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ বঙ্গাব্দ ১২৪১-এ জন্ম ও ১২৮২-তে মৃত্যু হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'রাজা' উপাধি।

কৃত্তিবাস ওঝা ঃ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম কিন্তু মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাল্মীকির রামায়ণের পদ্যানুবাদের জন্য তিনি স্মরণীয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ঃ আধুনিক গীতিকাব্যের জনক ছিলেন তিনি। 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য সংক্রান্তি' ও 'অবোধবন্ধু'—পত্রিকা তিনটির প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া 'সারদা মঙ্গল', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সঙ্গীতশতক' তাঁরই রচনা। ১৮৩৫-এ জন্ম এবং মৃত্যু ১৮৯৪-এ।

নন্দকুমার ঃ ১৮৩৫-এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে বিদায় নেন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন নৈহাটীর ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তিনি। বৃটিশ সহযোগী এই পণ্ডিত পেয়েছিলেন 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি। তাঁর পিতা রামকমলও পেয়েছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধি।

দ্বারকানাথ মিত্র ঃ ১৮৩৬-এ জন্মে মারা যান ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি হুগলী জেলার আগুন্সী। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

চন্দ্রকান্ত ঃ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ ছিল তাঁর জন্ম এবং ১৯১৩ হোল তাঁর মৃত্যুবর্ষ। তাঁর পিতা রাধাকান্তও পেয়েছিলেন 'তর্কবাগীশ' উপাধি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক করা হয় তাঁকে। ১৮৯৭-এ তাঁকে দেওয়া হয় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি। তাঁর লেখা বহু পুস্তক বিদ্যমান। তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ 'তর্কালঙ্কার' উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন।

মহেশচন্দ্র ঃ এঁর জন্ম হয় ১৮৩৬-এ এবং মৃত্যু হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার লারিট। ১৮৬৪-তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং পরে ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ হন তিনি। উপাধি পেয়েছিলেন 'ন্যায়রত্ন' ও 'মহামহোপাধ্যায়'। তাঁর বাবা হরিনারায়ণও পেয়েছিলেন 'তর্করত্ন'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৮৯৪-এ। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন একথা বললে ভুল হবে বরং তিনি

ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্রিটিশ সহযোগী। 'সাহিত্য সম্রাট', 'ঋষি' বঙ্কিমকে ১৮৫৪-তে দেওয়া হয়েছিল সরকারী বৃত্তি। তিনি যখন B.A. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন তখন ইংরেজ সরকারের পক্ষ হতে তাঁকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয় সাত নম্বর গ্রেস দিয়ে—এর পূর্ণ তথ্য পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় ১৭.৬.৮৪ তারিখে 'যে প্রশ্নে বঙ্কিম ফেল করেছিলেন' শিরোনামে প্রকাশিত। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বৃটিশ তাঁকেও দান করেছিল 'রায়বাহাদুর' খেতাব। তাঁকে করা হয়েছিল 'University Institute' নামক বিখ্যাত সংস্থার প্রেসিডেন্ট। বৃটিশ সরকারের নিকট হতে তিনি পেয়েছিলেন দুর্লভ C.I.E. উপাধি, যার পুরো কথাটা হচ্ছে Companion of the Indian Empire—যার বঙ্গার্থ ভারত সাম্রাজ্যের সহযোগী। বহু গ্রন্থ, পুস্তক ও প্রবন্ধের স্রষ্টা ছিলেন তিনি। তাঁর লেখায় মুসলিম-মানস আহত হয় ভীষণভাবে। বৃটিশ বিরোধী কোন ভূমিকা তো তাঁর ছিলই না বরং ছিল তার বিপরীত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণদাস পাল ঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৮৪-তে। সরকার অনুগত ব্যক্তিত্ব। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছিলেন তিনি। ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদকও।

ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯৪-এ। 'সমাচার হিন্দুস্তান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। 'Reis and Rayyet' পত্রিকারও তিনি ছিলেন আজীবন সম্পাদক। তাঁর লিখিত কিছু ইংরাজী বইও বিদ্যমান।

দীননাথ সেন ঃ ১৮৩৯ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ দু'টি ছিল তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের স্কুল ইন্সপেক্টর এবং বৃটিশের একান্ত অনুগত নেতা। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন তিনি এবং আরও বহু হিন্দুকে সরকারপ্রেমী করতে ঢাকায় স্থাপন করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ।

ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ১২৪৬ সনে জন্ম ও ১৩০০ সনে মৃত্যু হয় তাঁর। ইংরেজ-সহযোগী সৃষ্টির প্রেক্ষিতে পরিচালনা করতেন ইংরেজি পত্রিকা 'Indian Empire'।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর : ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯১৪-তে। বৃটিশ রাজত্বের বিশেষ সহযোগী ছিলেন তিনি। সরকারের সহযোগিতায় ফিলাডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পান 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি। তিনি ছিলেন 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ মিউজিক'-এর প্রতিষ্ঠাতা। সারা জীবনে তাঁর বিশেষ সাধনা ছিল—প্রাচীন ভারতে গীত, বাদ্য, নাটক সবই নাকি ছিল, তারই পুনরুভ্যুত্থান হয়েছে মাত্র! রাজা না হয়েও তিনিও লাভ করেছিলেন 'রাজা' এবং 'স্যার' উপাধি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৭০-তে মৃত্যু। জোড়াসাঁকোর জমিদার-পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা ছিলেন জমিদার নন্দলাল বসু। হিন্দু কলেজে কিছুদিন পড়ে পড়াশুনা করেন বাড়িতেই। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তিনি কালীদাসের লেখা অনেক বইয়ের অনুবাদকও। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'পরিদর্শক' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক।

চন্দ্রনাথ বসু : ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯২৪-এ। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। সরকারি সুনজরে পড়ে হয়ে যান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে হন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ। ১৮৭৯-তে তাঁকে করে দেওয়া হোল বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। বঙ্কিমের বন্ধু এই চন্দ্রনাথ পান অনুবাদকের পদ। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে 'হিন্দুতত্ত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'শকুন্তলাতত্ত্ব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৯২৬ এ। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার : [১৮৪০—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ] হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ইনিও বৃটিশের একজন সহযোগী। ভারতের সকল প্রদেশ ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকার নানা দেশ এবং জাপান গিয়েছিলেন তিনি। 'ইন্টারপ্রেটর' নামক বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় বাগ্মী। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা 'Heart Beats', 'Spirit of God', 'Life and Teaching of Keshab Chandra Sen' বইগুলো উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'Oriental Christ' বইটি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে তিনি ছিলেন একজন একান্ত বৃটিশ-সহযোগী।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮৪১ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ দুটি যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো। জোড়াসাঁকোয় নাট্যশালা গঠন, চৈত্রমেলা সৃষ্টি এবং তার বিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দুমেলায় রূপান্তর তাঁর বিশেষ অবদান। ''এই চৈত্রমেলাই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।''

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর : ১৮৪১-এ জন্মে মারা যান ১৯০৫-এ। বৃটিশের অন্যতম ধনী জমিদার সহযোগী ছিলেন তিনি।

দুর্গামোহন দাস : তিনিও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান ১৮৯৭-এ। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব। তাঁর বিধবা বিমাতার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এবং বৃদ্ধ বয়সে নিজেও বিয়ে করেছিলেন এক বিধবাকে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তাঁরই জামাতা। ভারত বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও দাতা চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁর ভাইপো। তিনিও ছিলেন অহিন্দু, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত।

প্রতাপচন্দ্র রায় : ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৮৯৫-এ। বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে। কথিত আছে সরকারি পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাঁকে। ''তিনি সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ইহার প্রতি খণ্ড ৪২ টাকায় বিক্রয় করিয়া পরে এক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিলাইয়া দেন''। তিনি অন্যান্য পুরাণেরও বঙ্গানুবাদ করেন। মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন তিনি।

আনন্দ চার্লু

আনন্দ চার্লু : ১৮৪২-এ জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে তিনি ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোল নবদ্বীপে এনে। প্রথা বা বাঁধা নিয়ম হিসাবে দেওয়া হল 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি। মাদ্রাজের 'মহাজন সভা' ও 'পিপলস্ ম্যাগাজিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে তিনিই হয়েছিলেন সভাপতি।

গোবিন্দ রানাডে : ১৮৪২ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। প্রথম হয়েছিলেন ল' পরীক্ষায়। সরকার বেছে নিয়ে তাঁকে করে দিলেন মুম্বই হাইকোর্টের বিচারপতি। তারপর তাঁকে জুড়ে দেওয়া হল বিশেষ কাজে। আদেশ হোল ইতিহাস লেখার। যে

মারাঠা জাতি ছিল মারহাট্টা, লুণ্ঠনকারী, নিষ্ঠুর বলে পরিচিত, তার ইতিহাস লিখে প্রমাণ করেছিলেন মারাঠা জাতিই ছিল মুসলমান শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং ঐ মারাঠা জাতির আদর্শে নতুন পথে চলতে হবে হিন্দু সমাজকে।

বীরেশ্বর পাণ্ডে ঃ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকযাত্রা করেন ১৯১১-তে। বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলা। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ও সাহিত্যিক। 'লীলাবতী' বা 'গণিত বিজ্ঞান' পুস্তক তাঁরই রচনা। তাঁর লেখা অনেক বই ছিল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক। 'মানবতত্ত্ব' বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ করে দেশ-বিদেশে সুনাম পেয়েছিলেন তিনি। 'ধর্মশাস্ত্র তত্ত্ব' ও 'কর্তব্য বিচার' বই দুটিও তাঁর অনন্য অবদান।

মতিলাল রায় ঃ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯০৮-এ। বাড়ি ছিল বর্ধমানের ভাতশালা গ্রাম। তিনি ছিলেন সরকারি চাকুরীজীবী। সরকারি সহযোগিতা ও ইঙ্গিতে তিনি যাত্রার দল তৈরি করেন নবদ্বীপে। এত পরিশ্রমে যে সব বই এতদিন লেখা হচ্ছিল সেগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে শুরু হয়ে গেল যাত্রা। 'সীতাহরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'কর্ণবধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', প্রভৃতি নাটক মতিলালেরই রচনা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ১৮৪২ হতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হল তাঁর জীবনকাল। বিলেত হতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে তিনিই হয়েছিলেন 'প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। বৃটিশ প্রভাবিত এই' পণ্ডিত, অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর, জজ, সেসন জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের সহোদর। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্মত্যাগী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী এবং ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের সম্মানীয় সভাপতি ও আচার্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালীপদ ঘোষ ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৩-এ এবং মারা যান ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। 'প্রসিদ্ধ গদ্য সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখক'। 'সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল'। সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঐ সহযোগীকে দিয়ে অনেক বই লিখিয়ে নিয়েছিল বৃটিশ সরকার। পরিবর্তে তিনিও হয়েছিলেন ধনী। সরকারি সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' এবং পাণ্ডিত্যের জন্য পেয়েছিলেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৮৪৪ এবং মৃত্যু হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। বাড়ী ছিল কলকাতার খিদিরপুর। সরকার দরদী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সরকারের অনুগ্রহে ইংরেজ অফিসে হয়েছিলেন কেরাণী। ১৮৬৮-তে বিলেত হতে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরতেই দাম বাড়িয়ে দেওয়া হোল তাঁর। তিনিই হলেন প্রথম স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি মারা যান বিলেতেই।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গিরীশচন্দ্র ঘোষ ঃ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকযাত্রা করেন ১৯১২-তে। তিনি ছিলেন বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। গ্রাম-বাংলার মানুষকে দেখাবার মত যাত্রাগান চালু হয়েছিল আগেই। এবার শিক্ষিত মানুষের জন্য এল থিয়েটার। স্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড ও ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন তিনি। বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক উপন্যাসগুলো নাটকে রূপ দেন সাংঘাতিকভাবে। বৃটিশকে খুশি করতে শেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ তাঁর অবদান। তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টার ফল 'সখের থিয়েটার'। পরে সেটির নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। এইবার তিনি তৈরি করলেন ঐতিহাসিক [!] নাটক। 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি নাটকগুলো চিত্তাকর্ষক করে দিলেন তিনি। আরও তৈরি করলেন পরিকল্পিত 'বুদ্ধদেব চরিত', 'প্রভাসযজ্ঞ' ও 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি। মুসলমানদের হেয় করা শুরু হোল 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি মুসলিম নবাব রাজা বাদশাহদের ইতিহাসকেন্দ্রিক বিকৃত নাটকের মাধ্যমে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে এসে বিদায় নেন ১৮৯৮-এ। তাঁর পিতা ছিলেন কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ছিলেন স্কুল শিক্ষক এবং 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক। সরকারি সহযোগী হিন্দু ধর্ম ত্যাগী এই ব্যক্তি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের একজন নেতা।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ঃ জন্ম ১৮৪৪ এবং মৃত্যু ১৮৯৫-এ। হুগলীর কোন্নগরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ইংরেজ-সহযোগী হিসাবেই পেয়েছিলেন ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ। ওই কংগ্রেস-কর্মী ১৮৭৭-তে পান D.L. উপাধি।

ভুবনমোহন দাস ঃ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯২৪-এ। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্মত্যাগী একজ ব্রাহ্ম পণ্ডিত। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকাদুটির সম্পাদক ছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মনমোহন ঘোষ ঃ ১৮৪৪-এ জন্মে পরলোকযাত্রা করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। বিলেত পাশ ব্যারিষ্টার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ইংরেজী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সরকারি সহযোগী ছিলেন। বিলেত গিয়েছিলেন চারবার।

যোগেন্দ্রনাথ ঃ জন্ম ১৮৪৫ এবং মৃত্যু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ১৮৮০-তে হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'আর্যদর্শন' নামে পত্রিকা প্রকাশ তাঁর বিশেষ অবদান। বৃটিশ সহযোগী ও বৃটিশ নেতাদের ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে তিনি লিখেছিলেন 'ম্যাৎসিনীর জীবনবৃত্ত', 'গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত' ও 'জন স্টুয়ার্টমিলের জীবনবৃত্ত'। বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন বলে নিজেও বিয়ে করেন এক বিধবাকে। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি।

দ্বারকানাথ সেন ঃ ১৮৪৫-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় তাঁর। সরকার-সহযোগী এই ব্যক্তি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য পেয়েছিলেন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

গৌরীশঙ্কর দে ঃ ১৮৪৫ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ দুটি হোল তাঁর জন্ম ও মৃত্যু বর্ষ। এই পণ্ডিত সরকারের এমনই বাছাই করা ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁকে যখন General Assembly's Institute-এর গণিতের অধ্যাপক করে দেওয়া হয় তখনও পর্যন্ত তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলই প্রকাশ হয় নি। 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁকে।

চণ্ডীচরণ সেন ঃ এঁর জীবনকাল হোল ১৮৪৫-১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। 'Uncle Tom's-Cabin' বইটির অনুবাদ করে প্রশংসিত হন তিনি। হয়েছিলেন সাবজজ্। হিন্দু জাতির মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তাঁর কলম ছিল অগ্নিবর্ষক। 'লঙ্কাকাণ্ড', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেওয়ান গোবিন্দ সিংহ', 'ঝাঁন্সীর রাণী', 'এই কি রামের অযোধ্যা?' প্রভৃতি তাঁরই লেখা বই। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, তিনি স্বয়ং ছিলেন হিন্দু ধর্ম ত্যাগী, ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ ১৮৪৫ হতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হোল তাঁর জীবনকাল। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। 'বেঙ্গলীপত্র' নামে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ইনি। ঐ যোগ্য ব্যক্তি পেয়েছিলেন 'বিদ্যাপতি' উপাধি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি।

নরেন্দ্রনাথ সেন ঃ ১৮৪৬-এ জন্মে মারা যান ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। বৃটিশ সরকারের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর সহযোগী। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের অ্যাটর্নী। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন তিনি। তাঁকে করা হয়েছিল 'গীতা সভা'র সভাপতি। বৃটিশের ইঙ্গিতে তৈরি Bengal Theosophical Society-র সদস্য ছিলেন তিনি। সরকার তাঁকেও দিয়েছিল 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

পঞ্চানন ঃ জন্ম ১৮৪৬ এবং মৃত্যু ১৯৪০-এ। বঙ্গবাসী কার্যালয়ের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। 'ধর্ম সিদ্ধান্ত', 'অমরমঙ্গল' প্রভৃতি তাঁরই রচিত পুস্তক। তিনিও পেয়েছিলেন 'তর্করত্ন' উপাধি। তাঁর পিতা নন্দলালও পেয়েছিলেন 'বিদ্যারত্ন' উপাধি।

সত্যব্রত সামশ্রমী ঃ ১৮৪৬ এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দ দুটি হল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। সংস্কৃত পণ্ডিত। বাড়ি ছিল পাটনা। 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা'-র জন্য 'সাম্বেদ' সম্পাদনা তাঁর অবদান। 'বৈদিক নিরুক্ত'র তিনি প্রণেতা। কিছুদিনের জন্য তিনি হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের অধ্যাপক।

হারান চক্রবর্তী ঃ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৩৫-এ। বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলা। কলকাতায় তাঁকে করে দেওয়া হয়েছিল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। পরিকল্পিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল বেদেই, তা প্রচারের ব্যবস্থা হোল সহজে। রাজশাহীতে নগদ ৭০ হাজার টাকায় বার্ষিক ৪২ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় আয়ুর্বেদ কলেজের। সংস্কৃত পণ্ডিত তো তিনি ছিলেনই, তা না হলে কি করে ওষুধ খুঁজে পেলেন সংস্কৃত শ্লোকে? তাঁকেও দেওয়া হোল 'কবিরাজ প্রাণাচার্য' উপাধি।

আনন্দমোহন বসু ঃ ১৮৪৭ এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ ছিল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ.-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে দেওয়া হয় 'র‍্যাংলার' উপাধি। 'রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ' বৃত্তিও পেয়েছিলেন। কলকাতার সিটি কলেজ ও আনন্দমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তিনিও ছিলেন হিন্দু ধর্ম ত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৮৪৭-এ জন্ম হয় এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় তাঁর। বাড়ি হুগলী জেলায়। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হন এবং লাভ করেন 'রেভারেণ্ড' উপাধি।

কবি নবীনচন্দ্র সেন ঃ ১৮৪৭ থেকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হল তাঁর জীবনকাল। সরকারের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। সামান্য স্কুল শিক্ষক থেকে হয়ে যান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর লেখায় সরকার উপকৃত হয়েছে বিশেষভাবে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখে মুসলিম বিদ্বেষীদের কাছে তিনি হয়েছিলেন পরম প্রশংসিত। 'অবকাশ রঞ্জিনী', 'প্রভাস',

'অমিতাভ', 'রঙ্গমতী', 'আমার জীবন', 'প্রবাসের পত্র' এবং 'গীতা' ও 'চণ্ডী' অনুবাদ তাঁর বিশেষ অবদান। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর আগমনে বৃটিশের স্তবস্তুতিতে ভরা 'ভারত উচ্ছ্বাস' নামে লিখিত প্রশংসাপত্রের জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল নগদ ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯১৯-এ মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি ছিলেন অনেক স্কুলের শিক্ষক। লেখার হাতও ভাল ছিল তাঁর। ১৮৮৮ তে গেলেন ইংলণ্ডে। ওখান থেকে ফিরে হিন্দু ধর্মত্যাগী হয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে করলেন আত্মনিয়োগ।

শিবনাথ শাস্ত্রী

রমেশচন্দ্র দত্ত ঃ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯০৯-এ। বাড়ী ছিল কলকাতা। সরকারের অনুগত হিসাবে চাকরি পান শাসন বিভাগে। তার পরে হন কমিশনার। বিলেত থেকে হয়ে এলেন ব্যারিস্টার। ধরলেন নতুন পথ। করলেন ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ। বের হল তাঁর লেখা আরও অনেক বই। লণ্ডনে ডাক পড়ল তাঁর। লণ্ডন ইউনির্ভাসিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হলেন তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং মারা যান ১৯২৫ এ। কবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা। তিনি নিজেও ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে হন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

প্রসন্নকুমার রায় ঃ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ইনিও। এঁর বাড়ি ছিল ঢাকা। ইংলণ্ডে পাশ করেন B.Sc.। এডিনবরা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের D.Sc.। বৃটিশ সরকারের সহযোগী ছিলেন তিনি। পাটনা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন এবং পরে হন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজ পরিদর্শকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। তিনিও ছিলেন হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

শরৎচন্দ্র ঃ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৯১৭-তে মারা যান। প্রথমে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তারপর কলকাতায় Buddhist Text Society স্থাপন করে বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করলেন তিনি। আধুনিক অনেক গবেষকদের মতে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বলে কোন ধর্মই ছিল না। এসব নাকি বিলেতি বুদ্ধির খেলা। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্যই হয়ত সরকার তাঁকে দিয়েছিল 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৯১৫ তে। বাড়ি ছিল ঢাকা। বৃটিশের বাছাইকরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। এডিনবরা ও জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছিলেন D.Sc.। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল হায়দ্রাবাদ। তাঁর কাজে খুশি হয়ে সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি'। তিনিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করেন খৃষ্টান ধর্ম।

কাশীনাথ তেলাঙ্গ ত্রিম্বক ঃ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৮৯৩-এ। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন তিনি। "পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ইংরাজী অনুবাদ করার ভার প্রদান করেন।"

অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী ঃ বাংলা ১২৫৮ সালে জন্মে ১৩১৫-তে মারা যান তিনি। বাড়ি ছিল কলকাতা। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী ও অভিনয় শিক্ষক।

কৃষ্ণকুমার মিত্র ঃ ১৮৫২-তে জন্মগ্রহণ করে ১৯৩৭-এ মারা যান তিনি। তিনি ছিলেন কলকাতার সিটি স্কুলের শিক্ষক। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'নারী রক্ষা সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তিনিও একজন হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তি।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল ঃ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৮-এ। হুগলী জেলার রামনগরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সরকারের সহযোগী বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে হয়েছিলেন জেলাশাসক। 'সাধনা' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। 'বৈদিক সোম' ও 'সংখ্যাদর্শন' তাঁরই রচিত গ্রন্থ।

মহেশ্বর ঃ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। "তিনি কাব্য প্রকাশের 'ভাবার্থ চিন্তামণি' নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 'বর্ণধর্ম প্রদীপ', 'দ্বার প্রদীপ', 'বিচার প্রদীপ', 'সংসার প্রদীপ' প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আঠশখানি 'প্রদীপ' লিখিয়া গিয়াছেন।" বিপুল পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনিও পেয়েছিলেন 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধি।

অমৃতলাল বসু ঃ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর জন্ম এবং ১৯২৯-এ হয় তাঁর মৃত্যু। স্কুলে পড়েছিলেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সরকারের বিশেষ সহযোগীও ছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার ও মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'হীরকচূর্ণ', 'বিজয় বসন্ত', 'হরিশচন্দ্র', 'তরুবালা', 'অবতার', 'খাসদখল'

উল্লেখযোগ্য। থিয়েটারের উপর পারিশ্রমিক হিসাবে সরকারের সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে দেওয়া হয় 'জগত্তারিণী' পুরস্কারের সঙ্গে স্বর্ণপদক।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ঃ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। 'ভারত সুহৃদ' ও 'নব্য ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সরকার সহযোগী ঐ বুদ্ধিজীবীও সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে।

নবীনচন্দ্র দাস ঃ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৪-তে। বৃটিশ প্রেমিক ঐ বুদ্ধিজীবী হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বৃটিশের পথ কুসুমাস্তীর্ণ করতে বেশ কিছু বই লিখেছিলেন তিনি। যেমন—'আকাশ কুসুম', 'রঘুবংশম্', 'কিরাতার্জুন' প্রভৃতি। 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯০৬-এ তাঁকেও দেওয়া হয় 'কবিগুণাকর' উপাধি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৩১-এ। তিনি বৃটিশভক্ত ছিলেন বংশগতভাবেই। পিতা কমললোচন পেয়েছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধি। হরপ্রসাদ মহাশয় ছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। পরে ওখানকার অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর নাকি ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ছিলেন সংস্কৃত, ইংরাজী, পালি, জার্মান, তিব্বতী ভাষার মহাপণ্ডিত। "প্রথম হইতেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।" "হাজার বছরের পুরাণ, বাংলাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা তাঁহারই আবিষ্কার। বাল্মীকির জয়, ভারত মহিলা, মেঘদূত [অনুবাদ], বেনের মেয়ে ইত্যাদি তাঁহার লিখিত গ্রন্থ। এই বিখ্যাত লোককে বিখ্যাত উপাধিই দেওয়া হইয়াছিল---'শাস্ত্রী' এবং 'মহামহোপাধ্যায়'।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

দুর্গাদাস লাহিড়ী ঃ ১৮৫৩ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনকাল। বর্ধমান জেলায় ছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর লেখা পুস্তিকের মধ্যে 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। ৪০ খণ্ডে বেদের মূলভাষ্য বা ব্যাখ্যাপ্রকাশ তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

যোগেন্দ্রনাথ বসু ঃ ১৮৫৪-তে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বেড়ুগ্রাম। বাংলা ও হিন্দীতে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এবং ইংরেজী 'টেলিগ্রাম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। বেশ কিছু বইও ছিল তাঁর।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এবং মারা যান ১৯২৬-এ। মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজে পরিচিত হন প্রথমে। বৃটিশের সাম্প্রদায়িকতার প্রচার প্রসারে তিনি ছিলেন একজন বিশেষ কর্মী। মুসলমানদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি প্রবর্তন করেন 'শুদ্ধি প্রথা'। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র তিক্ততা। তিনি নিহত হন আততায়ীর হাতে।

দেবেন্দ্রনাথ দাস ঃ ১৮৫৬-তে তাঁর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯০৮-এ। তিনি ছিলেন ইংরেজের পছন্দসই ব্যক্তি। তাই পেয়েছিলেন বহু প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার। ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কৃতের পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। বৃটিশসহযোগী যুব সমাজ তৈরি করতে তাঁকে অনেক কাজ করতে হয়েছিল। সিটি কলেজ ও রিপন কলেজের অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয় তাঁকে। তখনকার এফ. এ. ও বি. এ. পাঠ্যপুস্তকের বহু নোট লেখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৮৫৬ হতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ছিল তাঁর জীবনকাল। 'পূর্ণিমা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। 'চিত্তমুকুট', 'বাসন্তী', 'চিন্তা', প্রভৃতি পুস্তকও তাঁর লেখা। বোর্ড অফ রেভিনিউ এবং কলকাতা হাইকোর্টে ইংরাজী বিভাগে কেটেছিল তাঁর কর্মজীবন।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৩৮-এ মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি ছিলেন কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ। পরে হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক। তিনিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম।

বিশ্বম্ভর ঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯১২-তে। বংশগতভাবে তাঁরা ছিলেন বৃটিশ অনুগত। সারা ভারতে মুসলিম প্রভাবিত সমাজে মুসলিম পঞ্জিকা, হিজরী সন ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন ছিল তখন। বৃটিশ সরকার সেটা বিলুপ্ত করতে গ্রহণ করে একটা পরিকল্পনা। সেই প্রকল্পের একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন বিশ্বম্ভর। "বোম্বাইয়ে পঞ্জিকা সংস্কার সভায় তিনি বঙ্গদেশের জ্যোতির্বিদগণের প্রতিনিধিস্বরূপ গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করেন।" গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি জ্যোতিষার্ণব

উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতা সতীশচন্দ্র পেয়েছিলেন বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি। তাঁর পিতা পীতাম্বরবাবু পেয়েছিলেন 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি।

প্রেমানন্দ ভারতী ঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯১৪-তে। ওটা তাঁর আসল নাম ছিল না, আসল নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইউরোপ এবং আমেরিকায়। 'লাইট অফ ইণ্ডিয়া' নামক একটি মাসিক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদনা করতে হয় তাঁকে। ইংরাজীতে 'প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ' নামে একখানি বই বের হয়েছিল যেটার প্রণেতা ছিলেন তিনিই।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং মারা যান ১৯১৬ তে। তিনি ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সংকলন করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তিনিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বরণ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম। তাঁর লেখা অনেক বইয়ের মধ্যে 'পাপীর নবজীবনলাভ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঃ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৯৩৭-এ। তাঁর পিতা ভগবান বসু ছিলেন বৃটিশ অধীনস্থ একজন ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশ বসু লণ্ডন হতে B.Sc. ও D.Sc. ডিগ্রী নিয়ে হয়েছিলেন প্রেসেডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। কলকাতার 'বোস ইনস্টিটিউট' বা বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'Response in the Living and Non-Living,' 'Plant Response' এবং 'অব্যক্ত' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তিনিও 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকাই ছিল না তাঁর।

জগদীশচন্দ্র বসু

পণ্ডিত রমাবাঈ ঃ ১৮৫৮-তে জন্ম এবং ১৯২১-এ মৃত্যু হয় তাঁর। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে বলা হোত 'সরস্বতী'। 'চেলটেলহ্যাম' লেডিজ কলেজে তিনি ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপিকা। বিধবাদের কল্যাণার্থে তিনি আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'রমাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন'। বোম্বাইয়ের 'বিধবা নিবাস'-এর তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাত্রী। একজন

বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন তিনি। বৃটিশ সহযোগিতায় কার্পণ্য ছিল না তাঁর। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তিনিও দীক্ষা নিয়েছিলেন খৃষ্টান ধর্মে।

রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী ঃ তিনি ছিলেন বিরাট ধনী জমিদার। তাঁরই অর্থে কৃষ্ণ রায় সক্ষম হয়েছিলেন রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে। প্রকৃত রাজা না হয়েও তিনি পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঃ ১৮৫৯-এ তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১৯২৪-এ। বাড়ি ছিল হুগলী জেলা। সরকারি সহযোগী ছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতির পদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন তিনি। ১৯১৪-তে হন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯২২-এ তাঁকে জেনেভায় পাঠানো হয় ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে। তিনি সরকারের সুনজর হতে বঞ্চিত হননি কখনো।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তাঁর জন্ম হয় ১৮৫৯-এ এবং ১৯২৫-এ হয় মৃত্যু। তাঁর বাড়ি ছিল হুগলী জেলা। যুব সমাজের মস্তিষ্ক তৈরিতে 'চারুবার্তা', 'হিতবাদী', 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন এবং 'আর্যদর্শন' পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন তিনি। মিঃ টডের তথাকথিত ইংরেজী ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, ইতিহাস হিসাবে লিখেছিলেন 'আহমদনগরের পতন'।

মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঃ ১৮৬০-এ জন্মে মারা যান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন কাশিমবাজারের বৃটিশ সহযোগী বিখ্যাত জমিদার। ইংরেজ রাজের ইঙ্গিতে তাঁরই বাড়িতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য হয়েছিলেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। সরকারকে সন্তুষ্ট করে তিনি পেয়েছিলেন 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা'-র সদস্যপদ। বৃটিশের শাসন-শোষণের হাত মজবুত করতে এবং তাদের আরাম আয়েসের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেছিলেন তিনি। বৃটিশ রাজ তাঁকেও দিয়েছিল 'মহারাজ' উপাধি।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০-এ এবং পরলোকযাত্রা করেন ১৯৩৬-এ। তাঁর বাড়ি ছিল বোম্বাই বা মুম্বই। পেশায় তিনি ছিলেন উকিল। সরকারি সহযোগিতায় ও ইঙ্গিতে তাঁকে আসতে হয় সঙ্গীত বিভাগে। তিনি নাকি বৈদিক বা প্রাচীন যুগের সঙ্গীত শিল্পকে করেছিলেন পুনরুজ্জীবিত। সঙ্গীতের উপর অনেক গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন তিনি। 'শততাল লক্ষণম্', 'অভিনব তালমঞ্জুরী' এই দুটি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২৫ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী'র যে অধিবেশন হয় সেগুলোর প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনিই।

সত্যপ্রসন্ন সিংহ ঃ ১৮৬৩ ও ১৯৩০ হোল তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বীরভূম জেলার রায়পুরে ছিল তাঁর বাড়ি। ব্যারিষ্টার ছিলেন তিনি। সরকারের কতখানি সহযোগী ছিলেন তা প্রমাণিত হয় বৃটিশ প্রদত্ত 'লর্ড' উপাধি পাওয়াতে।

শিবচন্দ্র ঃ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মে বিদায় নেন ১৯১৪-তে। নবদ্বীপের নামকরা তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন তিনি। 'ভগবতীতত্ত্ব' বইটি তাঁরই রচনা। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যার্ণব' উপাধি।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কালীপ্রসন্ন ঃ ১৮৬১ হতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হল তাঁর জীবনকাল। লণ্ডনে পড়াশুনা করে সেখানকার একটি স্কুলে সুযোগ পান শিক্ষকতার। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় একজন বাগ্মীও ছিলেন তিনি। 'অ্যান্টিক্রিস্টিয়ান' ও 'কস্‌মো পলিটিয়ান' নামক দুটি ইংরাজী পত্রিকা ও 'হিতবাদী' নামক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনিও পেয়েছিলেন 'কাব্য বিশারদ' উপাধি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ ১৮৬১-তে জন্মে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান তিনি। খুলনা জেলা বাড়ি ছিল তাঁর। এডিনবরা ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞানী হয়ে আসেন তিনি। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' রসায়নাগারের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশের সহযোগিতায় তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। তাঁর লেখা বইগুলোর নামকরণ প্রমাণ করে তাঁর বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য এবং সুপ্ত মানসিকতা। যেমন, 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার', 'অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ঃ ১৮৬১-তে জন্ম এবং ১৯০৭-এ মৃত্যু হয় তাঁর। কলকাতায় ছিল তাঁর বাড়ি। দেবীচরণ ব্যানার্জী ছিলেন তাঁর পিতা। 'Twenty Century' বিখ্যাত পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। তিনিও হয়ে গিয়েছিলেন খৃষ্টান। অথচ ইউরোপের নানা দেশে, নানা জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন বেদ-বেদান্ত বিষয়ে। সবই বিস্ময়ের ব্যাপার!

রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১-তে এবং পরলোকযাত্রা করেন ১৯২৫-এ। নব আবিষ্কৃত সুর ও স্বরের পরিপূর্ণ সংগীতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তিনি। বঙ্গের কাশিমবাজারের ঘাঁটিতে তিনি দিতেন সঙ্গীত শিক্ষা।

মদনমোহন মালব্য ঃ ১৮৬১-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগমন করেন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বাড়ি ছিল এলাহাবাদ। মালবদেশে ছিল তাঁদের আদিনিবাস। পেশায় ছিলেন উকিল। ১৯১৮-তে হন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিই আবার ১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে হয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি। হিন্দু চিন্তা, হিন্দু উন্নতি এসব নিয়েই উদ্গ্রীব ছিলেন তিনি। উঁচুজাতের হিন্দুদের জন্য কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। হরিজনদের তিনি করতেন ঘৃণা। তাঁদের ছোঁয়া কোন ফলও তিনি খেতেন না।

মদনমোহন মালব্য

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬২-তে এবং মারা যান ১৯১১-তে। তাঁর বাড়ি ছিল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা। তিনি ছিলেন ইংরেজগত প্রাণ। প্রথমে ইংরেজের অধীনে সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন পরে বৃটিশের ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় ভারতবাসীদের উপর চালিয়েছিলেন অকথ্য অত্যাচার। শাসন শোষণের প্রথম শ্রেণীর এই নায়ককে সরকার চুপিচুপি উপাধি না দিয়ে তেরটি তোপধ্বনি দেওয়ার পর দেয় 'রাজা' উপাধি। ইংলণ্ডের বক্রাইলে মারা গেলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পঞ্চম জর্জের আদেশে জাঁকজমকের সঙ্গে সামরিক প্রথায় করা হয়।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঃ ১৮৬২ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বাড়ি ছিল হাওড়া জেলায়। ইংলণ্ডের এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের D.L. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। 'ইউরোপে তিন মাস' তাঁর বিখ্যাত বই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১৯১৩-তে। বৃটিশ শাসকের প্রথম সারির অন্যতম সহযোগী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও লেখক। তাঁকে দিয়েও লেখানো হয়েছিল বেশ কিছু ইতিহাস [!], যেমন 'মেবারের পতন', 'সাজাহান'। 'Lyrics of Ind' এবং 'Crops of Bengal' তাঁর লেখা বিখ্যাত ইংরাজী বই। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটির তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৯৪৯-এ। ইংরেজ সরকার বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন চীনে। চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর নেওয়া করিয়ে তাঁকে আরও দায়িত্ব পালন করতে হয় পূর্ণিয়া ও কাশীতে। 'কাশীর কিঞ্চিৎ' ও 'কোষ্ঠীর ফলাফল' এবং ইংরাজী 'I Has' বইগুলোর লেখক ছিলেন তিনি।

ক্ষীরোদ প্রসাদ ঃ ১৮৬৩-তে জন্মে মারা যান ১৯২৭-এ। বংশগতভাবে তাঁরা ছিলেন বৃটিশ-প্রেমিক। পিতা গুরুচরণ ভট্টাচার্য ছিলেন 'শিরোমণি' উপাধিপ্রাপ্ত। ২৪ পরগণার খড়দহে বাড়ি ছিল তাঁর। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। ঐ পদ ছাড়িয়ে তাঁকে লাগানো হয় অন্য দায়িত্বে—'অলৌকিক রহস্য' পত্রিকার সম্পাদকের পদে। তারপর অভিনয় শুরু করলেন যাত্রা ও নাটকে। পরিবেশ ও পরিকাঠামো আরও অনুকূল করতে লিখলেন অনেক বই। যেমন ঃ 'আলমগীর', 'বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার', 'চাঁদবিবি', 'সাবিত্রী', 'নারায়ণী' ও 'প্রমোদরঞ্জন' প্রভৃতি। এই বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করে আখের গোছাতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩-তে এবং পরলোকগমন করেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাড়ি ছিল কলকাতা। পিতা-বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন বিখ্যাত উকিল। বিবেকানন্দ ছিলেন মেট্রোপলিটন স্কুলের শিক্ষক। বর্তমানে ভারতের ইতিহাসে তিনি এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। শ্রী রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর গুরু। 'Parliament of Religion' নামক যে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল আমেরিকায় চিকাগোয়, সেখানে গিয়ে সেই সভার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও বক্তা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন তিনি। মিঃ সাঙ্গবার্গ, মিসেস্ লুই ও মিস্ মার্গারেট নোবেল—এঁরা ছিলেন

তাঁর বিশেষ সহযোগী ও একান্ত অনুগত। বেলুড় মঠ, আলমোড়ার ব্রহ্মচার্য বিদ্যালয়, আমেরিকার বেদান্ত বিদ্যালয়, বেনারসের ব্রহ্মচার্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। 'Reincarnation', 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি তাঁরই লেখা উল্লেখযোগ্য বই। বহুল প্রচারিত না হলেও তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক কবি। বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠতর ধনী মিঃ রকফেলার তাঁকে দিয়েছিলেন বিরাট অঙ্কের অর্থ।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য ঃ ১৮৬৩-তে জন্মগ্রহণ এবং ১৯০৮-এ হয় তাঁর মৃত্যু। বংশগতভাবে তাঁরা ছিলেন বৃটিশ সহযোগী। এম. এ. পাশ করা শিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কাজে তাঁকে ব্যবহার করেছিল বৃটিশ সরকার। সরকারি দায়িত্ব পালনে কলকাতা, মাদ্রাজ, শিলং, নাগপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে। তিনিই হয়েছিলেন ভারতের প্রথম অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যারত্ন' এবং তাঁর বাবা মহেশচন্দ্র পেয়েছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ ১৮৬৪ হতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। বঙ্গের সত্যিই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যখন বৃটিশের মার খাচ্ছে, গুলি খাচ্ছে ও ফাঁসিতে যাচ্ছে তখন বৃটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভূমিকাই ছিল না তাঁর। যখন বিচারপতিদের কাঁধে বন্দুক রেখে বিচারের প্রহসনে বৃটিশ সর্বনাশ করত ভারতীয়দের, সেই সময় আশুতোষকেও করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সুতরাং তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বাসভাজনতার প্রতি বৃটিশের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন চারবার। 'রাঁয়চাদ প্রেমচাঁদ' পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। লর্ড লিটন তাঁকে দিয়েছিলেন 'টাইগার অব বেঙ্গল' উপাধি। তাঁর ধারাবাহিক কর্ম, যোগ্যতা ও বিচারকার্যে খুশী হয়ে সরকার তাঁকেও দিয়েছিল 'স্যার' উপাধি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ঃ ১৮৬৪ তে পৃথিবীতে এসে বিদায় নেন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। অনেকবার বিলেত গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন M.A., Ph.D., D. Sc.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'স্যার' এবং 'আচার্য' উপাধি।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ ১৮৬৪ তে জন্মে মারা যান ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক হিসাবে প্রশংসিত। 'আচার্য' উপাধি তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৫ তে এবং পরলোকগমন করেন ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে। বৃটিশের সহকারী ও সংগঠন কর্মী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন 'Modern Review', 'প্রবাসী', 'বিশাল ভারত', 'ধর্মবন্ধু' ও 'প্রদীপ' পত্রিকাগুলোর প্রকাশক ও প্রধান পরিচালক। হিন্দু কায়স্থ সম্প্রদায়ের আরও উন্নতিকল্পে যে কায়স্থ কলেজ হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার অধ্যাপক। জাতিসংঘের অধিবেশনে আহ্বান করা হয়েছিল তাঁকে। তিনিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বরণ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম।

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ ১৮৬৬-তে জন্মে মারা যান ১৯৩৯-এ। বাড়ি ছিল কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সরকারের বিশেষ সহযোগীদের অন্যতম। তাঁকে সম্মানজনক ভাবে দেওয়া হয় D.Litt. এবং তিনিও পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

বিনয়কৃষ্ণ দেব ঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯১২-তে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় ছিলেন বৃটিশ প্রেমিক। তাঁর পিতা কমলকৃষ্ণ দেব এবং পিতামহ নবকৃষ্ণ দেব উভয়েই ছিলেন সরকারের সাহায্যকারী ও উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বিনয়দেব ছিলেন 'সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং 'Historical Society'-র সহ-সভাপতি। তাঁর লেখা 'Early History and Growth of Calcutta' উল্লেখযোগ্য বই। তিনিও পেয়েছিলেন 'রাজাবাহাদুর' উপাধি।

গিরীন্দ্রশেখর বসু ঃ ১৮৬৭ এবং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ দুটো যথাক্রমে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুবর্ষ। M.Sc. পাশ করা M.B. ডাক্তার ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ইংরাজী বই 'Everyday' এবং বিখ্যাত বাংলা বই 'পুরাণ প্রবেশ'।

হরবিলাস সর্দ্দা ঃ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর জন্ম। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য হন তিনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। যদিও তিনি ছিলেন জজ সাহেব তবুও বিশেষ ইঙ্গিতে লেখালেখি করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর বিখ্যাত বই 'Hindu Superiority'।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। পিতার নাম ছিল দ্বারকানাথ। কলকাতায় ছিল তাঁদের বাড়ি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। সরকারি সহযোগিতায় হিন্দু জাগরণের বিশেষ ভূমিকায় Bengal Theosophical Society-র সভাপতি হয়েছিলেন। 'গীতা ও ঈশ্বরবাদ' 'শিক্ষা না সেবা?' 'বেদান্তবাদ' বইগুলো তাঁরই রচনা।

প্রমথ চৌধুরী ঃ ১৮৬৮ হতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। বাড়ি ছিল পাবনা জেলায়। পেশায় ব্যারিষ্টার তিনি। আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদনাও করতেন। বাংলা কথ্য ভাষায় বিশেষ অবদান আছে তাঁর। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'বীরবল' উপাধি।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ঃ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৩৯-এ। তিনি ছিলেন ইতিহাস গবেষক এবং কটন কলেজের অধ্যাপক। ইতিহাসের নামে সরকারের অনুকূলে তিনি যে মূল্যবান বস্তু সৃষ্টি করেন তাতে সরকার খুশি হয়ে তাঁকেও দিয়েছিলেন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

জগদীন্দ্রনাথ রায় ঃ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯২৬-এ মৃত্যু হয় তাঁর। 'Bengal Land Holders Association' বা 'বঙ্গীয় জমিদার সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই। 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' পত্রিকাদুটোর সম্পাদকের কাজ করতেন। লেখক ও ঐতিহাসিক হওয়ার 'সুবর্ণ সুযোগ' ছিল তখন, তাই লিখলেন 'দারার অদৃষ্ট' ও 'নূরজাহান'। হিন্দু জাগরণের জন্য লিখলেন 'শ্রুতিস্মৃতি'। সরকার জমিদারির মালিক করে দিলেন এবং 'মহারাজ' উপাধি দিলেন তাঁকে।

সতীশচন্দ্র ঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৯২০ তাঁর মৃত্যুবর্ষ। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। মাথা খাটিয়ে লিখেছিলেন উদ্ভট একটি বই— 'পালি ব্যাকরণ'। গবেষকদের অনেকের মতে 'পালি' বলে কোন ভাষাই নাকি ছিল না। আর একটি ইংরাজী বই লিখলেন, যেটি

প্রচারিত হয়েছিল ন্যায়দর্শনের অনুবাদ হিসাবে এবং তা নাকি ছিল উৎকৃষ্ট। 'বিদ্যাভূষণ' এবং 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিও পেয়েছিলেন সেইজন্য।

যদুনাথ সরকার ঃ জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল রাজশাহী জেলা। M.A. তে ইংরাজী সাহিত্যে ভাল ফলের জন্য তাঁকে দেওয়া হল 'মওয়াট' স্বর্ণপদক। তারপর তাঁকে দেওয়া হয় 'গ্রিফিথ রিসার্চ' ও 'রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ' বৃত্তি। ১৮৯৮-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এবং পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক করে দেওয়া হয় তাঁকে। উন্নতি আরও উঁচুতে উঠল, হলেন ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। মৌলিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী যদুনাথ সরকার লিখলেন পাঁচখন্ডে বিভক্ত আওরঙ্গজেবের বৃহৎ জীবনী, অখ্যাত শিবাজীকে বিখ্যাত করে লিখলেন 'শিবাজী' এবং লিখলেন 'Fall of the Mughal Empire'—এইসব বইয়ে প্রমাণিত হোল আওরঙ্গজেব নিকৃষ্ট, শিবাজী উৎকৃষ্ট, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব এবং ইসলামধর্ম। এই রকম বিরাট ব্যক্তিকেও সরকার দিয়েছিলেন বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি।

নগেন্দ্রনাথ সোম ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁর পরলোকগমন ১৯৪০-এ। বাড়ি ছিল হুগলী জেলার সরষা। পিতা মহেন্দ্রনাথ সোম। যুগোপযোগী বেশ কিছু বই লিখলেন তিনি, যেগুলোর বেশ গুরুত্ব ছিল বৃটিশের কাছে। তাই তাঁকেও দেওয়া হয় 'কবিশেখর' ও 'কাব্যালঙ্কার' উপাধি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৮৯৯-এ মৃত্যু হয় তাঁর। সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তিনি। হিন্দু সমাজের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন অথচ নিজে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মে পরলোকগমন করেন ১৯৫১-তে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পুত্র ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক ও জমিদার। তাঁর লেখা বেশ কিছু বই 'রাজকাহিনী' ও 'শকুন্তলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখাপড়া বেশি

জানতেন না তিনি তবুও চিত্রশিল্পের ব্যাপারে সরকারের বিশেষ সহযোগী ছিলেন, তাই তাঁকে করে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন 'Indian Society of Oriental Arts'-এর প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তিনিও হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

অরবিন্দ ঘোষ ঃ জন্ম ১৮৭২ এবং মৃত্যু ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। ১৭ বছর বয়সে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন তিনি, ফিরে এসে হয়েছিলেন বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ। বাংলা 'বন্দেমাতরম' ও ইংরাজী 'কর্মযোগীন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা ছিলেন। বৃটিশ তাঁকে দিয়েছিল কারাদন্ড। জেল থেকে বের হয়ে তিনি সাধু সেজে আশ্রম করলেন পন্ডিচেরীতে। সেখানে ফ্রান্সের এক মহিলা এলেন ঋষির কাছে। ঋষি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম পাল্টে নাম রাখলেন শ্রীমা। অরবিন্দ ঘোষের লেখা বইগুলোর মধ্যে 'The Hero and the Nymph', 'Songs to Myrtilla and Other Poems', 'গীতাভাষ্য', 'The Life Divine' উল্লেখযোগ্য।

অরবিন্দ ঘোষ

হরগৌরীশঙ্কর ঃ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯১৮-তে। তাঁর বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা। সরকার তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে। সরকারি সহযোগিতায় জ্ঞানদা চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে তিনি দিয়েছিলেন জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ কাজের পুরস্কার হিসাবে তিনিও পেয়েছিলেন 'জোতির্বিনোদ' উপাধি।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ঃ ১৮৭২ থেকে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনকাল। সরকার ঐ সহযোগী পন্ডিতকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেন। দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনিও পেয়েছিলেন 'তর্কভূষণ' উপাধি।

ডঃ গঙ্গানাথ ঝা ঃ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে মরা যান ১৯৪১-এ। M.A. পাশ করার পর D.Litt. পেয়েছিলেন ১৯১০-এ এবং L.L.D. উপাধি পেয়েছিলেন ১৯২৫-এ। তিনিও তাঁর কর্তব্য পালনের জন্য পেয়েছিলেন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

হরিদাস ঃ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর। 'কংসবধ' নামে সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন তিনি এবং টীকাসহ মহাভারতের মূল বঙ্গানুবাদ তাঁর অক্ষয়কীর্তি। তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকেও দেওয়া হয় 'শব্দাচার্য', 'সিদ্ধান্তবাগীশ' ও মহামহোপাধ্যায়' —তিনটি উপাধি।

অমূল্যচরণ ঃ ১৮৭৭-১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হোল-তাঁর জীবনকাল। পালি ও প্রাকৃত, এই উদ্ভট ভাষায় তাঁর নাকি ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ''বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্য Translation Bureau ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য Edward Institution প্রতিষ্ঠা করেন।'' 'বাণী' নামে বাংলা পত্রিকা ও 'India Academy' নামে ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'পঞ্চপুষ্প' নামে একটি মাসিক পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন তিনি। বহুকাল ধরে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস সংকলনেও তিনি ছিলেন দৃষ্টান্তবিহীন ব্যক্তি। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে পরলোকগমন করেন ১৯৩৮-এ। বাড়ি ছিল মালদহের চাঁচল। সরকার দরদী এই ব্যক্তি ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। 'বিষ্ণু পুরাণ' ও 'মহাভারত' তাঁর রচিত বই। 'শূন্যপুরাণ' ও 'কবিকঙ্কনচন্ডী'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর অনেক বইয়ের মধ্যে 'বিদ্যাপতি চন্ডীদাস' ও 'রবিরশ্মি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকার-বান্ধব এই ব্যক্তি B.A. পাশ ছিলেন মাত্র। কিন্তু না পড়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে 'সম্মানসূচক M.A. ডিগ্রী' দেওয়া হয়।

লক্ষণশাস্ত্রী ঃ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৩২-এ। বেদান্তদর্শনে পান্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর। বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের তিনি ছিলেন এক প্রাণপুরুষ। তিনিও পেয়েছিলেন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

ফণীভূষণ ঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও হয়েছিলেন। তাঁর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করানো হয়েছিল তাঁকে দিয়ে। তিনিও পেয়েছিলেন 'তর্কবাগীশ' ও 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রাধানগর সাহিত্য সম্মেলন ও বোম্বাইয়ের ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে নরওয়ের আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ব মহাসম্মেলনে গিয়েছিলেন। বহু পুস্তক প্রণেতাও ছিলেন তিনি।

কিছুদিন পূর্বে সৃষ্ট কীর্তন গানকে শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। এই যোগ্য ব্যক্তিকেও দেওয়া হয়েছিল 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ঃ ১৮৮৩ থেকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হোল তাঁর জীবনকাল। তিনি পেয়েছিলেন পাটনা গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপকের পদ। সরকারের বিশেষ সহযোগী ব্যক্তি হিসাবেই রয়াল হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, রয়াল ইকনমিক্যাল সোসাইটি, রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস্ এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি--এগুলোর সম্মানীয় সদস্য হয়েছিলেন তিনি। পাটনা মিউজিয়াম তাঁরই প্রতিষ্ঠা। পাটনা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। 'Economic Condition of Ancient India', 'Economic History of Bihar', 'Glories of Magadh' প্রভৃতি ইংরাজী বই, নয় খন্ডে লেখা 'সমসাময়িক ভারত', 'ইংরেজের কথা', 'দেশভক্তি' প্রভৃতি ইতিহাসমূলক বই এবং 'চতুর্বেদ', 'পঞ্চবাণ' প্রভৃতি ধর্মমূলক বই, 'সাহিত্য পঞ্জিকা' নামে সাহিত্যমূলক বই তাঁর বিশেষ সৃষ্টি ও অবদান। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'দ্যূতি', 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' ও 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি' নামে তিনটি উপাধি।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। সরকার সহযোগী ঐ মনীষী নিজস্ব যোগ্যতায় হয়েছিলেন বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও ভূমিরাজস্ব কমিশনের সম্মানীয় সদস্য। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। 'ইতিহাস' নামক বস্তু সৃষ্টি করা ও করানো—দুটোতেই ছিল তাঁর বিশেষ পান্ডিত্য। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'ইতিহাস শিরোমণি' উপাধি।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ঃ তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ। সঙ্গীত কলাভবনের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। সঙ্গীত সম্মিলনীর অধ্যাপকও ছিলেন তিনি। 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত বিভাগটিতে মুসলিম খাঁন সম্প্রদায়ের ছিল বিশেষ খ্যাতি। গিরিজাবাবু যাঁদের কাছ থেকে ঐ সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায় ইতিহাসে। ''মহম্মদ আলী খাঁন, নবাব জুম্মন, এনায়েত হোসেন খাঁন, মোজাফফর খাঁন, বাদল খাঁন প্রভৃতি হিন্দুস্তানী ওস্তাদের নিকট বহুকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন।''

শিশির কুমার ভাদুড়ী ঃ ১৮৮৭তে জন্ম হয় তাঁর। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছেড়ে চলে এলেন থিয়েটারের লাইনে, যোগ দিলেন ম্যাডান থিয়েটারে। ১৯৩১-এ আমেরিকায় নাট্যকলা প্রদর্শন করতে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। 'আলমগীর' নাটকে আলমগীর, 'সীতা'য় রাম, 'দিগ্বিজয়ী'-তে নাদিরশাহের অভিনয় করেছিলেন তিনি স্বয়ং।

অরুণ কুমার সিংহ ঃ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তিনিও ছিলেন বংশগতভাবে বৃটিশ প্রেমিক। তাঁর পিতা ছিলেন গভর্নর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ। অরুণবাবু ছিলেন ব্যারিষ্টার। লণ্ডনে তাঁকে লর্ড সভায় স্থান দিতে আপত্তি ওঠে। অবশেষে তাঁকে ঐ সভায় স্থান দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন সম্মানীয় 'লর্ড' উপাধি পেয়েছিলেন তিনিও।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা ইতিহাসের মধ্যে 'History of Bengal' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ইনিও। বৃটিশ শাসনকালে হাইকোর্টের উকিল থেকে বিচারপতি করা হয় তাঁকে। ১৯৩৬-এ জেনেভায় জাতিসংঘে ভারতীয় সদস্য হিসাবে তিনিও হয়েছিলেন নির্বাচিত।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। M.A., Ph.D., D.Sc. ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন হরিজন বা অচ্ছুত [?] পরিবারের সন্তান। বরোদার গাইকোয়াড়ের অর্থ-সাহায্যে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে পড়ার পর তাঁকে ইংলণ্ডের 'ইন্ডিয়া অফিসে' সুযোগ দেওয়া হয় গবেষণার। বিলেতের গোলটেবিল বৈঠকে অনুন্নত বা হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করা ছিল তাঁর এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তাঁর দাবি অবশ্যই অবান্তর ও অযৌক্তিক ছিল না। তাঁর অনেক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'Mr Gandhi and the Emancipation of the Untouchables' এবং 'What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables'। তাঁকে উপাধি দেওয়ার মত কোন সুযোগ পায়নি বৃটিশ সরকার।

বি. আর. আম্বেদকর

স্বামী প্রণবানন্দ ঃ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯৪০-এ। তিনি ছিলেন 'ভারত সেবা সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা। "জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি হিন্দু ধর্মের প্রচার ও হিন্দু সংগঠনে কাটান। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০ মিলন মন্দির স্থাপন করেন ও ৩৫,০০০ হিন্দু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।" তাঁর সংগঠন ছিল সম্প্রদায়ভিত্তিক।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ঃ তিনি ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পুত্র। একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। ইংরেজ-প্রেমের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ঃ বাড়ি ছিল কলকাতা। প্রথমে তিনি ছিলেন বিচারপতি। রামমোহন রায়ের শিষ্য হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন তিনি। 'Quill' পত্রিকাটির তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক। 'মনুসংহিতা'-র ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

তারাশঙ্কর ঃ বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার কাঁচকুলি। সংস্কৃত কলেজের কর্মচারি ছিলেন তিনি। 'সমপ্রকাশ' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' পুস্তকটিও তাঁর রচনা। 'কাদম্বরী'র বঙ্গানুবাদ ছিল তাঁর অনন্য অবদান। ১৮৫৮ তে হয়েছিল তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল 'তর্করত্ন' উপাধি।

মুন্সী দেবীপ্রসাদ ঃ ভাষাবিদ ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁর ছিল মহাপাণ্ডিত্য। 'পলিগ্লট গ্রামার' [Polyglot Gramar] পুস্তকটিতে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফার্সী, হিন্দি ও উর্দু ভাষার সংমিশ্রণ ও সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। বইটি ব্যাকরণ না অভিধান না খিঁচুড়ি ওয়ার্ডবুক তা চিন্তার বিষয়। ওই নামের কোন লোক ওই বইটি লিখেছিলেন নাকি তা উর্বর মস্তিষ্ক কিছু লেখকের সৃষ্টি তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

ডাঃ নীলরতন সরকার ঃ জন্মস্থান ছিল ২৪ পরগণার নেতরা গ্রাম। সরকারের সহযোগী এম. বি. পাশ করা ডাক্তার। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল ট্যানারীর প্রতিষ্ঠাতা। যৌবনেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মে। কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতাল স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর নাম।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। সরকারি সহযোগী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা' ও 'বড়লাটের শাসন পরিষদে'র অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। 'বৃটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে'র সম্পাদক ও সভাপতির পদও পেয়েছিলেন যথাক্রমে।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর ঃ সংস্কৃত ও ইংরাজীতে M.A. এই ব্যক্তি প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে উন্নতি করে ১৮৮৫-তে Ph.D. করেন। ১৮৮৬ তে বোম্বাই বা মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন 'ভিয়েনা কংগ্রেস'-এ। ১৮৮৭ তে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ। অবশেষে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন তিনি। সরকারকে খুশি করার ক্ষমতা ও রুচি দুইই

ছিল তাঁর। তাঁর পিতাও ছিলেন সরকারের অনুগত 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, নাম ছিল রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর।

তারাকুমার ঃ বাড়ি ছিল ২৪ পরগণার চিংড়িপোতা। তাঁর পিতা কৃষ্ণমোহন ছিলেন অন্যতম বৃটিশ সহযোগী, তিনি পেয়েছিলেন 'শিরোমণি' উপাধি। তারাকুমার ছিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ রচনা করিয়েছিলেন অনেক পাঠ্যপুস্তক। তিনিও পেয়েছিলেন 'কবিরত্ন' উপাধি।

প্রমথনাথ ঃ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর ছিল অনন্য অবদান। তিনিও পেয়েছিলেন 'তর্কভূষণ' উপাধি।

রাজেন্দ্রনাথ ঃ কলকাতার সংস্কৃত কলেজ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে ছিলেন বহুদিন। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়েছিল তাঁকেও। পরিবর্তে তিনিও পেয়েছিলেন 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি।

শিবচন্দ্র ঃ 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা' ও 'সুধাসিন্ধু'র তিনিই ছিলেন স্রষ্টা। বাংলাভাষাতেও বেশ কিছু বই আছে তাঁর। তার মধ্যে 'বিধবা বিবাহ খন্ডন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিও পেয়েছিলেন 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তদানীন্তন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হোল মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য এখানে বিশ্বকোষ সৃষ্টি নয়, উদ্দেশ্য একটা নতুন বিষয়ের অবতারণা করা মাত্র।

মাত্র দশ শতাংশেরও কম মানুষ নিজেদের ভদ্রলোক বানিয়ে নিয়ে বাকী ৯০ শতাংশকে অবহেলা করে আসছে সুদীর্ঘ দিন ধরে। নানা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাঁদের। যেমন অচ্ছুত, ছোটলোক, হরিজন, শূদ্র প্রভৃতি। মুসলমানদের আখ্যায়িত করা হয়েছে বিদেশী, যবন, নেড়ে প্রভৃতি নানা নামে। এই সার্বিক ষড়যন্ত্রের মূলে যে উর্বর মস্তিষ্ক কাজ করেছে তা নিঃসন্দেহে সত্য। বর্তমান কথিত ভারতের হিন্দু জাতি সংখ্যাগুরু হিসেবে প্রচারিত। কিন্তু যদি ঐ ৯০ শতাংশ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সরে আসেন তাঁদের থেকে, তাহলে সারা ভারতের ষড়যন্ত্রকারীরাই পরিণত হবে সংখ্যালঘু শ্রেণীতে। এমনই ষড়যন্ত্রের কারসাজি যে, মেথর, মুচি, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি সমাজবন্ধুদের ভোট ও গদির খাতিরে তাঁদেরকে হিন্দু বানিয়ে রাখলেও মন্দিরে পৌরহিত্য করা ও সগৌরবে প্রবেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বহুদিন থেকেই। শিখ জাতিকে এতদিন হিন্দু বলেই চালানো হচ্ছিল। তাঁরা নিজেদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন — এখন বলতে পারছেন যে, তাঁরা স্বতন্ত্র ধর্মের মানুষ।

ইতিহাসে স্থান পাওয়া কবি মধুসূদন দত্ত, শ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সূর্যকুমার [গুডিভ] চক্রবর্তী, শ্রীমতী পন্ডিত রমাবাঈ, শ্রী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রী গুরুদাস মৈত্র, শ্রী উমেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানাবার ব্যবস্থাই হয়নি যে তাঁরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বরণ করে নিয়েছিলেন খৃষ্টান ধর্মকে। এমনিভাবে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছেন অথচ তাঁদের হিন্দু বলেই চালানো হচ্ছে এরকম আরো অনেক মনীষী আছেন যেমন রাজা রামমোহন রায়, শ্রী কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী দীননাথ সেন, শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রী ভুবনমোহন দাস, শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রী ব্রজসুন্দর মিত্র, শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হরিশচন্দ্র মুখার্জী, শ্রী আঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রী দুর্গামোহন দাস, শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শ্রী তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শ্রী শিবচন্দ্র দেব, শ্রী রাজনারায়ণ বসু, শ্রী প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রী রামতনু লাহিড়ী, শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী, দেশবন্ধু শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল, ডঃ শ্রী শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ডঃ শ্রী নীলরতন সরকার প্রমুখ। এঁরা সকলেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে দীক্ষিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মে।

কেশবচন্দ্র সেন

এখানেও কয়েক কোটি মানুষ ক্রুর চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ জনগণকে শেখানো হয়েছে হিন্দু ধর্ম আর ব্রাহ্মধর্ম একই, ভিন্ন নাম মাত্র। কিন্তু আসল সত্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম তৈরি হয়েছিল হিন্দু ধর্মের বিরোধিতার জন্যই। তুলে ধরা হচ্ছে কিছু উদ্ধৃতি—

"যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরা পান করিতে পারিতেন তিনি [ব্রাহ্ম] সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।" [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৬৭ দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মগণ মুসলমানদের দোকানে খাওয়ার বিষয়ে হঠকারিতা দেখাতেন— "কলিকাতাতে যেমন প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণকে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ

করিয়া রুটি আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের রুটি খাইতে পারে বা কে চর্মপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া খাইতে পারে।" [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ১৯০]

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা "প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরা পান করিত। যে যত অসম সাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১২৭]

সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের লোকেরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লড়াই করতে গিয়ে তাঁদের বয়কট করেন, সে ইতিহাসও বিদ্যমান।

"ব্রাহ্মদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইল এমনকি মাঝিমাল্লারাও অনেকস্থলে তাহাদিগকে নৌকায় তুলিতে ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্ম সমাজের শক্তিকে খর্ব করিতে পারিল না।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১৯২]

হিন্দু জাতি যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোরক্ষা নিয়ে তুমুল সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন সেই সময় কৃষ্ণনগরের অদূরে আনন্দবাগে বনভোজন উপলক্ষে ব্রাহ্ম শিক্ষিত যুবকেরা নিজেরা গরু হত্যা করে তার মাংস খেয়েছিলেন এবং গরুর মাথাটা ইঁট চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই সংবাদ নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল তুমুলভাবে। ব্রাহ্মগণ তা অস্বীকার করে বলেছিলেন, "যুবকদল বাস্তবিক একটি খাসী মারিয়াছিলেন এবং তাহার দেহটি একটি বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন।" ব্রাহ্ম নেতারা আরও বলেছিলেন, "দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গোবৎসের মস্তক কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইয়াছে।" [ঐ, পৃ. ১৩৬]

ব্রাহ্ম নেতা রামতনু লাহিড়ীর নবজাত শিশুটি খাট থেকে পড়ে মারা গেলে তাঁর অব্রাহ্ম হিন্দু আত্মীয়রা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন—"তাহাতে আত্মীয় স্বজন বিধাতার অভি-সম্পাত বলিয়া তাঁহার বালিকা পত্নীকে অস্থির করিয়া তুলেন।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৭]

ব্রাহ্মরা শুধু গোমাংসাশীই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী এবং দীক্ষা নেবার সময় উপবীত বা পৈতা ত্যাগ করতেন বিশেষভাবে—"ব্রাহ্মগণ সমাজবদ্ধ হইয়া যথারীতি দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজত্যাগ, দলাদলি আরম্ভ হইল, দেশে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ যুবা উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন।"

কোন হিন্দু অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাঁর পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন—"তাঁহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকান্ত ও তদনুজ শীতলাকান্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই ধনসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র। তাঁহারা যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও বর্জন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন আরও বহু যুবা তাঁহাদিগের পথ লইল, তখন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।" [দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২৯]

কেশবচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন— 'The term Hindu does not include the Brahmo.'—অর্থাৎ ব্রাহ্ম হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কি করে মানা যায় যে হিন্দু ধর্ম আর ব্রাহ্ম ধর্ম একই? গো-খাদক আদিবাসী আর হিন্দু একই? এই চক্রান্ত বৃটিশ চক্রান্তের মতই মারাত্মক।

অধিকাংশ বই পুস্তকই একদলকে সন্তুষ্ট করতে পারে আর এক দলকে পারে না, অস্বাভাবিক নয় এটা। এখন যেসব উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো পড়ে অনেকে চমকে উঠবেন আর একদল আহরণ করবেন ওর ভেতর থেকে অপ্রচারিত মূল্যবান তথ্যসম্ভার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, বহু ইতিহাস প্রণেতা ডঃ মাখনলাল চৌধুরী [এম. এ., এল. এল. বি., পি. আর. এস., ডি. লিট], শ্রী ধনঞ্জয় দাস মজুমদারের 'বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস' [প্রথম খন্ড] বইটির জন্য যে মন্তব্য করেছেন তার মাত্র তিনটি বাক্য তুলে ধরছি—"আমি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেকগুলি নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছি। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। দ্বিতীয় খন্ড পাঠ করিবার বাসনা রহিল।"

১৯৬২-র ২১ শে মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে দুটি বাক্য তুলে দিচ্ছি মাত্র—"লেখক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রাজ্ঞজন। গ্রন্থকার প্রণীত 'বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা।" 'বসুমতী' পত্রিকার দু'টি বাক্য তুলে ধরছি এখানে— "পুস্তকখানি কলেবরে ক্ষুদ্র, কিন্তু সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার মধ্যে অনেক চিন্তার বিষয় আছে, বহু গবেষণার ইঙ্গিত রহিয়াছে।" [২রা ফাল্গুন, ১৩৬৮]

ঐ পুস্তকে শ্রী মজুমদার লিখেছেন, "মূর্তি প্রস্তুত করিয়া পুরোহিত দিয়া যে পূজা করানো হয়, তাহা বেদমতে নাস্তিকতা মাত্র।" [পৃষ্ঠা ২৪]

"ইংরাজের ইতিহাস মতে ২৫০০ বছর পূর্বে ভারতে আগত আর্যগণ উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট শ্বেতকায়; তাঁহারাই হইলেন বেদ প্রণেতা। এই সকল তথ্য যখন ইংরাজগণ লেখেন তখন ভারতে কোন বেদ ছিল না। ম্যাক্সমূলার মস্কো হইতে বহু পরে বেদ উদ্ধার করিয়া দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া ভারতে পাঠান।" [পৃষ্ঠা ৫৫, ৫৬]

''মাত্র বঙ্গদেশে নহে সমগ্র ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একদল শ্বেতকায় উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট ভারতবাসী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা কার্য পরিচালনা করিতেন। জব চার্ণকের পরিকল্পনায় কলিকাতায় বৌবাজার সৃজনের পর বৌবাজারে খালি কুঠি ও গীর্জা গড়িয়া ওঠে। তাঁহার প্রচেষ্টায় 'এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান' নামে জাতির উৎপত্তি হয়।..... এক একজন কুলীন আর্য লোভে একশত পর্যন্ত বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহে অন্নবস্ত্রে ক্লিষ্টা হইয়া বাস করিতে বাধ্য করিতেন। তাহার উপর প্রতি বৎসর বারোমাসে তেরো পার্বণে এই অন্নহীনা ও বস্ত্রশূন্যা স্ত্রীগণের নিকট হইতে কৌলীন্যের মাসুল আদায় করিতেন। যুবতীদের বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পরে সহমরণ ও অনুমরণের নামে এই সকল নারীকে পোড়াইয়া হত্যা করা হইত। প্রথম শ্রেণীর বিবাহিত যুবতী নারীদিগকে কালীবাড়ির ধর্ণা দিয়া, পুত্র সন্তান ও অর্থলাভের ভাঁওতা দিয়া দালালের মারফৎ কলিকাতায় আনয়ন করা হইত। তাহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃটিশ আর্মী, নেভি, কেরাণী, কর্মচারী ও ব্যবসায়ীগণের নিকট বৌবাজারের খালি কুঠিতে ধর্ণা দিয়া বহু অর্থ এবং শ্বেতাঙ্গ সন্তান লাভ করিয়া কেহ কেহ কলিকাতার অভিজাত সমাজ গঠন করিত। অনেকে সন্তান সম্ভবা হইলে দেশে ফিরিয়া গিয়া জমি জায়গা কিনিয়া বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া আভিজাত্য লাভ করিত। ক্রমে ক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রবল হয়।'' [পৃষ্ঠা ৬০, ৬১]

''স্বামীর জন্য মা কালীর নিকট ধর্ণা দিবার নামে বৃদ্ধ কুলীণের তরুণী ভার্যাগণ কলিকাতায় আসিলে বৌবাজারের গীর্জায় আশ্রয় পাইত। ইংল্যাণ্ডের যে সব লোক স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করিতে চাহিতেন তাঁহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান জাতির সৃষ্টি করেন। জব চার্ণক স্বয়ং এইরূপ একজন কুলীণের স্ত্রীকে শ্মশান হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। এই সময়ে বৌবাজারে ফিরিঙ্গি কালী প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান যুগে আরব ও পারস্যের পদস্থ রাজকর্মচারীগণকে যাহারা আপন আপন স্ত্রী বা পুত্রবধূদিগকে 'ডোলা' দিয়া চাকুরী করিতেন, তাহাদের বংশধরগণ অনুরূপভাবে ইংরাজ কর্মচারীদিগকে 'ডোলা' দিয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে শ্বেতাঙ্গ করিয়া সমাজে আভিজাত্যের সৃষ্টি করিতেন। ইংরাজগণ তাহাদিগকে বড় বড় চাকুরীতেই নিযুক্ত করিতেন। তাহাদের অনেকে জমিদারী লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের এই শ্বেতাঙ্গ উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট হিন্দুগণ ইংরাজদিগের কর্মচারীরূপে সর্বভারতে ইংরাজ-দিগকে সাহায্য করেন।" [পৃষ্ঠা ৬১]

''মহাভারতে শান্তিপর্বের ১৮৮ অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত করিলেন যে 'ব্রাহ্মণায়ং সিতবর্ণ ক্ষত্রিয়ণাং তুলোহিত। বৈশ্যানং কীতকো বর্ণঃ শূদ্রানাম সিতস্তথা।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্বেত, ক্ষত্রিয় রক্ত, বৈশ্য পীত এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণের হইবে। ইংল্যাণ্ডের সনদ মতে ভারতে ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপন করা নিষেধ ছিল।......এবং অন্যদিকে ভারতের অভিজাত

কৃষ্ণবর্ণের শিক্ষিত সমাজকে ইংরাজ বণিক, নাবিক, সৈনিক ও অফিসারদিগের সহযোগিতায় ইংরাজ সমর্থক অভিজাত শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় হিন্দু সৃজনের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য পূর্বোক্ত তথ্য অগ্রাহ্য করিয়া ইতিহাস ও পাঠ্যপুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আর্যগণ বিদেশ আগত, উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় কর্মচারীগণের নিয়োগকালে এমনকি নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগকালেও শ্বেতাঙ্গ হিন্দুদিগকে অগ্রাধিকার দিতেন। কলিকাতা স্থাপনের পর জব চার্ণক প্রবর্তিত বৌবাজারের খালি কুঠিতে ইংরাজ সৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ কুলীন ব্রাহ্মণগণকে জমিদারি ও তাঁহাদের সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিসের কমিসারিটের পদগুলি প্রদান করিয়া শ্বেতাঙ্গ হিন্দুর আভিজাত্যের সৃষ্টি করেন।'' [পৃষ্ঠা ৬৪]

গ্রন্থকার প্রকৃত আর্য বা অভিজাত হিন্দুরা শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এ কথাটা অস্বীকার করে তাঁর কথার প্রমাণে তিনি লিখেছেন—''কৃষ্ণবর্ণের অবতার ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের এবং ভারতপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদব্যাস, চাণক্য, কালিদাস প্রভৃতি।''

''ইংরাজগণ তখন শাসক জাতি ছিলেন। ...... এই শাসকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের সুবিধার জন্য তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের বহু তথ্য গোপন, বহু তথ্য বিকৃত এবং বহু মিথ্যা তথ্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া যে মিথ্যা ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।'' [পৃষ্ঠা ৬৬]

''সিপাহী বিদ্রোহের পর মুদ্রিত বাংলার দু-একটি শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে দ্রাবিড় শব্দ প্রক্ষিপ্ত করিলেও তাহার ব্যবহারে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে।'' [পৃষ্ঠা ৬৯]

আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের মতে দ্রাবিড় বলে কোন জাতিই ভারতে ছিলনা। এগুলো পরিকল্পিত জালিয়াতি। গ্রন্থকারও লিখেছেন, ''এবং দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনায় এই সকল জালিয়াতি করা হইয়াছে।'' [পৃষ্ঠা ৭৪]

''এই তথ্যের পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর ইতিহাস উদ্ধারকালে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দ্রাবিড় সভ্যতার তথ্য-ইতিহাস, পাঠ্য পুস্তক এবং অন্যান্য প্রকার প্রচার করিলেও ইহার পূর্ব তথ্যমতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র আর্যত্বের চতুর্বর্ণের চিহ্ন আদমসুমারিতে রহিয়া গিয়াছে। .... নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না।''

''স্যার রাখালদাস ও রাজেন্দ্রলাল বসু এবং স্যার হার্বার্ট রিজলি—এই তিনজনের চক্রান্তেই তামিল জাতিকে দ্রাবিড় প্রস্তুত করা হয়।'' [পৃষ্ঠা ৭৭]

''প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কাহারও কোন উপাধি ছিল না। রামায়ণে রামচন্দ্র, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির কোন উপাধি ছিল না। মহাভারতেও তদ্রুপ যুধিষ্ঠির অর্জুনাদিরও কোন উপাধি নাই।'' [পৃষ্ঠা ৮৯]

"শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করিয়া বাসুদেব ও তৎপুত্র সূর্যদেবকে হত্যা করিয়া তাঁহার বংশধরকে সমূলে নির্মূল করেন।" [পৃষ্ঠা ৯৫]

"অশোক তাঁহার উত্তরাধিকারের জন্য তাঁহার ৯৮ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া রাজপদ অধিকার করেন।....... তিনি এই যুদ্ধে তিন লক্ষ কালিঙ্গকে নিহত ও দেড়লক্ষ কালিঙ্গকে বন্দী করিয়া বর্তমানে রাজস্থানের গঙ্গানগরে নির্বাসিত করেন।" [পৃষ্ঠা ৯৭]

লেখক বুদ্ধিজীবী সমাজকে চমকে দিয়েছেন এক নতুন তথ্য পরিবেশন করে। তা হোল, কপিল মুনি বঙ্গদেশেরই মানুষ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাসও এই বঙ্গদেশেরই মানুষ। বাড়ি ছিল খুলনা। বেদ প্রণেতা কন্বঋষিও বঙ্গের মানুষ—বাড়ি বগুড়া। ঋগ্বেদ প্রণেতা বশিষ্ঠও বঙ্গের মানুষ। বাড়ি বীরভূম। রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকিও বঙ্গের মানুষ—বাড়ি দিনাজপুর। ব্যাকরণ প্রণেতা পাণিনি, আয়ুর্বেদ ও পতঞ্জলি দর্শন প্রণেতা পতঞ্জলির বাড়ি বর্ধমান জেলার মেমারি। [তথ্য ঐ, পৃষ্ঠা ১০১ ও ১০২]

তাহলে একথা মনে আসা অসম্ভব নয় যে, উপরোক্ত শাস্ত্র প্রণেতারা বঙ্গদেশেরই সাধারণ সব মানুষ—তাঁদেরকে সাজানো হয়েছে এবং ওসব সৃষ্টি করা হয়েছে।

"নবদ্বীপ, ভাটপাড়া এবং কোটালিপাড়ার (ফরিদপুর) বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষিত। এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রী চৈতন্য, অদ্বৈত প্রভৃতি ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের আবির্ভাব হইয়াছিল। বুনোবোথা জগদীশ প্রভৃতির পণ্ডিতগণ বঙ্গে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন।" [পৃষ্ঠা ১০৫]

ভরতের নামেই নাকি ভারতবর্ষ হয়েছে। এই ভরত, শকুন্তলা, ঋষি কন্ব সবই বঙ্গদেশের—"ভারতের নামস্রষ্টা ভরতের মাতা শকুন্তলার পিতা ঋষি কন্বের আশ্রম বাহির হইয়াছে। এই স্থানে ঋষি তাঁহার ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডল প্রণয়ন করেন বলিয়া ঋগ্বেদেই লিখিত আছে। ..... সুতরাং এই বেদ প্রণয়ন ও ভারতবর্ষ নামকরণ বাঙালীর অবদান।" [পৃষ্ঠা ১১৪]

"জৈন গ্রন্থমতে জৈন তীর্থংকর মহাবীরের বর্ধমানের লিচ্ছবি রাজবংশে এক ক্ষত্রিয়কূলে অঙ্গরাজ কন্যার গর্ভে জন্ম হয়। এই জন্য তাঁহার নাম বর্ধমান। জৈনগণ এখনও বলেন মহাবীরের জন্মস্থান বর্ধমানে, বৈশালীতে নহে।" [পৃষ্ঠা ১১৪]

"ষড়যন্ত্রকারী, মিথ্যা ইতিহাসের প্রবর্তকগণ এই শিলা ও তাম্রলিপির তথ্যের বিকৃত অর্থ করিয়া বিজয় সেন ও বল্লাল সেন উভয়কেই তাঁহাদের মৃত্যুর পর হিন্দু ধর্মের প্রবর্তকরূপে দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ বঙ্গাধিপতি প্রস্তুত করিয়াছে।" [পৃষ্ঠা ১১৭]

"অষ্ট সাহস্রিক প্রজ্ঞা পারমিতা গন্থখানি ইংল্যাণ্ডে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে কিন্তু মৃত রিজয় সেন, বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেনের বঙ্গেশ্বর রূপে রাজত্বের মিথ্যা কাহিনীকে সত্যরূপে প্রমাণের জন্য বল্লাল সেনের নামে জাল

'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' লিখিয়া এবং কৈবর্ত্তের কদর্থের জন্য আনন্দভট্ট ও গোপালভট্টের নামে দুইখানি জাল বল্লাল চরিত ও হলায়ুধের নামে জাল স্মৃতি, সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রস্তুত করিয়া আজও সেন রাজত্বকালের সংস্কৃতিরূপে চালানো হইতেছে।" [পৃষ্ঠা ১১৮]

তাহলে বোঝা যাচ্ছে ১৮৫৭-র মহাবিপ্লবের পরেই ইতিহাস তৈরির পরিকল্পিত বিভাগের সৃষ্টিপর্ব শুরু হয়।

"ভারতের বৌদ্ধযুগের কাহিনী মিথ্যা।..... উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতের ইতিহাসে এক বৌদ্ধযুগের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক তথ্যের গোপনের কথা না জানিয়াও ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁহার অক্সফোর্ডের ইতিহাসের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "No Buddhist Period ....The phrase Buddhist Period found in many book is false and misleading."

"জৈন ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। এই ধর্ম গৃহীর পক্ষে পালনা করা সম্ভব নয়। এই জন্য জৈন মতাবলম্বী গৃহীগণ গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা করায় [পৃষ্ঠা১২১]।" তাহলে একথাই প্রমাণ হয় যে হিন্দু ধর্মের ভিতর থেকেই জৈন ধর্মটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এও পরিকল্পিত আর এক ষড়যন্ত্র।

"এইরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র মথুরায় প্রাপ্ত একটি মস্তকহীন গ্রীক ভাস্কর্যপূর্ণ গ্রীক প্রতীক প্রস্তরমূর্তিকে কণিষ্ক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ লোকের নিকট হইতে লুণ্ঠনকারী, বিভিন্ন শক দলের সর্দারের মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে কনিষ্কের সামন্তরাজ প্রস্তুত করিয়া কল্পিত ইতিহাস লিখিয়াছেন।" [পৃষ্ঠা ১৩১]

কণিষ্ক

"ধর্মপালের রাজত্বকালে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব ও বিপ্লবাত্মক ধর্ম সংস্কারের পর দেবপালের রাজত্বকালে ৮২০ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব হয়।" [পৃষ্ঠা ১৩২]

পৃথ্বীনারায়ণ "পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রদত্ত সৈন্যগণের প্রথম মহাযুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ইংরাজগণ নেপালের রাজাকে স্বাধীনরাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে গিয়া পূর্বে বর্ণিত পালরাজগণের ৮০০ হস্তলিপির সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া লর্ড কর্জনের দ্বারা তাহা আনয়ন করেন। লর্ড কর্জন এই সব পুস্তকের মধ্যে রামচরিত ও চর্যাসঙ্গীত ব্যতীত সকলই ইংল্যাণ্ডের লাইব্রেরীতে প্রেরণ করেন।" [পৃষ্ঠা ১৩৩] বুঝতে খুব অসুবিধা হবেনা যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে 'স্যার' ও বিশাল বিশাল উপাধি কেন দেওয়া হয়েছিল।

কার্যসিদ্ধির জন্য নিজ পরিবারের মহিলাদের ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে প্রদান করার মত উৎকট, ঘৃণ্য সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন, "..... প্রথমে ইসলাম রাষ্ট্রে আরব ও পারস্যের আমীর অমরাহগনের নিকটে স্ব স্ব স্ত্রী বা পুত্রবধূ 'দোলা' দিয়া হিন্দু সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। পরবর্তী ইংরাজ রাজত্বকালে পূর্ব প্রথামতে ও জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত বউবাজারের খালি কুঠিতে বহু বিবাহের উপেক্ষিতা সধবাগণ গিয়া মা কালীর নিকট ধর্ণা দিয়া ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভের নামে ইংরেজের আর্মি নের্ভি ও কর্মচারীগণের দেহনিম্নে ধর্ণা দিয়া শ্বেতাঙ্গ আর্য কুলীন সমাজ গড়িয়া ইংরাজী শিক্ষার গুণে বড় বড় পদপ্রাপ্তির দ্বারা আভিজাত্য লাভ করিয়াছিলেন।" [পৃষ্ঠা ১৪৪]

"মুসলমান যুগে কুলীন ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক ছিলেন।" [পৃষ্ঠা ১৪৮] গ্রন্থকার সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত করে তার অর্থে লিখেছেন, "অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পঞ্চ 'ম'কারের সাধন করিলে যুগে যুগে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে (ইহাকে কুলীনগণের আচার বলে)।" তিনি পুনরায় সংস্কৃত মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "অর্থাৎ যতক্ষণ মাটিতে গড়াইয়া না পড়িবে ততক্ষণ তান্ত্রিকগণ মদ খাইতে থাকিবে। মাটিতে পড়িয়া গেলে পুনর্বার উঠিয়া যে মদ খাইতে পারে তাহার আর পুনর্জন্ম হইবে না (ইহাই কৌলীন্যের বিনয়)। তাহারা ব্যভিচারে উৎসাহ দান করিয়া জনসাধারণকে তন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ করিতেন।এইজন্য তাঁহাদের 'জ্ঞান সংকলনীতন্ত্রে' লিখিত হইল—মাতৃযোনীং পরিত্যাজ্য। বিহরেৎ সর্বযোনিষু। বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকাইব।। এ কৈবশাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কৃলবধূরিব।।—অর্থাৎ মাতৃযোনী ছাড়া অন্য যে কোন স্ত্রী লোকের সহিত বিহারে দোষ নাই, বেদ ও পুরাণ সামাণ্য গণিকা সদৃশ। কিন্তু তন্ত্রের মুদ্রা কৃলবধূর ন্যায় গুপ্তা।"

আর এক স্থানে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ দিয়েছেন—"অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীক্ষিতের অর্থাৎ শুঁড়ির গৃহে গিয়া বোতলের উপর বোতল মদ্যপান করিয়া বেশ্যাবাড়িতে শয়ন করে, সেই ব্যক্তি কৌলব চক্রবর্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলীন। এই তন্ত্রের কৌলীন্য হইতে বাংলার ব্রাহ্মণগণের কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে।" [পৃষ্ঠা ১৫১]

বিক্রয়ের সামান্য সামগ্রী হিসাবে নারীদের যেভাবে বিক্রি করার প্রথা ছিল তা অত্যন্ত লজ্জাকর। লেখকও লিখেছেন— "শিখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও গজনীতে মাত্র দুই পয়সা মূল্যে হাজার হাজার হিন্দুনারী প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হইত।" [পৃষ্ঠা ১৬৭]

"রমেশ মজুমদার লিখেছেন, এই উপনিষদে আকবরের পর্যন্ত নাম স্থানলাভ করিয়াছে। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হইয়াছে।" [পৃ ১৬৯]

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থের বিরুদ্ধে গ্রন্থকার লিখেছেন, "তাহাতেই তিনি প্রথম বালক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রৌঢ়া মাতুলানীর সহিত প্রেমের কাহিনী লিখিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী যে শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত শাস্ত্রের কাহিনী, তাহার প্রমাণ ও প্রচারের জন্য, তাঁহার দল ইহা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণেই প্রক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ করেন। .....হিন্দু জাতি আজ জগতসমক্ষে হেয় হইতেছে, একমাত্র বেদব্যাসের মিথ্যা জন্মতত্ত্বের কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানীর সহিত মিথ্যা প্রেমের কাহিনীর জন্য।" [পৃষ্ঠা ১৮০]

গ্রন্থকার অচ্ছুত হরিজনদের বঞ্চিত ও উপেক্ষা করার নিয়ম যে ধর্মগ্রন্থে আছে তার উল্লেখে লিখেছেন, "মনু সংহিতার ১০/১২৬ শ্লোকে লিখিত আছে শূদ্রকে সর্বপ্রকার সংস্কার হইতে বঞ্চিত রাখিবে।" "দেবী ভাগবত ১ম স্কন্ধের ৩/২১ মনুর ৪/৯৯ শ্লোকে ও গৌতম সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে শূদ্রকে বেদ শ্রবণ করিতে দিবে না। বিষ্ণু সংহিতার ৭১/৪৮ শ্লোকে ও মনুর ৫/৮০ শ্লোকে লিখিত আছে শূদ্রকে সদুপদেশ (সৎ পরামর্শ) দিবেনা। অত্রি সংহিতার ১৯ ও ১৩৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে, শূদ্রকে ভগবানের আরাধনা করিতে দিবেনা। বৃদ্ধহারিত সংহিতার ২/১৩, গৌতম সংহিতার ১০ম অধ্যায় এবং মনুর ১০/১২৫ শ্লোকে লিখিত আছে শূদ্রকে উত্তম বস্ত্র পরিতে দিবে না। বিষ্ণু সংহিতায় ২৯/৯ ও মনুর ২/৩১ শ্লোকে লিখিত আছে যে শূদ্রের সন্তানদিগের ভাল নাম রাখিতে দিবে না। পাঠকগণ—এইরূপ মনু সংহিতা ও অষ্টাদশ পুরাণের বহির্ভূত জাতি ধ্বংসাত্মক শাস্ত্র কি মানবের পিতা মনু ও বেদব্যাস কিংবা অন্য কোন ঋষি প্রণয়ন করিতে পারেন?"

তাহলে আমাদের বক্তব্য হোল, অচ্ছুত হরিজন দলিতদের প্রতি যদি ধর্মের এই নির্দেশ থাকে তাহলে ভারতীয় মুসলমান ও খৃষ্টান জাতি ঐ পবিত্র ধর্ম থেকে কতটুকু রক্ষা ও শান্তি পাবার আশা করতে পারে?

আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "অত্রি সংহিতা—এই শাস্ত্রের বিধান মতে (১৯) শূদ্র, যপতপ ও হোম পরায়ণ হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবেন। শূদ্রের ভগবদারাধনা এই শাস্ত্রমতে দণ্ডনীয় এবং (৩৮) শ্লোক মতে একটি শূদ্র হত্যা করিলে একটি গর্দভ হত্যার

জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে।" "ব্যাস সংহিতা— এই সংহিতায় কায়স্থ, মালাকার, নাপিত, ছুতার, কুটুম্বি, বরাট, বণিক, চন্ডাল, দাস, শ্বপচ, গোপ প্রভৃতি বাংলার হিন্দু জাতিকেই অস্পৃশ্য অদর্শনীয় বলা হইয়াছে। ইহাদের মুখ দেখিলে সূর্যদর্শন এবং ইহাদের সহিত আলাপ করিলে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। আবার এই সংহিতায়-ই লিখিত আছে (২) ব্রাহ্মণগণ নাপিত দাস ও গোপের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এইরূপ পরস্পর বিরোধী পুরাণ গঞ্জিকাসেবীর লিখিত।" [১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

"আরও বহু স্মৃতি, সংহিতা এবং পুরাণ আছে, যাহা ইংরাজ রাজত্বকালে প্রকাশিত হইয়াছে।" [পৃ. ১৮৪] "শ্রী চৈতন্যদেব দেখিলেন হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেনা। মুসলমানগণও জোরপূর্বক হিন্দুকে মুসলমান করেনা। ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায়, সমাজপতিগণের অত্যাচারে, সমাজচ্যুত, অত্যাচারিত অস্পৃশ্য হইয়া হিন্দুগণ মুসলমান আমীর ওমরাহের সাহায্যপ্রার্থী হইবার জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত।" [পৃ. ১৯১]

শ্রীচৈতন্যের জন্য গ্রন্থকার লিখেছেন "তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি হরিনামকীর্তন ভিন্ন অন্য দেবতার পূজার বিরোধী ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবতান্ত্রিক ধর্মের সৃষ্টি হইল। বহু ব্রাহ্মণ গুরু-গোঁসাই সাজিয়া পূর্বে বর্ণিত বৈষ্ণবতন্ত্রের ব্যভিচারপূর্ণ ধর্মে দীক্ষাদাতা হইল এবং বৈষ্ণবগণকে একটি ভিখারী জাতিতে পরিণত করিল।" [পৃ. ১৯৩]

চৈতন্যদেব বলিলেন,

"হরি হরি বল সদা নাম কর সার
না পূজিও অন্যদেবে না খাইও প্রসাদ কাহার।" [পৃষ্ঠা ১৯২]

"শিখ গুরু নানক এবং শ্রী চৈতন্য—একই ধর্ম, একই বাণী, একই সময়ে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শিখ ধর্মে ব্রাহ্মণাধিপত্য না থাকাতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থানে রহিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্মেও ব্রাহ্মণের স্থান ছিলনা, শ্রী চৈতন্যের নীতিতে সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন।" "ষোড়শ শতাব্দীতে নাগর ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট বৈষ্ণব ও রাধাতন্ত্রে শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের মূল নীতি ব্রাহ্মণগণ বিনাশ করিয়াছেন।" [পৃ. ১৯৪]

"এ দেশের মুসলমান যুগে সাধারণের অর্থে টোল খুলিয়া ব্রাহ্মণগণ মাত্র ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যাদান এবং আহারের ব্যবস্থা করিতেন। অন্য সর্বজাতির লোককে কৃষিজাত দ্রব্য এবং অর্থ দিয়া টোল চালাইতে হইলেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও তথায় পড়িবার অধিকার ছিল না।" [পৃষ্ঠা ১৯৬]

"দেশ তখন কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন, ব্যভিচারী ব্রাহ্মণগণ কদাচারী হইয়াও কৌলিন্যের মদে মত্ত হইয়া জাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণের বিরুদ্ধে ভগবানের

সৃষ্ট অস্পৃশ্য, অদৃশ্য বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিতেন ও হিংসাপূর্বক তাহাদিগকে সমাজবাহ্য করিয়া রাখিতেন। কুকুরকে ঘরে ঢুকিতে দিলেও হিন্দুর মধ্যে বহু জাতির লোককে কেহ চত্বরেও ঢুকিতে দিতেন না।" [পৃ. ১৯৭]

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে লিখেছিলেন যে—"হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মাচার অন্যান্য পৌত্তলিকগণের ধর্মাচারের সঙ্গে তুলনায় ইহা সমাজ বন্ধনের পক্ষে আরো বেশী হানিকর। হিন্দু পৌত্তলিকতার সেইসব অস্বস্তিকর—শুধু অস্বস্তিকর নয় ক্ষতিকর, আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আর দেশবাসী হিসাবে তাহাদের জন্য আমাকে বাধ্য করেছে তাহাদের এই ভুলের স্বপ্ন থেকে তাহাদিগকে জাগাইবার জন্য সবরকমের চেষ্টায় তৎপর হইতে।" [পৃ. ১৯৯]

"লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। তখন সনাতনী ব্রাহ্মণগণ সকলে সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন। তথাপি তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে [সতীদাহ প্রচলনের জন্য] আপীল করিয়াছিলেন"। [দ্রষ্টব্য ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০০]

তাহলে আমরা বৃটিশের ষড়যন্ত্রের খতিয়ানে নজর রেখে বেশ বুঝতে পারছি যে, ১৮৫৭-তে বিপ্লবীদের হাতে মার খেয়ে তারা তাদের সীমিত ষড়যন্ত্রকে সীমাতিরিক্ত করতে শুরু করেছিল।

"**সিপাহী বিদ্রোহের পর ইতিহাসে জালিয়াতির পরিচয় ঃ** বাংলার ক্ষত্রিয় বা সামরিক জাতির বিরুদ্ধে জালিয়াতি। Vinscent Smith তাঁহার Oxford History of India গ্রন্থের 733 পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—The Bengal army was almost completely destroyed during the two years of disturbances, about 120000 out of 128000 men having mutinied. Probably most of the mutineers were killed in the battle, executed or done to death in the pestiferous jungles of the Nepal border. অর্থাৎ বেঙ্গল আর্মির একলক্ষ আটাশ হাজার সিপাহীর মধ্যে একলক্ষ কুড়ি হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে বধ করা হয়। যাহারা বিদ্রোহ করে নাই তাহারা হইল বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অসামরিক সৈন্য। ......এই বিদ্রোহের সময়ে কলিকাতার ইংরাজ সৃষ্ট কায়স্থ ব্রাহ্মণ জমিদারগণ এবং বৌবাজারের খালিকুঠিতে সৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ হিন্দু কর্মচারীগণ সমগ্র ভারতের মধ্যে মীরাট লক্ষ্ণৌ ঝান্সী বেরেলী দমদম বারাকপুর এবং বালিগঞ্জে ইংরাজদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। পরে তাহাদের গোয়েন্দাগণ পলাতক সিপাহীগণকে গ্রেফতার করিতে সাহায্য করে। .... এই সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ইংরাজসৃষ্ট রাজা রাধাকান্তদেব ভারতে ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার কায়স্থ জাতির জন্য সামরিক ও অসামরিক সকল চাকুরী

একচেটিয়া করিয়া লইবার জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজ নগেন্দ্রনাথ বসুকে 'প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব' উপাধি দেন এবং তাঁহার অধীনে বহু শাস্ত্রকার নিযুক্ত করেন।''

রাধাকান্তদেবকে কেন যে 'স্যার' ও 'বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল সে কথা এখানে বারবার স্মরণ হয়। আধুনিকবাদীদের মতে, ভারতের প্রচলিত ইতিহাসের সমগ্র চেহারাটা তৈরি করতে বিদেশী শিল্পীরা যোগ দিয়েছে। তারা তৈরি করেছে শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা— আবার তারাই ইচ্ছামত সংশোধনের নাম করে সেগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্জনও ঘটিয়েছে। গ্রন্থকারও লিখেছেন, ''মিথ্যা তাম্রলিপি—ইদিলপুরের মদনপুরে (ফরিদপুর জেলা) প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রলিপি আছে। তাহাতে মিনহাজের ইতিহাসে বর্ণিত বিক্রমপুরের স্বাধীনরাজা দনুজমাধবের নাম লক্ষণ সেনের পুত্র বলিয়া লিখিত ছিল। পরে দনুজমাধবের আদাবাড়ি লিপি বাহির হইতে দেখা যায় যে, দনুজমাদবের প্রকৃত নাম দশরথ দেব দনুজমাধব, তিনি চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় সমতটরাজ জাতবর্মার পুত্র সামলবর্মার বংশধর। তাহারপর এই দুইখানি তাম্রলিপিতে দনুজমাধবের নাম চাঁচিয়া তাহার স্থলে কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের নাম উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। তখনই এই দুইটি তাম্রলিপি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়।'' [পৃ. ২১৮-১৯]

''মাধাইনগরের তাম্রলিপি .... এই তাম্রলিপিতে লিখিত আছে— 'লক্ষণসেন জগন্নাথ ক্ষেত্রের পুরীধামে, বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রের কাশীধামে এবং প্রয়াগ ক্ষেত্রে সমরজয়ের জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।' ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুরীধাম কাশীধাম ও প্রয়াগ ক্ষেত্রের জয়ের কাহিনী সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, অসম্ভব, অবাস্তব ও মিথ্যা।'' [পৃ. ২১৯]

সংস্কৃত মূল গ্রন্থগুলো সৃষ্টি হওয়ার আগেই বাংলা ইংরেজী ও নানা ভাষায় 'অনুবাদ' প্রচারিত হয়েছিল। মূলগুলো ঐ অনুবাদ সৃষ্টির পর রচিত হয়। সেইজন্য বিদেশী লাইব্রেরির মালমশলা আর ভারতীয় মালমশলা মিলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যায় চক্রান্তের চৌর্যবৃত্তি।

''বাংলাদেশে প্রকাশিত মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

'অঙ্গ, বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু-চ
তীর্থ যাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃসংস্কার মর্হতি।'......

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত অধ্যাপক ডি. বুলারের মনু সংহিতায় এই দুইটি শ্লোক নাই। ডাঃ জে. জলির লণ্ডনে প্রকাশিত মানবধর্ম সূত্র বা মনুসংহিতায়ও এই দুইটি শ্লোক নাই। ভারতের মাদ্রাজে প্রকাশিত রাওসাহেব বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক C.S.I মহাশয়ের মনুসংহিতায়ও এই দুইটি শ্লোক নাই।'' [পৃ. ২২০]

''... গীতার শ্লোক হইতেই প্রমাণ করা হইতেছে যে রাধাকান্ত দেববাহাদুরের, এ.টি. দেব ও সুবল মিত্রের অভিধানে কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ যে ধীবর লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'' [পৃ. ২২৮]

''... ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার 'বাংলার ইতিহাসে'র দশম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুগণ ভারতবর্ষের আর্যজাতির বহির্ভূত পৃথক মানব গোষ্ঠী সম্ভূত জাতি'।'' [পৃ. ২৩৩-৩৪]

''কাজেই এই নবাগত ব্রাহ্মণগণ সমাজে বরপণের উদ্ভব করিয়া এক একজনে ১২৫টি পর্যন্ত বিবাহ করিতেন।...এদিকে কুলীনদিগের বহুবিবাহের পত্নীগণ পিতৃগৃহে অন্নবস্ত্রের ও পালপার্বণ উপলক্ষে স্বামীর কৌলীন্যের মাশুল 'তত্ত্ব' দিবার অর্থের অভাবে এবং কুলীন শ্বেতাঙ্গ সন্তান লাভের জন্য শ্বেতাঙ্গের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইত।'' [পৃ. ২৩৪-২৩৫]

কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাগণ ব্যভিচার বলাৎকার বহির্গমন কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া এবং ভ্রূণ নষ্টের অপরাধেও যাতে সেই বংশের কৌলীন্য, গৌরব নষ্ট না হয় সেইজন্য ''আদি বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণগণকে দেবীবর ঘটক ৩৬ মেলে বন্ধন করিয়া তাহারা যাহাতে স্ব শ্রেণীর ব্যভিচারীদিগের সহিত মাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন'' তার ব্যবস্থা করে গেছেন। [পৃ. ২৩৫]

''এই মেলের অর্থ হইল 'দোষনাং মেলকঃ' দেবীবর ঘটক এইরূপ দোষে দোষে যাহাতে বিবাহ হয় তাহার জন্য মেলমালাবিধি প্রণয়ন করেন। নিম্নে মেলের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।'' যথা ফুলিয়ামেল, বল্লভীমেল, সর্বানন্দী মেল, পণ্ডিতরত্নী মেল, গোপাল ঘটকী মেল, বিজয় পণ্ডিত মেল, সুরাই মেল, বাঙ্গাল মেল প্রভৃতি মোট ৩৬টি মেলের নাম ও পরিচয় লেখক দিয়েছেন। তারমধ্যে ফুলিয়া মেলের জন্য বলা হয়েছে, ''এই মেলে ধাঁধা, বারুইহাটি ও মুলুকজুড়ি দোষ আছে।'' হাঁসাই থানাদার ''শ্রীনাথ চট্টের [উপাধ্যায়ের] দুই অববিবাহিতা কন্যার সহিত ব্যভিচার করে। সেই কন্যাদের মধ্যে এক কন্যাকে গঙ্গাধর বন্দ [উপাধ্যায়] বিবাহ করে। শ্রীনাথ চট্টের ধাঁধা দোষ ছিল। বারুইহাটি গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যাগণের অবারিত মুসলমান সংশ্রব হেতু ঐ গ্রামে কেহ বিবাহ করিলে বারুইহাটি দোষে পতিত হইত। দেবীবর বারুইহাটির ব্রাহ্মণগণকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন।''

''সর্বানন্দী মেল — রাঘব গাঙ্গুলীর কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় কৈবর্ত্তের দ্বারা দুষ্ট হইয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়; গোবিন্দ বন্দ [উপাধ্যায়] সেই কন্যাকে বিবাহ করে। রাঘব গাঙ্গুলীর সঙ্গে সর্বানন্দের মেল হয়। পণ্ডিতরত্নী মেল—সূর্য ঘোষালের অবিবাহিতা কন্যাগণ নিজ জাতির সংস্রব ও ভ্রূণ হত্যা দোষে দুষ্টা হয়। লক্ষীনাথ গঙ্গ [উপাধ্যায়]

হাড়িনী লইয়া থাকিত। দৈত্যারির সহিত তাহার কুল হয়। চৈত্যারি চট্ট [উপাধ্যায়] বড়ুয়া জাতির স্ত্রীলোক লইয়া দুষ্ট হয়। গোপাল বন্দ [উপাধ্যায়] বেদেনী লইয়া থাকিত। লক্ষীনাথ গঙ্গ [উপাধ্যায়] যে কন্যাকে বিবাহ করে সে অবিবাহিতা অবস্থায় এক নীচ জাতির পুরুষের সহিত দুষ্টা হয়। পণ্ডিতরত্নের পিতামহ ইহাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।" [পৃ. ২৩৬-৩৭]

এইভাবে ব্রাহ্মণ-মুসলমান সংস্রবে সৃষ্টি হয় 'বাঙ্গাল মেল' ও 'সুরাই মেল'। কন্যার অবৈধ বহির্গমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল শুভরাজখানি ও মালাধরখানি মেল। বালাৎকারের কারণে চিহ্নিত করা হোত 'মালাধরখানি', 'নড়িয়া', 'ভৈবর ঘটকী', 'আচার্য শেখরী মেল' প্রভৃতি নামে— এই ভাবে লেখক ৩৬ রকমের মেলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর পুস্তকের ২৩৬, ২৩৭ ও ২৩৮ পৃষ্ঠায়।

গ্রন্থকার বিশদ বিবরণের জন্য লিখেছেন, "এই ৩৬টি মেলের সবগুলিই যে যে দোষে দূষিত তাহা বন্দঘটিবংশীয় দেবীবর ঘটকের 'মেলমেলা বিধি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও নূলোপঞ্চাননের 'মেলরহস্যে' লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেহ ইহার পূর্ণ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুকৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের 'ব্রাহ্মণকাণ্ড' পড়িবেন। রামরতন তর্কালঙ্কারের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি শত শত পুস্তকে এই সকল কুলীনের কুকীর্তির ইতিহাস রহিয়াছে।" [পৃষ্ঠা ২৩৮]

বেশ লম্বা আলোচনায় দেখা গেল কেমন করে বুদ্ধিজীবী তৈরি করা হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতদের দিয়ে অনেক ইংরাজী বই লেখানো হয়েছিল যেগুলো সংস্কৃত, পালি, ব্রাহ্মী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভুতুড়ে ভাষার অনুবাদ বলে চালানো হয়েছে। এমনও ঘটনা আছে যে, ঐ ধরণের বই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি আদৌ। আবার আধুনিক গবেষকদের মতে, অনুবাদ বলে প্রচারিত বইগুলো আগে প্রকাশ করা হয় এবং তার 'মূল' গুলো তৈরি হয় অনেক পরে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে উপযুক্ত বই লিখতে পারলেই পুরস্কার উপাধি আর উন্নতির যেন ছাড়াছড়ি।

পূর্বে উল্লিখিত অঢেল উপাধি পাওয়া পুঁথি লেখক, পণ্ডিত বা তথাকথিত প্রচারিত অধ্যাপকদের ভেতরের অবস্থা ছিল আরও করুণ। "দেড়শ দুশ বছর আগেও অনেকের জীবিকার্জন হত পুঁথি নকল করে। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে, আটচালার নীচে কিংবা গোয়ালঘরের পাশে একটুকরো পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে লিপিকারকে বসতে হত পুঁথি নিয়ে। গৃহস্বামী নিজের মনোমত কোন পুঁথি নকলের ফরমাস করতেন। দাম চুক্তি হবার পর আদর্শ পুঁথি সামনে রেখে লিখতে বসতেন লিপিকার। সেকালে তাঁকেই বলা হত লেখক। কখনও 'রামায়ণ', কখনও 'মহাভারত', কখনও 'হাজার

মছল্লা', কখনও 'দাতাকর্ণ' কিংবা অন্য কিছুর নকল করতেন তাঁরা। সংস্কৃত পুঁথিও যে দুটো চারটে থাকত না তা এমন নয়। তবে কিসের পুঁথি তা নিয়ে লিপিকারেরা মোটেই মাথা ঘামাতেন না।"

ইংরেজ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে করেছিল ভারতের কেন্দ্র। রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল দিল্লি থেকে কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল শাসনের সুবিধার জন্য এবং ঐ শাসনের সুবিধার জন্যই বঙ্গভাষী কয়েক কোটি মানুষকে বোকা বানিয়ে দিল তারা। যেমন, আসামের ভাষা এবং বঙ্গের ভাষা একই। বঙ্গদেশের যেটা লেখার ভাষা বা সাধুভাষা সেটাকেই বানিয়ে দেওয়া হোল গোটা আসামের কথ্য ভাষা। তলিয়ে দেখলেই চিন্তাবিদরা বুঝতে পারবেন—বাংলা ও অসমীয়া ভাষার অক্ষরও প্রায় একই। এই বিভেদের পেছনেও কাজ করেছে এক বিরাট চক্রান্ত।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের রাজত্বকালে চরম চক্রান্তের মধ্যে একটি অন্যতম চক্রান্ত ছিল বঙ্গদেশ থেকে আসামকে পৃথক করে দেওয়া এবং বঙ্গদেশের কিছু অংশকে বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। বৃটিশ জানতো, সারা ভারতের মূল কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গদেশ। সুতরাং বঙ্গদেশের আকৃতি পরিবর্তন করে ছত্রভঙ্গ করার কাজ তাদের করতেই হয়েছে।

আসামের ভাষার হরফ সবই আসলে বাংলা। আমাদের বাংলায় যেমন এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার লোকের বলা-চলার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে, আসামের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। বিলেতের এশিয়াটিক সোসাইটি ও জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির গবেষণা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের পরেই কাজ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। আসামের কবি সাহিত্যিক লেখক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের চমকদার সুযোগের বিনিময়ে তৈরি করা একটি গ্রুপকে কাজে লাগানো হোল বিশেষভাবে। সেই নির্বাচিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নামগুলো দেখলেই বোঝা যাবে আসলে বাঙ্গালীই ছিলেন তাঁরা। নামগুলো হোল লক্ষীকান্ত, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্র কুমার, হিতেশ্বর প্রভৃতি। এঁরাই হচ্ছেন বৃটিশের টোপ গেলা শিকার। 'ইহারাই অতীত ও বর্তমান শতাব্দীর যোগসূত্র।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যাঁরা বৃটিশ পলিসিকে কাজে পরিণত করতে কলম ধরেছিলেন সেই ক্রীত-কলমনবীশদের নাম শ্রী রামদাস, শ্রী বিরিঞ্চিকুমার ও শ্রী মহিবরা—এঁরাই নতুন [?] অসমীয়া ভাষায় ছোটগল্প লিখলেন। উপন্যাসে যাঁরা নতুন ভাষায় [?] পণ্ডিতি দেখাতে এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন দৈবচন্দ্র তালুকদার ও শ্রী দণ্ডীনাথ প্রমুখ। গীতি কবিতা লিখতে যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা হচ্ছেন রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী ও নলিনীবালা দেবী প্রমুখ। তারপর প্রচারের ধাক্কায় দেশের লোক জানতে ও বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে গেল যে, অসমীয়া আর বাংলা ভাষা এক নয়, এই

দুই দেশও এক নয়। তখন অনেকেই এ দৃশ্য দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন, কিন্তু টুঁ শব্দ করার উপায় ছিলনা। নতুন লেখকদের লেখার গতি আরো বেড়ে গেল, আরো নতুন নতুন লেখক যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রী হেমকান্ত, আবদুল মালেক, প্রফুল্ল দত্ত প্রমুখ। বড়কর্তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিরাট চেহারার বই প্রকাশিত হোল। নাম অরুণোদয়। সঙ্গে বৃহৎ এক ইতিহাসও সৃষ্টি হোল—কিন্তু তাকেও প্রাচীন ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হোল। যার নাম 'অসমীয়া বুরুঞ্জি'। অসমীয়া ভাষায় আরো বহু বই রচিত হোল যেগুলোকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অনুবাদ বলে চালানো হোল অবাধে। অথচ সেই সমস্ত মূল সংস্কৃত বইগুলোর তখনো কোন পাত্তাই ছিল না। প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইছি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে—''প্রাচীন আসামী ও বাংলা সাহিত্যের পার্থক্য ছিল উপভাষাগত। এখন আসামী সম্পূর্ণ পৃথক ভাষায় পরিণত হয়েছে।'' স্বীকার করতেই হয় বৃটিশ ব্রেনের বাহাদুরির।

১৫৯৯-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬১৩-তে প্রথম কুঠী স্থাপিত হয় সুরাটে। ১৬৯১-এ হুগলীতে যে কুঠিটি তৈরি হয় ওটাই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম মাইলস্টোন। ১৬৯০-এ কলকাতায় কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগলো। ১৬৯৮-এ মুর্শিদাবাদে নবাবদের পায়ে মাথা ঠুকে জনাব আজিমুশশানকে খুশী করে তাঁর অনুমতি ভিক্ষা নিয়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের ১৬০০০ টাকা দিয়ে কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনটি গ্রাম কিনে নেয় ইংরেজরা। তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে এই অখ্যাত স্থানটুকুই একদিন হবে ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজধানী।

প্রচারের ঠেলায় আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা এটাই শিখেছে যে, বাদশাহ, সম্রাট, সুলতান ও নবাবদের মতই বোধহয় 'রাজা' 'মহারাজা' শব্দগুলো সমার্থক। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রচলিত রাজা মহারাজা পদগুলো বৃটিশের তৈরি করা একটি সহযোগী দালাল শ্রেণী বা কর আদায়কারী নিষ্ঠুর রক্ত শোষক দল মাত্র। বেশিরভাগ জমিদার এতই নিষ্ঠুর ছিলেন যে, প্রজারা কর দিতে না পারলে বা বাকী পড়ে গেলে মোটামুটি আঠারো রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন, 'বেত্রাঘাত, চর্মপাদুকাপ্রহার, বংশ কাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষস্থল দলন, খাপড়া দিয়ে কর্ণ ও নাসিকামর্দন, ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ, পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশ দণ্ড দ্বারা মোড়া দেওয়া, গায়ে জল বিছুটি দেওয়া, হাত পা নিগড়বদ্ধকরা, কান ধরে দৌড়ানো, কাটা দুখানা বাখারি দিয়ে হাত দলন, গ্রীষ্মকালে ঝা ঝা রোদে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের উপর ইঁট চাপিয়ে রাখা, প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা বা গায়ে জল নিক্ষেপ করা, গোণীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা, বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা, চুনের ঘরে বন্ধ রাখা, কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা, গৃহবন্দী করে লঙ্কার ধোঁয়া দেওয়া' প্রভৃতি

অত্যাচার চালিয়ে প্রজাদের রক্ত শোষণ করা টাকায় জমি আর জমিদারি কিনতে ও ভোগ করতে মোটেই বাধেনি এই সমাজনেতা বেশিরভাগ 'রাজা' 'মহারাজা'দের।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর নদীয়া, রাজশাহী ও যশোহরের জমিদারি কেনেন। তাছাড়া আত্মীয় ও চাকরদের নামেও অনেক বেনামী জমি কিনেছিলেন। তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল সে বাজারের আশি লক্ষ টাকা। [তথ্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ. ১৯২]

এমনি জমিদার ছিলেন মতিলাল শীল। প্রথমে ছিলেন খুব গরীব। ইংরেজের সহযোগী হওয়ার ফলে এত জমি ও জমিদারির মালিক হলেন যে তার থেকে বার্ষিক আয় হোত ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

মুর্শিদাবাদের কান্দি ও পাইকপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাধাকান্ত সিংহ ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার একজন কর্মচারি মাত্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দলিলপত্র পাচার করার জন্য বৃটিশ তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে। তাতেই তিনি রাতারাতি ধনী হতে পেরেছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন হেস্টিংসের চক্রান্তের সহায়ক। তাই তাঁরও আখের গুছিয়ে গিয়েছিল ভালভাবে। অনেক জমিদারি কিনেছিলেন, অবশ্য দিনাজপুরের জমিদারি জোর করেই দখল করেছিলেন। সেই জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৪১৩ সিক্কা টাকা। [দ্রষ্টব্য অতুল সুরঃ ৩০০ বছরের কলকাতা]

কান্তমুদি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন মুদির দোকানদার। হেস্টিংস সাহেবের অত্যাচারের সহযোগিতায় তিনি ও তাঁর পুত্র লোকনাথ নন্দী 'রাজা' পদ পেয়েছিলেন। বহু জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন তাঁরা। যার বার্ষিক জমার মোট পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৪২ হাজার ১০৫ সিক্কা টাকা। [অতুল সুর, ঐ]

শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা 'রাজা' নবকৃষ্ণ দেব। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে নিখুঁত ষড়যন্ত্রে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন। তাই ক্লাইভের সহায়তায় পেয়েছিলেন 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি। তিনিও বহু জমিদারির মালিক হতে পেরেছিলেন।

পোস্তার রাজবংশের জমিদারের নাম ছিল নকুধর। পূর্ণ নাম লক্ষীকান্ত ধর। ইংরেজদের যুদ্ধের বিপদে ভারতীয়দের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলেন বলে পেয়েছিলেন 'মহারাজা' উপাধি এবং বহু সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা।

হাওড়ার আন্দুল রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায়। গভর্নর ভান্সীস্টার্ট ও জেনারেল স্মিথের অধীনে চাকর থেকে, তাঁদের অত্যাচারের সহযোগী হয়ে তিনিও তাঁর আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন সর্বতোভাবে।

খিদিরপুর ভূকৈলাশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। তিনিও ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান বা চাকর ছিলেন। শেষে সন্দীপের জমিদারিটি গুছিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

সাহেবদের সেবায় চাকরবৃন্দ

তেলেনীপাড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্যানার্জী পরিবার সাহেবদের শুভদৃষ্টিতে নদীয়া ও বর্ধমানের ১১ টি পরগণা কিনে নিয়েছিলেন। যার বার্ষিক জমার পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৮ সিক্কা টাকা।

কালীশংকর রায় গুণ্ডা বা লাঠিয়াল ছিলেন। সাহেবদের গোলামী করে জমিদারীর মালিক হয়ে নড়াইলের 'রাজা' বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি।

দিনাজপুরের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মানিকচাঁদ ছিলেন মিঃ জন ইলিয়টের চাকর। তাঁর পৌত্র ফুলচাঁদ ইংরেজ সাহেবদের দেওয়ানী পদ পেয়ে কিনে নিয়েছিলেন দিনাজপুরের জমিদারী।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও তাঁর ভাইপো অভয়চরণ দত্ত পরবর্তীকালে মিত্র উপাধি নিয়েছিলেন।

এডওয়ার্ড কোলব্রুক ও হেনরী কোলব্রুকের সহায়তায় তাঁরা প্রচুর সম্পদ সম্পত্তি ও জমিদারির মালিক হন।

রানাঘাটের কৃষ্ণপাল ও শম্ভুপাল ছিলেন পান ব্যবসায়ী। ইংরেজের গোলামী করে বিরাট ধনী হয়েছিলেন তাঁরা।

মুর্শিদাবাদের নিত্যানন্দ রায় ছিলেন একজন অখ্যাত তাঁতী। ইংরেজ কোম্পানির গোলামী করে স্বনামে ও বেনামে বহু জমিদারী ও সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তিনি।

সিঙ্গুরের দ্বারকানাথের বাবা প্রথমে গৃহভৃত্যের কাজ করতেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সাহেবদের সুনজরে পড়ে হয়ে যান বিরাট ধনী।

জমিদার বাবুদের ঘরে বাঈনাচ

বাগবাজারের মুখার্জী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ। মিঃ রুস্ ও হ্যারিসন সাহেবের চাকর হওয়ার সৌভাগ্যে হতে পেরেছিলেন বিরাট ধনী।

হরিঘোষ সাহেবদের অধীনে মুঙ্গের দুর্গের চাকর ছিলেন। তিনি এত বড় ধনী হয়েছিলেন যে 'হরিঘোষের গোয়াল' প্রবাদটি তাঁর নামেই প্রচলিত হয়।

এমনিভাবে ধনী হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবার। শান্তিরাম সিংহ মিডলটন ও স্যার টমাস র‍্যামবোল্ডের চাকর ছিলেন।

সিমলার রামদুলাল দে ধনী হয়েছিলেন ফেয়ারলি ফার্গুসন এণ্ড কোম্পানির চাকর হবার সুবাদে। কুমোরটুলির মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্রও গোলামী করেই ধনী হয়েছিলেন। এইভাবে ধনী হয়েছিলেন জোড়াবাগানের রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুটোলার রামকমল সেন, অভয়চরণ ঘোষ, হাটখোলার রামচন্দ্র দত্ত, জগৎরাম দত্ত, সুন্দর ব্যানার্জী, কুমোরটুলির বনমালী সরকার এবং শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসু। ইংরেজদের চাকর হয়ে তাদের তাবেদার ও শোষণের সহযোগী হয়েছিলেন বলেই নামজাদা ধনী হওয়া সম্ভব হয়েছিল তাঁদের পক্ষে। এইভাবে হৃদয়রাম ও রঘুনাথ ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, নিমাইচরণ মল্লিক, মনোহর মুখার্জী, বারানসী ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ, মতিলাল, মদনমোহন দত্ত, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, গঙ্গানারায়ণ সরকার, প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতিরা ধনী হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ ও মতিলাল ইংরেজের অধীনে মাসিক মাত্র আট টাকা মাইনেতে চাকরি করতে করতে ইংরেজের করুণায় এত ধনী হয়েছিলেন যে মৃত্যুর পূর্বে দেখা গেল তিনি নগদ ১৫ লাখ টাকা, কয়েকটি বাজার ও বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। [দ্রষ্টব্য ডঃ বিনয় ঘোষ ঃ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৩১-১৩৩]

মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারের সংখ্যা কম ছিল। অন্যভাবে বললে, শোষকরা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। কিন্তু ১৭৭২ থেকে ১৮৭২ এই একশ বছরে জমিদারের সংখ্যা দেড়শো থেকে বেড়ে হয় দেড়লাখ—অর্থাৎ তৈরি হয় দেড়লাখ রক্ত শোষক। ১৮৫৭-র মহাবিপ্লব, ফারাজী বিপ্লব, মহম্মদী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, ফকির বিপ্লব, সাঁওতাল বিপ্লবের মত সমস্ত বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে এই জমিদার শ্রেণীর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। বৃটিশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদের হাতি, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য রাখার অধিকার দেয়। যেগুলোর খরচ বৃটিশকে বহন করতে হোত না অথচ প্রয়োজনে সেগুলো পেতেও কোন বাধা ছিলনা। এই অস্ত্রগুলো ঐ বিপ্লব দমনের কাজেই লাগানো হোত।

প্রজাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স বা কর আদায় করার কথা, নানা নামে নানাভাবে জমিদারেরা তার বহু বহু গুণ বেশি কর আদায় করতো। করগুলোর বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন খাজনা, ভেট, ভাণ্ডারী, নায়েব নজর, খোদনজর, রোশন পেয়াদা, দাখেলা, চাঁদা, আবওয়াব, মাথট, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজো, তীর্থকর, টহুরী, মাগন প্রভৃতি।

সীমাহীন এইসব অত্যাচারের ফলে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এই উক্তিতে তা অনেকটাই অনুমেয় ঃ "কলকাতার মত শহরে পথের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিলে তিলে এরা মৃত্যুবরণ করেছে নিঃশব্দে, মুখ বুজে। কোন অভিযোগ করেনি, প্রতিবাদ করে নি, দোকানপাট লুট করে নি, বাড়ীঘরে হানা দেয়নি এমনকি দরজায় দরজায় চেঁচিয়ে ভিক্ষে

করেনি পর্যন্ত। এ বোধহয় এই ভারতবর্ষের মত দেশেই সম্ভব।" [সুতানুটি সমাচার ঃ ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৯৮-৯৯]

জমিদারবাবুরা হাতিতে চড়ে হাওয়া খেতেন আর শোষণ করা টাকা খরচ করার প্রতিযোগিতায় নামতেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রামরতন মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন ৮ লাখ টাকা। রাজা নবকৃষ্ণ বাবু একটি শ্রাদ্ধে খরচ করেন ৯ লাখ টাকা। রাজা গোপীমোহনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ক্ষুধার্ত মানুষেরা এত ভিড় করেছিলেন যে সেই ভিড়ে বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন এবং চোদ্দজন সেখানেই মারা গিয়েছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করেছিলেন ১৫ লাখ টাকা। গোপীমোহন বাবু তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করেন ৩ লাখ টাকা। নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাবু বাঁদরের বিয়েতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক লাখ টাকা খরচ করেছিলেন সানন্দে।
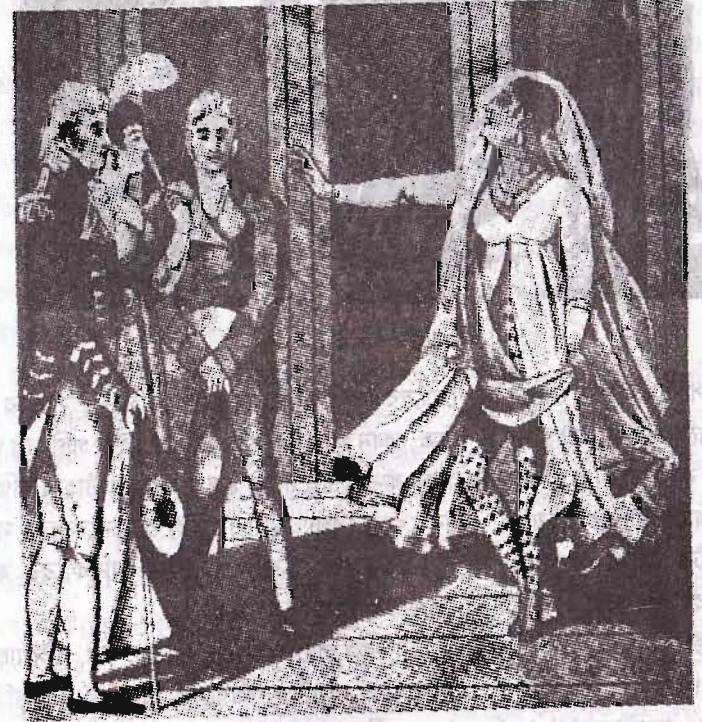
সাহেবদের খুশি করতে জমিদারবাবু আয়োজিত বাঈনাচ

ঐ সমস্ত রাজা মহারাজা বাবু ও জমিদার ধনীরা প্রকাশ্যে বেশ্যাখানা যেতে দ্বিধাবোধ তো করতেনই না, বরং প্রতিযোগিতা করে বাহাদুরি দেখাতেন তাঁরা।

সেই সময় নাচে গানে পটু বেশ্যাদের একটা সম্মানীয় নাম ছিল—বাঈজী। ঐ সুন্দরী বেশ্যা-বাঈজীর মধ্যে যারা ছিল খুব খ্যাতনামা তাদের নাম নিকি, সুপন, বকনাপিয়ারী, হিঙ্গুল প্রভৃতি। ঐ বাবু ও জমিদারেরা এদের ভাড়া করে আনতেন। নাচ, গান, বাজনা আর খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে বাজী পোড়ানো এবং আরও কুৎসিত আমোদ প্রমোদের উৎসব চলতো ঢালাওভাবে। বাড়ির এই উৎসবে ইংরেজ মনিবদের নেমতন্ন করা হোত।

নাচে পটু তখনকার তিন বেশ্যা

এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর বিনয় ঘোষের একটি মন্তব্য বেশ উপভোগ্য—"সন্ধ্যার পর নগরমধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্বযান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে স্থাপিত হইয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। কুত্রাপি গণিকার অধিকারের জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

ডক্টর কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বুলবুল পাখির লড়াই, খেউর গান, বাঈনাচ ও বেশ্যাগমন—এই ছিল নগর কলকাতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়সভা' 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্তদেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়িতে নাচ

গান মদ বাঈজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন কুৎসিত আমোদ প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলতো।" [দ্রষ্টব্য ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৬১]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অতুল সুর তাঁর '৩০০ বছরের কলকাতা, পটভূমি ও ইতিকথা' বইতে 'বাবু'দের জন্য 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন—"এরা বনিয়াদী বড় মানুষ নয়, ঠিকাদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী, পরকীয়া রমণী সংঘটন ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে বড়লোক হয়েছেন।" এরপরেই ডঃ অতুল সুর লিখেছেন, "ভবানীচরণ এদের 'বনিয়াদী বড় মানুষ নয়' বললেও, এরাই কলকাতা শহরের বনিয়াদী পরিবার সমূহের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়।"

এই 'বাবু'রা যেমন করে 'বাবু' হবার পাঠ নিতেন সেকথা ডক্টর সুর তাঁর বইতে লিখেছেন ঃ

"যেহেতু 'নববাবু বিলাস' হচ্ছে সমসাময়িককালের বাবু কালচারের একখানা বিশ্বস্ত দর্পণ, সেজন্য ওতে বাবুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হচ্ছে। বাবুর মোসাহেবরা বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে—'শুন, বাবু টাকা থাকিলেই হয় না। ইহার সকল ধারা আছে। আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি, রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দুনাথ, রাজা লোকনাথ, তনুবাবু, রামহরিবাবু, বেণীমাধববাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিস শিখাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তথাপি ইচ্ছা হয় তুমি যেরূপে উত্তম বাবু হও এমত শিক্ষা দিই।'

প্রথম উপদেশ। যে সকল ভট্টাচার্যরা আসিয়া সর্বদা টাকা দাও, টাকা দাও এই কথা বই আর অন্য কথা বলে না, তাহাদের কথায় কান দিবে না। আমার পিতার শ্রাদ্ধের সময় উহারা যখন কহিল, বাবু শ্রাদ্ধের কি করিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে শ্রাদ্ধের ফল কি? উহারা বলিল, পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। আমি বলিলাম, কোনকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাস জল খাইয়া থাকে। ভট্টাচার্য শেষে কহিল বাবুজী আর কিছু কর না কর, পিণ্ডদানটা করা আবশ্যক। তাহাতে আমি কহিলাম আজ আমি উত্তম বুদ্ধিমতী পরধার্মিকা বকনা পিয়ারীর ['বেশ্যাপ্রধানা'] নিকট যাইব তাহারা যেরূপ পরামর্শ দিবে সেরূপ করিব। বকনা পিয়ারী আমাকে কহিল, 'তুমি এক কর্ম কর—এক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দাও, শ্রাদ্ধ দশপিণ্ড ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যত কর্ম সেই করিবেক। আমিও তাবত কর্ম ফুরাইয়া দিলাম। অতএব নির্বোধ ভট্টাচার্যেরা আগমন করিলে কদাচ আসিতে আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় এরূপ বাক্য বলিবে না, যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয়, তবে কহিবা সময়ানুসারে আসিবে। এইরূপ মাসেক দুই মাস প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিত দিবা।"

দ্বিতীয় উপদেশ। গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে জিউ খুশী থাকিবে এবং যত বারাঙ্গনা আছে তাহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবে, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবে; কারণ, তাহারা পেঁয়াজ, রসুন আহার করে সেইহেতু তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবে এরূপ অন্য কোন রাঁড়েই পাইবে না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিলে পাপ হইবে তাহা কদাচ মনে করিবে না। যাহাদের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ করে। যদি বেশ্যা গমনে পাপ থাকিত, তবে কি উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত? তারপর পয়ার ছন্দে বললেন—'কর গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম পাজি, মন শুচি হলে পাপ নয়। যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে

হয় সুখোদয়। অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি, করি বিধি পরে মিষ্টি, করিলেন সুখের সৃজন। বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন, আর তার শ্রীমুখ চুম্বন। বেশ্যার আলয়ে বসি, এইরূপ দিবানিশি, তুমি বাবু কর আচরণ। ইহাতে অন্যথা কভু, মনে না ভাবিবে বাবু, হইবেক দুঃখ বিমোচন'।"

"তৃতীয় উপদেশ। প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা, নামজাদা বেশ্যা ও বাঈ ইয়ারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র, হার, হীরাকাঙ্গুরীয় ইত্যাদি দিয়া তুষ্ট করিবা। দেখিবে কি মজা হয়।

চতুর্থ উপদেশ। যাহার চারি 'প' পরিপূর্ণ হইবে তিনি হাফ বাবু হইবেন। চারি 'প' হইতেছে পাশা, পায়রা, পরদার ও পোষাক। ইহার সহিত যাহার চারি 'খ' পরিপূর্ণ
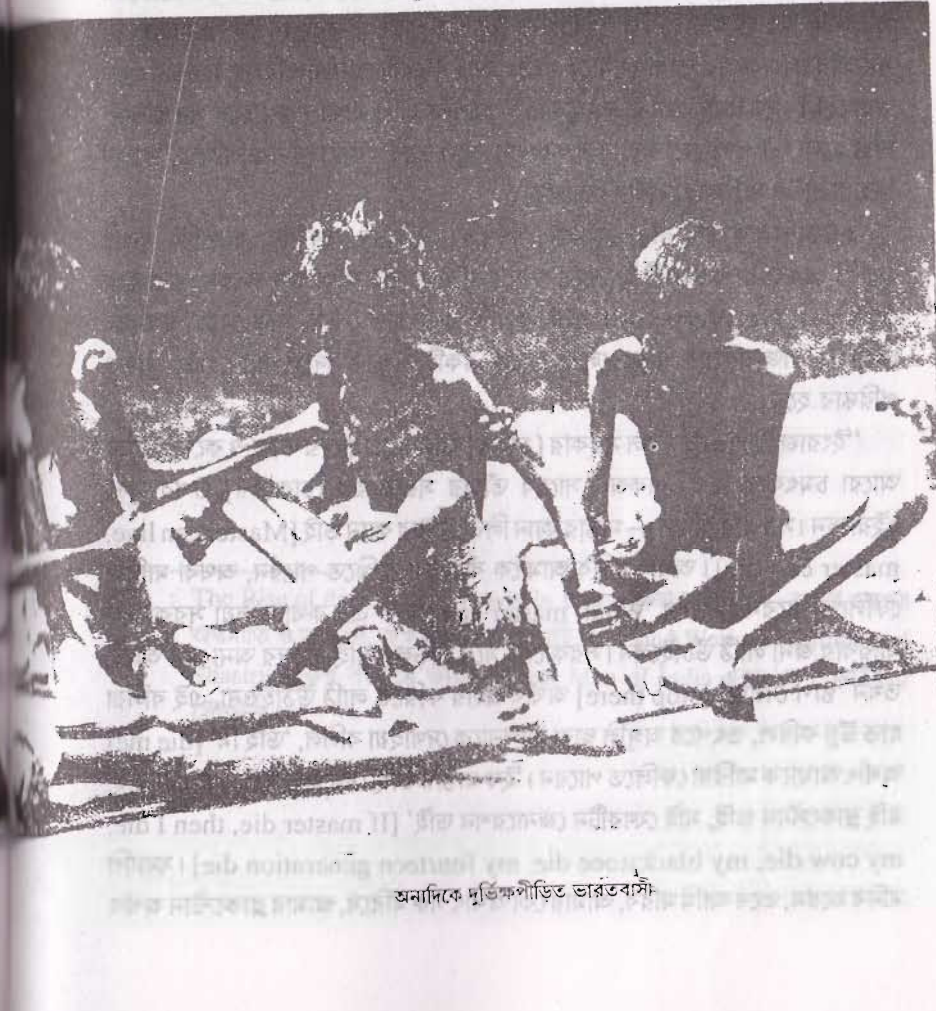
অন্যদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসী

হইবে তিনি পুরা বাবু হইবেন। চারি 'খ' হইতেছে খুশি, খানকী, খানা, খয়রাত।'' [পৃষ্ঠা ৩৩-৩৫]

মুসলিম সমাজ ইংরেজী শেখেনি, অথবা হরিজন সাঁওতালরাও ইংরেজী শেখেনি— এ দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া একটা নির্লজ্জ বেইমানি। শিক্ষাগ্রহণের পথটাই আসলে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে।

প্রথমেই হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বেছে নিয়ে ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা করা হয় পরিকল্পিতভাবে। ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা যখন এই পরিমাণে পৌঁছালো যে তারা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারবে তখন ব্রিটিশের প্রতিনিধি মিঃ মেকলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে, রাষ্ট্রভাষা বা সরকারি কাজকর্মের ভাষা ফার্সীকে রহিত করে ইংরেজী ভাষাকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হোল। মুসলমান জাতি এক মুহূর্তেই 'অশিক্ষিত' ও অপাংক্তেয় হয়ে পদ ছাড়তে বাধ্য হলো। ঐ পদগুলো অলংকৃত করলেন নতুন 'বাবু' সমাজের নব্যশিক্ষিত, 'রাজা' 'মহারাজা' ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা।

প্রথমে কলকাতার বাবু, দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, সরকার, খাজাঞ্চি, মুনশী প্রভৃতি চাকরেরা কয়েকটি ইংরেজী শব্দকে পুঁজি করেই কাজ শুরু করেন। সেগুলো হোল Yes, No, Very Well প্রভৃতি। বাকী কাজ হাত নেড়ে, ঘাড় নেড়ে, ইশারায় চলতো। রাজনারায়ণ বসুর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে ব্যাপরাটা আরও পরিষ্কার হবে।

'ইংরাজ দিগের যে সকল সরকার [চাকর] থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের [চাকরের] উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল— মাষ্টার ক্যান লিভ, মাষ্টার ক্যান ডাই [Master can live, master can die]। অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব 'What, master can die?' এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঁচাইলেন। সরকারের মনে পড়িল, 'ডাই' শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন 'ষ্টাপ দেয়ার' [stop there] অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইওনা, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, 'ডাই মি' [die me] অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। 'ইফ মাষ্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাকস্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেশন ডাই' [If master die, then I die, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die]। যদ্যাপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাকস্টোন অর্থাৎ

বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটিন জেনারেশন অর্থাৎ চৌদ্দ পুরুষ মরিবে।'' [দ্রষ্টব্য রাজনারায়ণ বসুর লেখা 'সেকাল আর একাল', পৃ. ২৬-২৭]

ডক্টর কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''এই অবস্থায় দেশীয় বণিক-জমিদারদের মনে ইংরেজি শিক্ষার জন্য গভীর আগ্রহ দেখা দেয়; কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বণিকদের ভাষা কিছু কালের মধ্যে রাজভাষা হবে। সুতরাং রাজানুগ্রহ লাভের আশায় রাজভাষা শিক্ষার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় পরশ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে আকর্ষণীয় আয় ও জাঁকজমকপূর্ণ পদমর্যাদা লাভের প্রশস্ত রাজপথ হল ইংরেজিভাষা শিক্ষা। এই ভাষার শিক্ষা-গ্রহণকে তাঁরা সর্বরোগহর দাওয়াই বলে মনে করেছেন।'' [ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২]

ছবি : The Rise of the Christan Power in India, রাজা রামমোহন : বাংলা দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, Life and Works of Haraprasad Shastri, মুক্তির সংগ্রামে ভারত, Great Men of India এবং 'দেশ' পত্রিকার সৌজন্যে।

ধর্ম, ধর্মালয় ও ধর্মগ্রন্থ

বর্তমান ভারতের মুসলিম সভ্যতা ও মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করে প্রাচীন সনাতন ধর্মে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে ধর্মরাষ্ট্র বা হিন্দুরাষ্ট্র করার পূর্বে ভারতের প্রাচীন অবস্থা এবং সাধু সন্ন্যাসী যোগী ঋষি ও মুনিদের ইতিহাস জানার প্রয়োজন অনস্বীকার্য— অতীতকে জেনেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

সমাজবিরোধী, মানবতাবিরোধী যে সমস্ত কাজ আছে তার মধ্যে নারীধর্ষণ ও ব্যভিচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামধর্মে বলাৎকার বা ধর্ষণকারী বিবাহিত পুরুষের শাস্তি প্রাণদন্ড। ব্যভিচারিণী বিবাহিতা মহিলারও ঐ একই শাস্তি। কোন সভ্যদেশ ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বলাৎকার বা ধর্ষণকে অনুমোদন করে না। বিশেষকরে পুরুষশাসিত সমাজে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুন্নত নারীর উপর এরকম অত্যাচার পাশবিক ও অসহনীয়। আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মের নাম দিয়ে ধর্ষণ, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি যেভাবে চলে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী আলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী 'ধর্মের নামে' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন যার সপ্তম সংস্করণ বের হয়েছে ১৯৯২-এর ডিসেম্বর মাসে। তাতে তিনি ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রী অতুল সুরের বই থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আলোকবাবু লিখেছেন, "ঋক বেদে দেখি জমি তার যমজ ভ্রাতা যমের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করছেন। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে, লোভ নিজ ভগিনী নিবৃত্তিকে, ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে ও কলি নিজ ভগিনী নিরুক্তিকে বিবাহ করেছে। ... মৎস পুরাণ অনুযায়ী শতরূপা ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অযাচারে লিপ্ত হয়। ... যৌনজীবনে দেবতাদের কোনরূপ সংযম ছিল না। আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে কামলালসায় অভিভূত হয়ে যজ্ঞকুন্ডের মধ্যে শুক্রপাত করে। অগ্নি একবার সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামোন্মত্ত হয়েছিল। ঋক্ষ বজাকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই এমন উন্মত্ত হয়েছিল যে ইন্দ্র তার চিকুরে ও সূর্য তার গ্রীবায় রেতঃপাত করে ফেলে। রামায়ণ অনুযায়ী সূর্যের বীর্য তার গ্রীবায় ও ইন্দ্রের বীর্য তার বালে [কেশে] পড়েছিল। সূর্য অযাচারী দেবতা। চন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা। চন্দ্র দক্ষের ৭০০টি মেয়েকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তার কামলালসা পরিতৃপ্ত হয় নি। কামাসক্ত হয়ে এসে দেবগুরু বৃহস্পতি-স্ত্রী তারাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে। দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেও সাধু চরিত্রের দেবতা ছিল না। বৃহস্পতি কামলালসায় অভিভূত হয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জোরপূর্বক তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিল। আবার ঋগ্বেদে দেখি রুদ্রদেব তার নিজ কন্যা ঊষার সঙ্গে অযাচারে লিপ্ত হয়েছিল। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুই

হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠদেবতা, কিন্তু বিষ্ণু পরস্ত্রী বৃন্দা ও তুলসীর সতীত্ব নাশ করেছিল। ..... ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করে এবং শাপ থেকেরক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীর পিতা পুলমলকে হত্যা করে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিল। ইন্দ্র যে কেবল ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেছিল তা নয়, মহাভারত অনুযায়ী ইন্দ্র গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধারণ করে তার স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেছিল। ইন্দ্র এইভাবে মর্তালোকে এসে মানবীদের সঙ্গে মিলিত হত। এইভাবে বালী ও অর্জুনের জন্ম হয়েছিল। ধর্মও মর্তে এসে মানবীদের সঙ্গে মিলিত হত। ধর্মের ঔরসেই কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। অনুরূপভাবে অগ্নির ঔরসে মাহিষ্মতী নগরীর ইক্ষাকু বংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভ হয়। পবনদেব ও হনুমানের পিতা কেশরী রাজের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেছিল। সেই পুত্রই হনুমান। এইসব দেবতাদের নিয়েই আমাদের ধর্ম-কর্ম। ধর্মের নামে এদেরই পূজো করি আমরা। স্বয়ং ধর্মরাজই চরিত্রহীন।"

আবার আলোকবাবু ডক্টর অতুল সুরের উদ্ধৃতি দিয়েই লিখেছেন, "বেদে অযাচারের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রথমেই ঊষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋক বেদের ২০টা সূক্তে ঊষা স্তুত হয়েছে। সে প্রজাপতির কন্যা, কাঞ্চনবর্ণা ও সূর্যদেবের ভগিনী। ঊষা বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখত। ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাপতিও ছিলেন একজন কামুক দেবতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী সংহিতা (৪/২/২২) অনুযায়ী প্রজাপতি নিজ কন্যা ঊষাতে উপগত হয়েছিল। ...... [পৃষ্ঠা ২৩] বলির জন্ম হয় সমলিঙ্গ মিলনে। শিব ও বিষ্ণু দুই দেবতাই পুরুষ। তাদের সমলিঙ্গ মিলনে ষষ্ঠের জন্ম হয়।" [দ্রষ্টব্য ২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা]

এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অপরাধী রামমোহন' থেকে কিছু অংশ আলোকবাবু উদ্ধৃত করেছেন—"রামমোহনের অপরাধ কত; তিনি মাতৃভাষা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করলেন। সেই পাপেই তো মুর্শিদাবাদের কাছে ভাগীরথী গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হয় ও সেই অঞ্চলে মহামারী হয়। এবং যশোরে কলেরা রোগে বহু লোক মারা পড়ে। এই সবই নাকি শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করার প্রত্যক্ষ ফল। ... সাধারণ লোক বুঝতে পারবে না বলেই তো দেবভাষায় লেখা ছিল এতকাল।" "শেষ লাইনটির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ধর্মের চালাকি কোথায়। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ হলে ফাঁস হয়ে যাবে ধর্মগ্রন্থের এই সব ভেতরকার কাহিনী। ধর্ম সম্বন্ধে লোকের ভক্তিও চটে যাবে। তাই চেপে রাখা দরকার শাস্ত্রগ্রন্থীয় এই জাতীয় অনেক কিছু।" [পৃষ্ঠা২৭]

সাঁইবাবার কৌশল ধরে ফেলেন যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার আর তাঁর ফটোর চারিদিকে জ্যোতির রহস্য ফাঁস করেন প্রবীর ঘোষ তাঁর লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে। রজনীশের চরিত্র লেখক প্রবীর ঘোষ লিখতে গিয়ে তাঁকে করেছেন তুলোধোনা।

"প্রথমে আসা যাক পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দিরে। এই মন্দিরে জগন্নাথদেব অধিষ্ঠিত। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। এই মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে ৬৪ রকমের যৌন মিলন ভঙ্গীর ভাস্কর্য আছে। আছে জয় বিজয় তোরণে জগন্নাথদেবের নানা ধরণের যৌনভঙ্গীর চিত্র।"

"মন্দিরের সেবায় রয়েছে ১২০ জন দেবদাসী। এদের কাজ জগন্নাথের মূর্তির সামনে নৃত্য করা। সেই নৃত্য শুরু হয় রাত্রে। প্রতিদিন রাত ১০টার পর মন্দিরের রুদ্ধকক্ষে জগন্নাথের নিষ্প্রাণ মূর্তির সামনে চলে ভজনের নৃত্য। প্রতিরাত্রেই নাচে এক একটি নতুন মেয়ে। মাঝে মাঝে বাজনা বাজায় পুরোহিত। শুধু পুরোহিত ছাড়া অন্য কারোর থাকার অধিকার নেই এই ঘরে। একরাত্রে একজনই শুধু নাচে। একসময়ে এই নৃত্য চরমে উঠলে দেহের সমস্ত আচ্ছাদন খুলে ফেলে সেই মেয়েটি। নাচতে থাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। তারপর? তারপরের ঘটনা রীতিমত রোমহর্ষক, সেই বিবস্ত্রা মেয়েটি নিজেকে সঁপে দেয় জগন্নাথের মূর্তির কাছে। উত্তাল নৃত্যের সঙ্গে উৎকট উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে—হে প্রভু, তুমি আমার সব। তুমি ইহকাল, তুমিই পরকাল। আমি তোমার স্ত্রী। আমার এ দেহমন সবই তোমার। আমি আর পারছিনা। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তারপর যা ঘটার তাই ঘটে। কে এই বিবসনা যুবতীকে গ্রহণ করে? জগন্নাথের প্রাণহীন মূর্তি না জীবন্ত পুরোহিত? এইসব মেয়েদের শেষজীবন বড় করুণ। যৌবন ফুরিয়ে গেলে এদের আর কোন কদর থাকে না। ওইসব চরিত্রহীন পুরোহিতদের কাছে তাই এরা বারাঙ্গনাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয় শেষ বয়সে। আর এই সব দুশ্চরিত্র দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যই মনে হয় মন্দিরের গায়ে অতসব যৌন মিলনের ভাস্কর্য রয়েছে।"

আলোকবাবুও লিখেছেন, "মন্দির আমাদের কাছে পবিত্রস্থান। কিন্তু নানারকম অপবিত্র কাজই সংঘটিত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। কালীঘাটের কালীমন্দিরের পাশেই পতিতালয়। ... তারাপীঠের মন্দিরের চারপাশের হোটেলগুলোতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভক্তের চেয়ে ভন্ডের সংখ্যাই বেশী। যৌন সঙ্গমের জন্যে প্রচুর নরনারীর ভিড় সেখানে।" [ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৮]

তারকেশ্বরের মন্দিরে "দেখা থাক এত ভিড় হয় কেন সেখানে। এই মন্দিরের চারপাশেও ঘরভাড়া দেওয়া হয় সম্ভোগের জন্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পান্ডারাই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয়।" [ঐ, পৃ. ৪৮]

"এটি কেরালার চেঙ্গানন্দের কালীমন্দির। ধূর্ত পুরোহিত এমন নোংরা কাজ করেছিল যা কল্পনাও করা যায় না। ... হঠাৎ একদিন সেই পুরোহিত ঘোষণা করে কালীমন্দিরে মা কালীর প্রতিমাসে মাসিক রক্তস্রাব হচ্ছে। আর সেই রক্তে ভেজা ন্যাকড়া

সব রোগ সারিয়ে দেয়। সে কি ভীড় মন্দিরে; অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে সেই ন্যাকড়া বিতরণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ঐ শয়তান পুরোহিত। আসলে সে তার স্ত্রী ও মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত ন্যাকড়া খন্ড খন্ড করে অন্ধ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করত।" [ঐ, পৃ. ৫০]

"বিশ্ববিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের কথা কে না জানে। ঐতিহাসিক এই মন্দিরে ছিল কুবেরের ঐশ্বর্য। একদা সেই বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন গজনীর সুলতান মামুদ। লুণ্ঠন ছাড়া তিনি আর এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন এখানে। তাই সঙ্গে এনেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ধাতুবিদ আর বিজ্ঞানীদের। ... সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। শূন্যে ভেসে থাকত সোমনাথ দেবের মূর্তি। ... পরীক্ষা করে দেখা যায় শূন্যে ঝুলন্ত দেবমূর্তিটি লোহার তৈরী। বিশেষজ্ঞদের অভিমত—মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশে চুম্বক পাথর বসানো আছে। আর সেগুলো এমন ভাবে বসানো যে লোহার মূর্তিটি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছেড়ে দিলে চারদিকে চুম্বক আকর্ষণে সেটা ঝুলে থাকতে বাধ্য। প্রমাণ পাওয়া গেল মন্দিরের দেওয়ালের পাথর খোলবার পর। সত্যিই দেখা গেল চুম্বক রয়েছে ভেতরে। আর চুম্বকে হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে ভাসমান মূর্তিটি পড়ে গেল মাটিতে।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৫১]

"বিপুল ঐশ্বর্যের ভান্ডার তিরুপতি মন্দিরের বর্তমান রোজগার সোমনাথ মন্দিরের অতীতের উপার্জনকেও ছাড়িয়ে গেছে। ... শোনা যায় মন্দিরের মাসিক আয় তিনকোটি টাকার উপর। অর্থাৎ রোজ ১০ লাখ টাকারও বেশী। বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীদের সতীত্ব নষ্ট করার ব্যাপারে এদের জুড়ি মেলা ভার। কিভাবে এই সব লম্পট চরিত্রহীন পুরোহিতরা ধর্মবিশ্বাসী সরল নারীদের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় সেই কাহিনী আলোকবাবু লিখেছেন ডক্টর অতুল সুরের উদ্ধৃতি দিয়ে, "অনেক সময় ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিবাহিত নারীদের প্রলুব্ধ করত, তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত। দেবতার আশ্চর্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যতা দূর করবার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্ণাটক দেশের তিরুপতি মন্দির বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার দেবতা ভেন-কাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায়। পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রিযাপন করে। পুরোহিতগণ তাদের বলে যে তাদের ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাত্রে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। তারপর যা ঘটত তা না বলাই ভাল। পাঠক তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। পরদিন প্রভাতে এই সকল জঘন্য চরিত্রের ভন্ড তপস্বীরা কিছুই জানেনা এরূপ ভান করে ঐ সকল স্ত্রীলোকের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ করেছে বলে তাদের পুণ্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ হতে দান গ্রহণ করত। দেবতার সঙ্গে তাদের যৌনমিলন ঘটছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এই সকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে

ফিরে যেত।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৫২] "মোদ্দাকথা, ব্যাপারটা আসলে ধর্মের নামে লোক ঠকানোর ব্যবসা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ২২০০ বছর আগে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সরল বিশ্বাসী মানুষদের স্রেফ প্রতারণা করা হত। যেমন 'কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদ পূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন, এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া এবং এই উপলক্ষে উৎসাবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অর্জন করিবেন।' [কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০ তম প্রকরণ] ঐ গ্রন্থেরই ৯০তম প্রকরণে একথাও আছে, "দেবতাধ্যক্ষ (অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত স্থানীয় ব্যক্তি) ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে" [ঐ, পৃঃ ৫৯]। 'ধর্ম ও কুসংস্কার' পুস্তকে সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হতে লেখক লিখেছেন, "বন্ধ্যা রমণী দেবতার কাছে মানত করতেন তাঁর সন্তানাদি হলে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথমটিকে দান করবেন। এভাবে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া হত।"

পাঞ্জাবে কোন কোন জায়গায় কন্যাকে হত্যা করা হত এবং বলা হত 'তুমি যাও তোমার ভাইদের পাঠিয়ে দিও'। দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতির লোকেরা হাম, বসন্ত ইত্যাদি নিবারণের জন্য প্রথম সন্তানটিকে দেবীর কাছে বলি দিত। [ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩]

"উপনিষদে আছে কয়েকজন মুনি কোন এক ঋষির অপরূপ সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। ঐ দুশ্চরিত্র মুনিদের হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষার কোন চেষ্টাই করে না সেই ঋষি। অসহায় মায়ের এই অপমানে পিতাকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখে পিতৃভক্ত পুত্র একেবারে বিস্মিত। ক্ষিপ্তপুত্র পিতার কাছে এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চায়। জবাবে পিতার উক্তি—'নারী হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। তাই কেউ ভোগ করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া উচিত না। তাছাড়া এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছারও কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর কথাও উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদী চরিত্রে যত মহত্ত্বই আরোপ করা হোক না তার পঞ্চস্বামী ভোগ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঠিক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিবস্ত্রা গোপিনী দর্শনও সমর্থনযোগ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের এই বিকৃত রুচি সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি—তা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যত দর্শনই প্রদর্শন করা হোক।" [পৃষ্ঠা ৬৫ হতে ৬৬]

লেখক আলোকবাবু তাঁর পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ডঃ অতুল সুরের বই হতে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন—'তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার সহকারে চক্রপূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্চ 'ম'-কার হচ্ছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। তন্ত্রপূজার এগুলি হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তন্ত্রে শক্তি সাধনা ও কুলপূজার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। কোন

স্ত্রী লোককে শক্তির প্রতীক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে রত থাকাই তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্ত্ব। গুপ্ত সংহিতায় বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি পামর যে ব্যক্তি শক্তি সাধনার সময় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় নিজেকে না নিযুক্ত রাখে। নিরুক্ততন্ত্র এবং অনেক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তি সাধক কুলপূজা হতে কোনরূপ পুণ্যফল পায় না, যদি না সে কোন বিবাহিতা নারীর সহিত যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, কুলপূজার জন্য কোন নারী যদি সাময়িকভাবে স্বামীকে পরিহার করে তবে তার কোন পাপ হয় না। সমাজের দৃষ্টিতে যাকে অযাচার বলা হয় অনেক সময় এটা সেরূপও ধারণ করত। কেননা কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অন্যরমণী যদি না আসে তাহলে নিজের কন্যা বা কনিষ্ঠা বা জেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে কুলপূজা করবে। ["অন্যা যদি ন গচ্ছেতু নিজকন্যা নিজানুজা। অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা তসপত্নীকা। পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা ঘোষিতো মতাঃ। একা চেৎ কুল শাস্ত্রজ্ঞ পূর্জাৰ্হা তত্র ভৈরব।।"]

এবার দেখা যাক সেই তন্ত্রসাধনা বা কুলপুজা কিভাবে হত— রাত্রিকালে সাধক 'আমি শিব' (ধ্যাত্বা শিবোহমতি) এইরূপ ভাবতে ভাবতে নগ্ন অবস্থায় নগ্না রমণী রমণ করত (ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নং রমন ক্লেদযুতোহপি বা) রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকবে। কুলার্ণবতন্ত্র এই সাধন প্রক্রিয়া কি তা আমি আর বাংলায় অনুবাদ করব না। মূল সংস্কৃত শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়ো মর্দনন্তথা।
দর্শনং স্পর্শনং যোনি বিকাশো লিঙ্গ ঘর্ষণম্।।
প্রবেশ স্থাপনং শক্তের্নব পুষ্পা নিপুজনে।"

[পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮]

সংস্কৃতভাষা মোটেই যিনি জানেন না শুধুমাত্র বাংলা জানেন, তিনিও সহজেই এই সংস্কৃত শ্লোকের আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, স্পর্শ, যোনি বিকাশ, লিঙ্গ ঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপন শব্দগুলি হতেই নোংরামির পরিমাপ করতে পারবেন সহজেই।

বারাঙ্গনা, বেশ্যা, পতিতা, দেহোপজীবি প্রভৃতি নামে হতভাগ্য দেহব্যবসায়ীরা সমাজে আজ কলঙ্কিতা। আবার পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ সম্প্রদায় ঐ কলঙ্ক থেকে নিজেদের আড়ালে রাখতে সর্বতোভাবে সক্ষম হয়েছে। অথচ চরিত্রহীন পুরুষদের বীভৎস ক্ষুধা মেটাতেই তাদের অবতারণা। তাই নিষিদ্ধপল্লী বা পতিতালয়ের নারীদের যেখানে পতিতা বলা হয় সেখানে পুরুষদের পতিত বলা হয় না। এটা ঠিক আমাদের প্রসঙ্গ নয়। আমদের প্রসঙ্গ হচ্ছে, ধর্ম কেন্দ্রিক, ধর্মের মোড়কে মোড়া মন্দিরে ও নানা ধর্মস্থানে পুণ্য সঞ্চয়ের নামে যা সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক

আলোচনা। নবপরিকল্পিত স্বর্গরাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে ঐ প্রাচীন সভ্যতা চালু করা সার্বিক উন্নতির অনুকূল হবে না প্রতিকূল তা ভাববার বিষয়।

শ্রীমতী আরতি গঙ্গোপাধ্যায় নামী দামী লেখকদের লেখা ৩৭টি বই থেকে সাহায্য নিয়ে ১৯৮২-র মার্চ মাসে 'প্রসঙ্গ দেবদাসী' নামে একটি পুস্তকে যেসব আলোচনা করেছেন তা আমাদের কারো মতে অত্যন্ত উপাদেয়, সমাজকল্যাণের অমূল্য সম্পদ আবার কারো মতে হয়ত বা তা ধর্মবিরোধিতা ও অশ্লীলতা। তিনি তাঁর পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠায় মন্দিরের দেবদাসী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দেবদাসীদের বেশ্যা বলেই প্রমাণ করেছেন। লিখেছেন, ''দেবদাসী—মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশেষ ধরণের বারবণিতা।'' তিনি আরও লিখেছেন, ''মনোরঞ্জনই ছিলো এই দেবদাসীদের অবশ্য কর্তব্য। এই মনোরঞ্জন রাজার রাজপুরুষদের এবং পুরোহিতদের।''

''এ প্রথা নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারতবর্ষে এই দেবদাসী প্রথা সবচেয়ে ব্যাপক। ভারতীয় নারী সমাজ বহু যুগ ধরে এই প্রথার প্রভাবে অত্যাচারিত। ... ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে দেবদাসী প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়নি।'' [৩ পৃষ্ঠা] ''এদেরই কেউ কেউ মন্দিরে নিয়োজিত হতো দাসীরূপে। এছাড়া কাঞ্চনমূল্যে কিনে বা বলপ্রয়োগে এদের সংগ্রহ করা হতো। অথবা রাজভয়ে গৃহস্থরা মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন করত মন্দিরে।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৮ দ্রষ্টব্য]

''বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীনবৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরবাসীরা যে কার্যতঃ পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্য প্রমাণ আছে।'' [ঐ পৃষ্ঠা ৯] ''দেবতার নামে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে—নারীর অবমাননা।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ১৪]

দেবদাসীদের বেশ্যা না বলে তাদের অন্য নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন ঃ

দত্তা ঃ কোন পুণ্যলোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মন্দিরে কন্যা দান করলে সে হতো 'দত্তা' দেবদাসী।

হৃতা ঃ যে সব মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেওয়া হতো।

বিক্রীতা ঃ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রয় করলে সে বিক্রীতা দেবদাসী রূপে গণ্য হতো।

ভৃত্যা ঃ যে দেবদাসী মন্দিরের কাজে ভৃত্যরূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য স্বেচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হতো সে ভৃত্যা।

ভক্তা ঃ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিনী সন্ন্যাসিনীকে ভক্তা দেবদাসী বলা হতো।

অলংকারা ঃ নৃত্যগীত ও কলাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে নারীকে অলঙ্কৃত করে দেবমন্দিরে অর্পণ করা হতো সে অলঙ্কারা। রাজকন্যারাও এভাবে মন্দিরে অর্পিতা হতেন।

গোপিকা বা রুদ্রগণিকা ঃ এরা নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যগীত করার জন্য মন্দিরের বেতনভোগিনী দেবদাসী সম্প্রদায়রূপে পরিচিতা।'' [আরতি দেবী ঃ ঐ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

দামোদর ভট্টাচার্যের লেখা 'কুট্টনীমতম'-এ নানা বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন যে, ''দেবদাসীরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা পেতেন, তাই তাঁদের আয় ছিল এবং এই জীবিকা ছিল বংশানুক্রমিক বা ক্রমোপগত।''

ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'সময়াকৃত' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন যে, ''দেবদাসী দেবালয়ে তার কর্মের জন্য শস্য প্রাপ্ত হয় মজুরী হিসাবে। মন্দিরগুলিতে একাধিক দেবদাসী ছিল। তারা ক্রমান্বয়ে নৃত্যগীত করতো। মুক্তেশ্বর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে পহ্লব রাজ্ঞী ধর্মমহাদেবী চুয়াল্লিশজন দেবদাসীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষের কাছ থেকে বেতন পেতেন।'' [ক্ষেমেন্দ্রের 'সময়াকৃত', ২৫ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য]

''স্বয়ং চৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরের তৎকালীন দেবদাসীকে অনুগ্রহ করে ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে তার উল্লেখ আছে। অদ্যাবধি দেবদাসী পদ জগন্নাথ মন্দিরে যথেষ্ট সম্মানিত পদ। রথযাত্রা উপলক্ষে দেবদাসীর উপস্থিতি অবশ্য কর্তব্য।... উড়িষ্যা থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের সকল জায়গাতেই এই একই প্রথা অনুসৃত। ... দেবদাসী বৃত্তির অন্য দিকটি অর্থাৎ বারাঙ্গনাবৃত্তি এখন সোজাসুজি মন্দিরের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৩১-৩২]

''তবে একথা ঠিক, অদ্যাবধি উপজাতি সমাজে নারীর মূল্য ও সামাজিক অধিকার অনেক বেশী। কিন্তু পাল, সেন বা তার পরবর্তীযুগে আর্য জীবনযাত্রার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে নারীর মূল্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫]

''মহাভারতের 'যযাতি উপাখ্যানে' আমরা ঋষি গালবের বৃত্তান্ত পাই। রাজা যযাতি ঋষি গালবকে তাঁর প্রার্থিত অর্থ উপার্জনের উপায়স্বরূপ কন্যা মাধবীকে তাঁর হাতে দান করেছিলেন। মাধবী পর্যায়ক্রমে তিনজন রাজা, একজন ঋষির শয্যাভাগিনী হয়ে চারটি পুত্র প্রসব করে গালবের প্রার্থিত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েও এ ঘটনার নৃশংস বর্বরতাকে চাপা দেওয়া যায় না।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭]

''দেবদাসী প্রথার নামে গণিকাবৃত্তি প্রচলন এখন তাই বেশ স্বাভাবিক। মাদ্রাজ শহরের গণিকাপল্লীকে 'দেবপল্লী' বলে অভিহিত করা হয়।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৪১-৪২]

''পুরোহিতদের প্রভাবে এবং কার্যকরী সাহায্যে অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মত দেবদাসী প্রথাও অদ্যাবধি প্রচলিত।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩]

''বর্তমানে দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে বিশেষ একটা ভূখন্ডে। কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়া, অন্ধ্র ও তামিলনাডুতে এই প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ হল, পশ্চিম উপকূলের শহরগুলিতে বারবণিতার চাহিদা।... মহারাষ্ট্রের বিচিত্র জাতিবিন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে কতকগুলি তপশিলী নিম্নজাতির মধ্যে 'মাঙ্গ জাতি', 'মাহার জাতি' ও 'চামার জাতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য এরা নাচ গানে পারদর্শী। বর্তমানে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এই সাংলী জেলাতেই 'মাঙ্গ' জাতির উপাস্য দেবী 'ইয়ালাম্মা'কে কেন্দ্র করে দেবদাসী প্রথা চালু আছে।'' [পৃষ্ঠা ৫৬]

''কর্ণাটকে দেবদাসী কথাটা চালু নয়। ব্যবহারিক সংজ্ঞা হল 'বাসবি', 'কসবি', 'সুলী' ইত্যাদি। 'বাসবী' অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিনী, 'কসবি'—দেহব্যবসায়ী আর 'সুলী' মানে ব্যবসায়ী বেশ্যা। পতিতা পল্লীগুলির বিভিন্ন নাম। গোয়াতে এদের নাম 'ভবানী', পশ্চিম উপকূলে 'কুড়িয়ার', অন্ধ্রে 'ভগমবন্ধাল', তামিলনাডুতে 'তেবরিয়াব' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' ও 'আরাধিনী।' [পৃষ্ঠা ৫৭]

দশম শতাব্দীতে জৈন মন্দিরগুলিতেও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার এটা ছিল সহজ উপায়। ১৩৯০ সাল পর্যন্তও তিরুপতি ও নঞ্জনগুড়ের মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ করা হয়েছে।... কিন্তু আর্য প্রভাবিত দেবদাসী প্রথার সর্বনাশা দিকটাই এখানেও প্রকট—ধর্মীয় আবরণের আড়ালে দেবদাসীদের উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা।'' [পৃষ্ঠা ৫৯]

''পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলেই স্থানীয় মেয়েদের 'উপপত্নী' হিসাবে বাড়ীতে রাখত। এদের সন্তান সন্ততিরা বর্তমানে ভারতীয় জাতিবিন্যাসে একটা বড় অংশ।'' [পৃষ্ঠা ৬০]

''ধনদেবতা কুবেরের নবমন্দিরের এই নতুন দেবদাসীরা মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত।'' [পৃষ্ঠা ৬৩]

''প্রথমত পরিবারের অনেকগুলি মেয়ে থাকলে অন্ততঃ একটিকে দেবতার কাছে দিতে হবে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।... কোন দম্পতি সন্তানহীন হলে মানত করে প্রথম কন্যা সন্তানটিকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা ছিল প্রাচীন নীতি। সাত-আট বছর বয়সের মধ্যেই তাকে উৎসর্গ করতে হত।''[পৃষ্ঠা ৬৬]

''বর্তমানে যে সমস্ত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ইয়েলেম্মা যুগপৎ কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের লোকদেবী। কামাপুরের কমলেশ্বরী, খান্ডবার ভাগ্যমুরলী, মহেগাশীর সান্তাদুর্গা ও অন্যান্য লোকদেবীদের মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা

চালু আছে। এছাড়া হনুমান মন্দির ও জগদগ্নি মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু আছে, যদিও এঁরা লোকদেবী নন। হনুমান তাঁর ব্রতচারী কুমার জীবনের জন্য পূজিত ও প্রশংসিত। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নারীভোগের ব্যবস্থার ব্যাপারটি কৌতূহল উদ্রেক করে।... সৌন্দতী মন্দিরে [হেয়েলেম্মা গুড্ডা] দেবদাসী উৎসর্গ হতো বলে জানা গেছে।... উগার গোলে ইয়েলাম্মা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ হয়।... ধর্মের আবরণ ছাড়াই বর্তমানে এখানে বেশ্যাবৃত্তি চলছে অবাধে।'' [পৃষ্ঠা ৬৮] ''মুগলকোড, মাঙ্গসুলী, কোকটনুর, তেরদাল কুরচি এবং আঠানী শহরের নিকটবর্তী শংকরহাট্টি, থারুর ইত্যাদি গ্রামে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়।... বিজাপুর শহর ও বিজাপুর জেলার সমস্ত তালুকেই দেবদাসী প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত। 'দেবদাসী বলয়' নামে যে অঞ্চলটি কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থল তার প্রধান অংশ এই জেলাতেই বর্তমান। এই শহরগুলিতে পতিতাপল্লী অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শহর ছাড়া নিকটবর্তী গ্রামগুলিতেও দেবদাসী ও অন্য পতিতাদের সমারোহ ব্যাপক।'' [পৃষ্ঠা ৬৯-৭০]

''দেবদাসী উৎসর্গ করা হয় ইয়েলেম্মার মন্দিরেই সবচেয়ে বেশী। তুলসীগোরির হনুমান মন্দিরে, টিকেটায় মন্দিরেও দেবদাসীদের উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া জগদগ্নি মন্দিরে ও পরশুরাম মন্দিরেও দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়।''

''এই সময়কার দৃশ্যটা এই, দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে যাত্রীরা আসছে। মাইল খানেক লম্বা গাড়ীর সারি। সারি সারি নগ্নদেহ নিমপাতার মালাপরা ছোট ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসর্গীত হবার জন্য, শুকনো উপবাসক্ষিন্ন মুখ, স্নানকরানো বলির ছাগশিশুর মতো। একবার দেবদাসী হয়ে গেলে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ।''[ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭২]

''যদিও সাধারণ জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তবুও মুষ্টিমেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ হিন্দুধর্ম রক্ষণের নামে তাঁদের নিজেদের স্বার্থ [vested interest] রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। মন্দিরের অধিকার এবং পবিত্রতা রক্ষার নামে তাঁরা আসলে মন্দিরের সম্পদকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্টই করেছেন।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৩]

''অল্পবয়স্কা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার বিবাহ সরকারী আইনে নিষিদ্ধ হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর ১৮ বছরের মেয়েদের উৎসর্গ করা শুরু হলো।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮]

''ভারতে সর্বত্র পতিতালয় নিষিদ্ধ হয় ১৮৫৫ সালের পার্লামেন্ট আইনে, কিন্তু এই ব্যাপক পতিতাবৃত্তির উপর তা প্রয়োগ করবার কোন উপায় ছিল না। শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এই আইনের ফাঁকটা ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে, ভারতীয় মন্দিরগুলি সম্বন্ধে এই আইন প্রযুক্ত হতে পারছে না। ফলে এই প্রথা ধীরে ধীরে মন্দির কেন্দ্রিক হয়ে

উঠেছে। মাদ্রাজ শহরেই পতিতালয়গুলি প্রকাশ্যে 'দেবীপল্লী' বলে অভিহিত হতে শুরু করেছে।'' [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮]

''ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীদের মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য দন্ডদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা কোন সময় সঠিকভাবে কার্যকরী হয়নি।''

এই আলোচনায় জানা গেল মুনি ঋষিদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে তাঁদের অনুসারীদের চলমান অবস্থা। আগামীকালের রামরাজত্ব প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে যদি সৃষ্টিই হয় তাহলে তা হবে সভ্যতা ও আধুনিক সংস্কৃতির পরিপন্থী।

রাধাকমল. চট্টোপাধ্যায় [এম. এ., পি-এইচ. ডি. আমেরিকা] 'OH' YOU HINDU AWAKE' বইয়ে লিখেছেন [বঙ্গানুবাদ] ঃ ''আমি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও একথা আপনাদিগকে বলিতেছি। কুচক্রীগণ হইতে সাবধান।'' লেখক ব্রাহ্মণ জাতিকে 'ব্রহ্মপুত্র' উল্লেখ করে বেশ বেদনা নিয়ে ভারতের হিন্দুজাতির দুর্নাম ও কলঙ্ক মুছতে যেভাবে কলম ধরেছেন তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছেন, ''মুসলমান রাজত্বকালে ইহারাই বাদশাদ্গিকে সুন্দরী নারী উপহার দিয়ে খোশামোদ করিত, ইংরেজ আমলে ইংরেজদের। অথচ শূদ্র শিবাজী সাম্রাজ্য দখল করিয়া যখন সিংহাসনে বসিয়াছেন এই ব্রাহ্মণগন তখন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে নাই। পরে মন্ত্রীরূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যকে পাঁচভাগ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।'' [পৃ. ৬]

''পুরীর শঙ্করাচার্য নিরঞ্জনদেব তীর্থ বলিয়াছেন ঃ অস্পৃশ্যগণ হিন্দু নহে। অথচ কি আশ্চর্য সংবিধান বলিতেছে অস্পৃশ্যগণ হিন্দু। মনুস্মৃতি [হিন্দুধর্মের মূলশাস্ত্র] অনুযায়ী শূদ্রগণ কাক, ব্যাঙ, পাতিহাঁস, ছোঁচা, কুকুর ও ভবঘুরে পশুদের সামিল ও অক্ষম। শূদ্রদিগের ধনসম্পদ বঞ্চনা করিয়া কাড়িয়া লইবার অধিকার উচ্চবর্ণের মানবের আছে। শূদ্রগণকে সম্পদ সঞ্চয়ের, স্বনির্ভর বা স্বাধীনভাবে চলার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই [পৃ. ৪৪]। এই বিংশ শতাব্দীতে যখন দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বহুদূর অগ্রসর হইতেছে, তখনও ভারতের বহুস্থানে অদ্যাবধি নিম্নবর্গের লোকগণকে জুতা মাথায় তুলিয়া পথ চলিতে বাধ্য করা হয়। হোটেলে, রেস্তোঁরায় এখনও তাহাদের জন্য আলাদা বাসন রাখা হয়। খাওয়ার পর তাহাদের দ্বারা ধোয়াইতে বাধ্য করে [পৃ. ১৫]। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইবে। কোন শূদ্র যদি উচ্চবর্ণের লোকের সমমর্যাদা ধারণ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করিতে হইবে (অপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ৩-১০-২৬ শ্লোক)। আর সে [শূদ্র] যদি বেদমন্ত্র মুখস্থ করিয়া রাখে তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া কর্তন করিতে হইবে।'' [পৃ. ১৭]

''হরিজন নারীগণকে রাজপথে উলঙ্গ অবস্থায় প্যারেড করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ['কারেন্ট' পত্রিকা ৬.৪.৮৩]। তাহার পোশাক উচ্চবর্ণের লোকের গাত্রস্পর্শ করায় একজন নিম্ন লোককে মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ['টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া', ১৮.১১.৮৪]। উচ্চবর্ণের লোকেরা হরিজনদের কূপে মরা জন্তু ও মলমূত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, পুলিশ কোন ব্যবস্থা লয় নাই [টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া, ১৮.১.৮৪]। মন্দিরে পূজা দিতে উদ্যোগী এক হরিজনকে মারিয়া তাহার মুখে বিষ্ঠা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, সোরাব তালুকের ঠাটুর গ্রামে—'ডেকান', ৫.২.৮৮।

এক হরিজন মহিলাকে উদ্ধারকারী নৌকা হইতে জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে—'ব্লীজ', ১৮.৩.৮৪।

ইন্দিরাগান্ধী রাজ্যসভায় ১৮.৮.৭০ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিগত তিন বৎসরে ১১১৭ জন হরিজন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এইভাবে হত হইয়াছে। ইহা মাত্র রিপোর্ট করা সংখ্যা। রিপোর্ট না করা সংখ্যা ইহার দশগুণ। [পৃ. ১৭, ১৮]

এইতো সেদিন পাটনাতে একলক্ষ শূদ্র ব্রহ্মপুত্রগণের অত্যাচার হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিল।'' [পৃ. ১৯]

ভারতের খুব বড় বড় পত্রিকাগুলির পরিচালক ও কর্মীদের সংখ্যা —''দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ ৯৩% কর্মী, 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ৯৭% কর্মী, 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়াতে'তে ৭৩% কর্মী ব্রাহ্মণ সন্তান।'' [পৃ. ২০]

ব্রাহ্মণেরা কিভাবে কি পরিমাণে প্রশাসনের চেয়ারগুলি দখল করেছে—''শতকরা হিসাবে লোকসভার সদস্য ৪৮ ভাগ, রাজ্যসভার সদস্য ৩৬ ভাগ, রাজ্যপাল/ লেঃ গভর্ণর ৫০ ভাগ, ঐ সচিব ৫৪ ভাগ, ইউনিয়ন কেবিনের সচিব ৫৩ ভাগ, মন্ত্রীর মুখ্য সচিব ৫৪ ভাগ, মন্ত্রীর একান্ত সচিব ৭০ ভাগ, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব ৬২ ভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর [উপাচার্য] ৫৬ ভাগ, সুপ্রীম কোর্টের জজ ৫৬ ভাগ, হাইকোর্টের জজ/অঃ জজ ৫০ ভাগ, এম্বাসাডর হাই কমিশনার ৪১ ভাগ, পাবলিক আন্ডারটেকিংয়ের কেন্দ্রীয় ৫৭ ভাগ, রাজ্যের ৮২ ভাগ। সৌজন্যে ঃ Voice of the Week 10/89। ব্যাঙ্ক ৫৭, এয়ারলাইন্স ৬১, আই. এ. এস. অফিসার ৭২, আই. পি. এস. ৬১, রেডিও এবং টিভিতে ৮৩, সি. বি. আই., কাস্টমস্ ও এক্সাইজের ৭২ ভাগ উচ্চ জাতির হিন্দুদের দখলে। ৩.৫% ব্রাহ্মণ ভোগ করে ৬২%, ৫.৫% ক্ষত্রিয় ভোগ করে ১২%, ৬% বৈশ্য ভোগ করে ১৩%, বাকী ৮৫ ভাগ মানুষ ভোগ করে ১৩ ভাগ চাকরি।'' [পৃ. ২১]

ইউরোপ, আমেরিকা ও আরবদেশগুলিতে যাদের চাকরির জন্য পাঠানো হয় তাদের বেতন [ভারতীয় টাকায়] ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশী। ব্রাহ্মণরা সেখানে ৬৭%

চাকরি করে। আইনের ক্ষেত্রে ৫৩%, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে ৫৭% এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ৫১% ব্রাহ্মণরা দখল করে আছে। [পৃ. ২২, ২৩]

রামকলমবাবুকে ছেড়ে দিলেও ভারতের ইতিহাসখ্যাত নেতাদের অনেকে ধর্মগ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'আমার রাম [ঈশ্বর রাম] রামায়ণের রাম নহে।'

'রামায়ণ ও মহাভারত অপর আরব্য উপন্যাস ছাড়া কিছুই নহে।' —জওহরলাল নেহরু।

'রাম কোন দেবতা নহে, একটি বীর পুরুষ বলা চলে।' —রাজা গোপালাচারী

চিতাম্বরনাথ মদালিয়ার বলেন, 'রামায়ণ কোন স্বর্গীয় উপাখ্যান নহে; ইহা একটি সাহিত্য মাত্র।''

প্রসঙ্গান্তরে তিনি লিখেছেন, ''পি.টি. আই. জানাইতেছে, বিগত তিন বৎসরে ভারতে কালীমূর্তির পাদপীঠে ২৫০০ যুবক যুবতীকে বলি দেওয়া হইয়াছে। এ.এফ.পি. জানাইতেছে, প্রতি বৎসর শত শত যুবক, কুমারীদিগকে কালীমূর্তির কাছে বলি দেওয়া হয়। কামাসেবক তাহার নিজের ৮ বৎসরের ছেলেকে দিল্লীতে মা কালীর কাছে দিবাভাগে বলি দিয়াছে [পৃ. ৩২]। দিল্লীর কালীবাড়ির পুরোহিত বলে, 'মা কালীর কাছে সন্তান বলি দিলে অবশ্যই তাহার পুত্র সন্তান হইবে।' মাকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য বয়স্ক লোককেও বলি দেওয়া হয়। বিহারের পুলিশপ্রধান জে. সহায় বলেন, যেখানে গ্রামসুদ্ধ লোক বলির পক্ষে সেখানে আমরা কী করিতে পারি?'' [পৃ. ৩২]

''মহারাষ্ট্রের এক প্রভাবশালী নেতা মানজা গ্রামের ১১টি বালিকাকে বলি দিয়াছিল গুপ্তধন পাওয়ার জন্য, ৪ ব্যক্তির ফাঁসি হইল, কিন্তু আসল আসামী প্রভাবশালী ছিল বলিয়া এড়াইয়া যাইল। কিছুকাল পূর্বে সিদ্ধার্থ ও রবি নামে দুই ব্যক্তি তাহাদের ২১ বৎসরের বোনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে আহুতি দেয়। ইহারা গুপ্তধনের লালসায় এই কাজ করিয়াছিল। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ এই নৃশংস নরবলি হইতে বাতিল। এই কি হিন্দুধর্ম? লজ্জায় আমাদের যে মাথা কাটা যায়! হিন্দুদেরকে ইহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে? ... নিজেকে জানুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ঈশ্বর কে? মস্তকে গঙ্গানদী ও চন্দ্রধারী এবং আপন পুত্রকে হত্যাকারী শিব কি আপনার ঈশ্বর? ...'' [পৃ. ৩২, ৩৩ ও ৩৭]

''এই হিন্দু [হিন্দুত্ব] শব্দটি কোথা হইতে আসিল? হিন্দুর কোন পুণ্য পুঁথিতে এই হিন্দু শব্দটি নাই। হিন্দুদের পুণ্যতম পুঁথি বেদই বল আর ভাগ্বদ্গীতাই বল, কোথাও এই হিন্দু শব্দটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এমন কি রামায়ণ মহাভারতেও নয়। হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থগুলিতে ধর্মের কোন সংজ্ঞা নাই। এ কেমন কথা? কি আশ্চর্য ব্যাপার!!'' [পৃ.৩৯]

''হে হিন্দুগণ, সত্যের অনুসন্ধান কর। সত্যই তোমাকে মুক্তি দিবে।'' [পৃ.৩৯]

''লিঙ্গ ও যোনী হইল স্ত্রী ও পুরুষের রতিক্রিয়ার গোপন অঙ্গ। গোপন অঙ্গ সহ হিন্দুদিগকে সব কিছুরই পূজা করিতে হয়। তাহারা তাহাদের সন্তানের নামও রাখে শিবলিঙ্গ বা রামলিঙ্গ। কর্ণাটক প্রদেশে পুরোহিতগণ পুরুষ ও মহিলা উভয়কে বিবস্ত্র হইয়া উপাসনা করিতে বাধ্য করে। ব্রহ্মপুত্রগণ ধর্মশিক্ষক নহে। ইহারা ভারতের মানুষকে লইয়া খেলা করে, আনন্দলাভ করে।'' [পৃ. ৪১]

''বারাণসীর বহু যোগী উলঙ্গ হইয়া বাস করে। এবং ভিক্ষা করিয়া খায়। তাহারা নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে ও তাহাদের মধ্যে ড্রাগ আসক্তি ঘোরতর।... এটা আরও লজ্জাজনক যে, এই ন্যাংটা সাধুদের ভক্তগণের মধ্যে হাইকোর্টের জজ, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ এমনকি সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন। আরও আশ্চর্যের কথা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত।'' [পৃ. ৪৩]

''হিন্দুধর্মগ্রন্থ নরসিংহ পুরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী চেপ্টা। বরাহ অবতার নাসিকার অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে মাদুরের মত মুড়াইয়াছিলেন। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোলাকার।''

''বিষ্ণুপুরাণ বলে যে, সূর্য পৃথিবী হইতে ৮লক্ষ মাইল এবং চন্দ্র ২২ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নক্ষত্রবিদ্যা প্রমাণ করিয়াছে চাঁদ পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল এবং সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কোথায় ৮ লক্ষ আর কোথায় ৯ কোটি!!'' [তথ্য ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬]

''শাস্ত্রীয় পুস্তক মার্কন্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবীর আয়তন ৪ বৃন্দ অর্থাৎ ৪০০ কোটি বর্গমাইল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে পৃথিবীর আয়তন মাত্র ১৯ কোটি ৭ লক্ষ বর্গমাইল। হায়! কোথায় ৪০০ কোটি আর কোথায় মাত্র ১৯ কোটি!'' [তথ্য ঐ, পৃ. ৪৭]

''বেদ-পুরাণ বলে যে, দৈনিক সূর্যোপসনা করা দরকার এবং রোজ সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকাইয়া থাকিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যাহারা এইরূপ করিয়াছিল তাহাদের চোখ এখন অন্ধ। আর এই জন্যই ভারতে সবচেয়ে বেশি অন্ধ লোক। সূর্য বা সোনী উপাসনায় কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই। বরং বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাইতে মানা করেন। কাহারা সত্য বলিতেছে, ডাক্তারগণ না হিন্দুশাস্ত্র?'' [পৃ. ৪৮]

বইটিতে শ্রী চট্টোপাধ্যায় হিন্দু ধর্মের যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরেছেন তার কিছুমাত্র উল্লেখ করা হোল।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের বইটির 'পরিচিতি' লিখেছেন জি. শ্রীবাস্তব [এম. এ., পি. এইচ. ডি. লন্ডন] মহাশয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০.৫.৯৩ তারিখে লিখিত এই

পরিচিতিতে তিনি লিখেছেন— ''আমার কথা বলিতে গেলে প্রথমে আমি এসব বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু গ্রন্থের শেষে উল্লিখিত ভিডিও টেপ এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস অটুট হইয়াছে। ভারতের শাসকবর্গ শুধু দেশেরই অবিশ্বাস্য ক্ষতিসাধন করেন নাই, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু জাতিরও অকল্পনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। ইহা ক্ষমার অযোগ্য।

... আমাদের ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থসকল আমাদেরকে কী বলে? কতগুলি দেবতা? পুরাণের কাহিনীগুলি কি ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত? মোটেই নয়। এসব কতকগুলি কল্পিত রূপকথা মাত্র। রাম, সীতা, দুর্গা, শিব, পার্বতী, ব্রহ্মা, গণেশ এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহারা কী বলে? ইহাদের গল্পে যে এতো অশ্লীলতা ও ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে যৌন মিলনের কথা সব ফলাও করিয়া লেখা, তাহা কি কেহ দেখিতে পাইতেছে না? এই সমস্ত পুস্তক পরিবারের লোকজনেদের মধ্যে পাঠের সম্পূর্ণ অযোগ্য। লিঙ্গ, যোনী সম্বন্ধে বিদেশী গুণীগণ আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কী উত্তর দিব? আমরা যে খুব গর্ব করি যে, বিভূতি, সূর্যপূজা, মূত্রপান উত্তম। ইহা আমাদের মূঢ়তা ও অজ্ঞানতারই বহিঃপ্রকাশ। ... এক্ষণে ইহা প্রমাণিত যে, ভারতের ৯৫ ভাগ লোককে ৫ ভাগ লোক কিভাবে শাসন করিয়াছে। ... বিশেষ করিয়া বাবরী মসজিদ ধূলিসাৎ হইবার পর আমরা বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছি। ভারত একবার ভাগ হইয়াছে, আবারও ভাগ হইবে বলিয়া আমরা ভীত। ইহার মূলে ব্রহ্মপুত্রগণের এইসব কু-অভিসন্ধি। ভগবান না করুন যদি এই পুনর্বিভাজন ঘটিয়াই যায় তাহা হইলে হিন্দু বলিতে ভারতে শুধু এই ব্রহ্মপুত্রগণই থাকিবে বাকীরা সব বৌদ্ধ, ইসলাম বা খৃষ্টান হইয়া যাইবে। শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দজী কি ইহা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া যান নাই? এই চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি কি ধিক্কৃত হন নাই?''

ভারতের কোটি কোটি মুসলমান সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় থেকেই যায় যে, কী উপায় অবলম্বন করলে তাঁরা নিরাপদে, নিশ্চিন্তভাবে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে পারেন স্বাভাবিক অবস্থায়। ভারতের নব্বই শতাংশের বেশি হরিজন, তপশিলী, অচ্ছুত বা ছোটলোক শ্রেণী এবং অহিন্দু বলে কথিত—তাঁদের যাঁরা কাছে টেনে নিতে পারেননি, হাজার হাজার বছর ধরে যাঁরা তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করতে বা ঠাকুর-দেবতা স্পর্শ করতে দেননি তাঁরা কি করে মুসলমান, শিখ ও খৃষ্টানদের একাত্ম করে নিতে পারেন তা চিন্তার বিষয়। মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের প্রচারিত ইতিহাস সামনে এনে ভাবলে দেখা যায়, আক্রান্ত জাতি যখন তাদের মত ও পথকে মেনে নিয়েছিল, নিশ্চয় তখন বাকি ছিল না কোন দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান। মুসলমান জাতি যদি সীমা অতিক্রম করে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস খতম করে দিয়ে শুধু প্রাণ

আর ধনসম্পদ রক্ষার জন্য 'হিন্দুত্ব'কে মেনে নেয়, 'রামরাজত্ব'কে বরণ করে তাহলে আবার প্রশ্ন এসে যায় যে, হিন্দু ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈদান্তিক ধর্ম—তিনই কি এক না একেই তিন?

১৯৮৮ সালের এপ্রিলের ১৬ তারিখে শ্রী সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বা কথা তুলে দিচ্ছি এখানে।

''যদি বলি—যাহারা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানে তাহারা 'মহামেডান' মুসলমান, যাহারা হজরত ঈসা (আঃ) বা যীশুখৃষ্টকে মানে তাহারা খৃষ্টান, যাহারা বুদ্ধকে মানে তাহারা বৌদ্ধ, অনুরূপভাবেই যাহারা হিন্দুকে মানে তাহারা হিন্দু; প্রশ্ন আসে হিন্দু কে?

যদি বলি—যাহারা রাম রামায়ণকে মানে তাহারাই হিন্দু; প্রশ্ন আসে, যাহারা রাম রামায়ণকে মানে না, রাবণকে মানে, যাহারা বলে—রাম বলে কোন বাস্তব চরিত্রই নাই; রামায়ণ কোন ধর্মগ্রন্থই নয়, উপাখ্যান; শুধুমাত্র প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নির্দোষিতা নিরপরাধিনী পতিব্রতা সীতার বনবাস ও নির্বাসন, শূর্পণখার কাছে বিবাহিত লক্ষণকে অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দান, শূর্পণখার নাক কাটার নির্দেশে শ্রীরাম চরিত্রের পক্ষে অনপনোদীয় কলঙ্ক; তাহারা কি হিন্দু নয়?

যদি বলি যাহারা পুরাণকে মানে তাহারা হিন্দু, প্রশ্ন আসে—যাহারা অষ্টাদশ পুরাণের একটাকেও ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মানে না তাহারা কী?

যদি বলি—যাহারা পৌত্তলিক, যাহারা মূর্তিপূজা করে তাহারাই হিন্দু, প্রশ্ন আসে যাহারা মূর্তিপূজা করে না, পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী তাহারা কি হিন্দু নয়?

অনুরূপভাবেই প্রশ্ন আসে, যদি বলি—যাহারা বেদকে মানে তাহারা হিন্দু, যাহারা বেদবেদান্ত মানে না, তাহারা তবে কি? তাহারা কি অহিন্দু? অবশ্য বেদ যাহারা মানে তাহাদিগকে বৈদিক এবং তাহাদের ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলিয়া পরিচয় দিলে এহেন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। আর যদি বলেন যাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহারাও হিন্দু, যাহারা একেশ্বরবাদী তাহারাও হিন্দু, যাহারা বহু ঈশ্বরবাদী তাহারাও হিন্দু, যাহারা রাম রামায়ণ মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা রাবণের পূজা করে, রাবণকে মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা রামচরিত্র এবং রামায়ণকে ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মচরিত্র বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করেনা তাহারাও হিন্দু; যাহারা বেদ মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা বেদ বেদান্ত মানে না তাহারাও হিন্দু, তবে বলিতে হয় যাহারা যীশুখৃষ্ট এবং বাইবেলকে মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা বুদ্ধকে মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা শঙ্করাচার্যকে মানে তাহারাও হিন্দু, যাহারা গুরুনানক এবং গ্রন্থ সাহিবকে মানে তাহারাও হিন্দু, যাহার অগ্নিপূজা এবং সাপের পূজা করে তাহারাও হিন্দু, যাহারা গরু খায় তাহারাও হিন্দু, যাহারা গো মাংস খায় না, বরং গাভীকে দেবতা মানে

তাহারাও হিন্দু, এমনকি যাহারা কুরআন এবং হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানে তাহারাও হিন্দু। এক কথায় বলিতে হয় বিশ্বের বুকে অহিন্দু কেহ নাই; সমগ্র বিশ্বমানবই হিন্দু। ...

বেদ বেদান্ত—যে কোন ধর্মের মৌলিক পরিচিতি নির্ভর করে তাহার ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মাবতার বা ধর্মপুরুষ ও ধর্মচরিত্রের উপর। হিন্দুধর্মও ইহার ব্যতিক্রম নয়; সকলে স্বীকার করুক আর নাই করুক, একথা সত্য যে, যে সমস্ত গ্রন্থ হিন্দুসমাজে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত—বেদই তন্মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন আসে—বেদ কি সত্যই ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগ্রন্থ? বেদের প্রণেতা কে? বেদের অবতরণকাল কী? বেদের আমন্ত্রণ এবং শিক্ষা কি সকল মানুষের জন্য, সর্বকালের জন্য? বেদ নামক কোন গ্রন্থ যদি কোন কালেই সত্য-সত্যই ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া থাকে তবে আজও যে তাহা অবিকল অবিকৃত, যথাপূর্ব তথাপর একই অবস্থায় রহিয়াছে তাহারই বা প্রমাণ কি? স্বয়ং বেদ এবং বেদের প্রণেতা কি ইহাকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ এবং নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত অবতার কিংবা ধর্মপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন? বলা বাহুল্য, ইতিহাসের অগাধ সমুদ্রমন্থন করিয়াও ইহার কোন নির্দিষ্ট নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না। ...

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—বেদই ধরুন। কবে কোন্ কালে, ইতিহাসের কোন্ যুগে কোন্ সনে বেদের জন্ম, অদ্যাবধি তাহার কোন নিশ্চিত এবং ইতিহাসসম্মত উত্তর পাওয়া যায় নাই। অনেকেই এ বিষয়ে অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান অনুমানই, ইতিহাস নয়। অধিকন্তু এই অনুমানও বিতর্কিত। অনুরূপভাবে বেদের সংখ্যা এবং রচয়িতা সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত।

প্রাচীন বা সনাতনধর্মী বলিয়া পরিচিত হিন্দুরা বলেন—ব্রহ্মাই বেদের প্রণেতা, ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতেই ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ এই চারখানা বেদের জন্ম; আবার তাহাদেরই অভিজ্ঞ পন্ডিতদের অনেকের মতে বেদের কোন নির্দিষ্ট প্রণেতাই নাই, বরং একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা ও যৌথ উদ্যোগে এক একখানা বেদ রচিত হইয়াছে; বেদের প্রারম্ভেই ঐ সমস্ত রচয়িতা ও তাহাদের পঠনভঙ্গী, গায়ত্রী লিখিত রহিয়াছে।

আর্যপন্থী হিন্দুরা বলেন—চারিখানা বেদ চারজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই চারজন কাহারা, কিই-বা তাহাদের পরিচয়, এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ-সিদ্ধ উত্তর নাই।

কেহ কেহ বলেন—পরমেশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন—আগুনের ধোঁয়ার মত ব্রহ্মা হইতেই বেদের জন্ম। কেহ কেহ বলেন—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি হইতেই

বেদের সৃষ্টি। মনুস্মৃতিতে আছে, অগ্নি বায়ু সূর্য হইতেই যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদের জন্ম।

কোন কোন হিন্দু পন্ডিতের মতে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ যথাক্রমে ব্যাস মুনির সময়ে রচিত হয়। অতঃপর বহুদিন গত হইলে সাম আরও কতিপয় মন্ত্র বৃদ্ধি করতঃ সামবেদ রচনা করেন; অথর্ববেদের জন্ম ইহারও অনেকদিন পরে। এই জন্যই মনুস্মৃতিতে অথর্ববেদের উল্লেখমাত্র নাই।

... কি করিলে একজন অহিন্দু হিন্দু হয় এবং কি করিলে একজন হিন্দু অহিন্দু হইয়া যায়, যাহারা ছোঁয়া লাগিলে হিন্দুর জাত যায়, ধর্ম যায় এমনকি উপাসনা মন্দির এবং কূপের জল পর্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায়, সেও হিন্দু, আর যার জাতধর্ম গেল সেও হিন্দু, অনেক চিন্তা করিয়াও এ রহস্যের কূল কিনারা করিতে পারিলাম না।

... হিন্দু বলিয়া কোন ধর্মপুরুষ ছিলেন কিংবা হিন্দু বলিয়া কোন জাতি ছিল এমন কোন প্রমাণ যেমন অতীত ইতিহাসে নাই, তেমনি হিন্দুধর্ম নামে কোন কালে যে কোন ধর্ম ছিল ইতিহাসের অগাধ সমুদ্র মন্থন করিয়াও ইহার ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবেই যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ভবিষ্যপুরাণ, এমনকি মহাভারত আজও যথাপূর্ব তথাপর তাহার আসল রূপে, অবিকৃত কিংবা বিকৃত অবস্থায়ও মূল গ্রন্থটি বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ না থাকিলেও হয়ত-বা এককালে তাহা ছিল, ঈশ্বরপ্রেরিত ছিল, কিংবা সংশ্লিষ্ট মুনি ঋষিদের কেহ কেহ হয়ত বা নবী পয়গম্বর ছিলেন তাহার সম্ভাবনা প্রমাণে বড়জোর এই কথাটা বলা যাইতে পারে যে, তাহার বর্তমান দশা এবং তাহাদের বর্তমান পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তন্মধ্যে, স্বয়ং বেদ পুরাণ এবং মহাভারতেই হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওত এবং শেষ নবী হিসাবে আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আগাম খবর, এবং তাঁহাকে মানিয়া চলিতে স্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত রহিয়াছে।''

নারী সমাজের নেপথ্যে

তথাকথিত আধুনিকবাদীরা মুসলিম নারী সমাজের প্রতি নানাভাবে কটাক্ষ করেন, মুসলমান নারীরা নাকি অনুন্নত, অসভ্য অথবা অসামাজিক আর তার মূলে নাকি আছে তাদের সংকীর্ণতা আর ধর্মের গোঁড়ামি। একথাও বলতে বাধে না যে, মুসলিম পুরুষ সমাজও নারীজাতিকে উন্নত করতে স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর নন। কোন কোন আধুনিক-বাদী মনে করেন মুসলমান নারীদের ভেতর যারা শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হয়েছেন সে অবদান হিন্দু সমাজ বা অমুসলিম সমাজ সংস্কারকদেরই। যাঁরা ইতিহাসের সূক্ষ্ম সংবাদ রাখেন না তাঁরা মনে করতে পারেন হিন্দু সমাজ বরাবরই শিক্ষিত, উন্নত ও প্রগতিবাদী। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ অশিক্ষিত, মৌলবাদী ও সংরক্ষণশীল। আর মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ নাকি তাদের ধর্ম।

হিন্দু সমাজ তাদের নারী সমাজকে মর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে মাত্র কয়েকবছর পূর্বে, ১৮৪০ হতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ঐ সমাজের নারীদেরকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার কথা হাল্কাভাবে বলতে বা লিখতে শুরু করেন যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ। ১৮৫০-এর পর থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত মদনমোহন, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, দ্বারকানাথ প্রমুখ পন্ডিতগণ স্পষ্ট করে বললেন, "মহিলাদের অবস্থা উন্নত না হলে সভ্য জাতি হিসাবে গণ্য হওয়া অসম্ভব।"

আমাদের সমগ্র বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এক ইংরেজ পাদ্রী, যাঁর নাম মিঃ রবার্ট মে। তার পরের বছর তখনকার ভারতের রাজধানী কলকাতার পাদ্রীরা এটার উপর আরও ভাবনাচিন্তা করেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর আরও ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য নিজেদের জন্যই তাঁরা সেগুলো করেছিলেন। তবে সেগুলোতে কিছু বঙ্গীয় বালিকাও লেখাপড়া করত। [M. A. Liard এর Missioneries and Education in Bengal : Oxford University Press London, 1972 এবং 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ৮ই মার্চ, ১৮২৩ দ্রষ্টব্য]

রাধাকান্তদেব ছিলেন তখনকার হিন্দু সমাজের খুব বড় মাপের নেতা। তিনি তাঁর ভাষায় বলেছিলেন, "মিস্ কুকের স্কুলে কন্যাদের পাঠানোকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুই অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করেছিলেন" [Deb to Bethune: J.C.Bagal, P.103]। ফলে ভদ্রলোকদের বাদ দিয়ে ছোটলোকদের [?] ভিতর হতে কিছু দেশীয়

ছাত্রী স্কুলে আসতো। এইসব বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগ্দী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং বেশ্যাকন্যারাই পড়তে যায়। তাও এরা অর্থ পুরস্কারের লোভেই পড়তে যেত [তথ্য ঃ বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ এবং W. Adam-এর Reports on the State of Education; P. 452-53]। তবে ভদ্রলোকেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শাসকদের আদেশ ও ইঙ্গিতে বুঝতে পেরে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে খৃষ্টান মহিলাদের দিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী-কন্যারা এইভাবে ইংরেজী শিখতে পেরেছিলেন। [কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস', পৃষ্ঠা ৩০]

এইভাবে শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা ও রাজা বৈদ্যনাথের ভাইঝি হরসুন্দরী, চন্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী, আশুতোষ দেবের কন্যা প্রভৃতি নামজাদা মহিলাদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়িতেই হয়েছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের তৈরি করা ঐ সব গার্লস স্কুলে হিন্দু মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো তখন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার অনুকূল ছিল না। [দ্রষ্টব্যঃ সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকা ৩১.৫.১৮৪৯ এবং ১৯.৪.১৮৫১]

১৮৪৯ সাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজে মহিলাদের লেখাপড়া শেখার কল্পনা করাও অসাধ্য ব্যাপার ছিল। ১৮৪৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন মেধাবী পন্ডিতকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল যাঁর নাম ছিল মিঃ কিটন। বেথুনের তৈরি স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি অর্থ, শ্রম ও চিন্তাভাবনা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার স্কুলটির দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করে। ঐ ভিক্টোরিয়া স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে বেথুন গার্লস্ স্কুল করা হয় এবং তার পরিচালনায় যে সব বিশিষ্ট লোকদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ দেব ও হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ [সম্বাদ ভাস্কর ৩রা জানুয়ারী, ১৮৫৭]। ইংরেজদের পলিসি অনুযায়ী এই বিদ্যালয় ব্রাহ্মধর্মের ভারতীয় লোক ও বর্ণহিন্দুদের জন্য ছিল নির্ধারিত। বৃটিশের পরিচালনায় এই রকম স্কুলগুলিতে খৃষ্টান ধর্মীয় সাহিত্য এমনভাবে পড়ানো হোত যাতে স্বাভাবিকভাবে ছাত্রীরা হয়ে উঠতো খৃষ্টান মনোভাবাপন্ন।

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্মটির প্রবর্তন করেছিলেন সেটিই ছিল ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা ছিলেন মূর্তি পূজার বিরোধী। সুতরাং দেবদেবী ও মূর্তিপূজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেন না তাঁরা। মদ মাংস এমনকি গো-মাংস পর্যন্ত লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে তাঁদের বাহাদুরী ও বৈশিষ্ট্য মনে করে খেতেন।

অনেকে মনে করেন ইংরেজদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, শোষণ, শাসন ও খৃষ্টধর্মের প্রচার। তাই বৃটিশ হিন্দু সম্প্রদায় হতে একটি বর্ণ হিন্দু বা উচ্চ হিন্দু শ্রেণী তৈরি করে নিয়েছিলো যারা ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে মিলে যাবে, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা

নিজেদেরকে খৃষ্টান বলবে না। সেই জাতিই ছিল ব্রাহ্ম জাতি—যারা ইংরেজদের সহায়তায় উন্নত হবে আর সরকারি মদত পাবে অঢেলভাবে। তাদের উন্নতি দেখে অন্যান্যরা নিজেদের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এগিয়ে যাবে। আবার ওই ব্রাহ্মজাতিকে যে কোন মুহূর্তে খৃষ্টান বলে ঘোষণা করতে কষ্টকরও হবে না। এখনকার ঐতিহাসিক ও লেখকদের অনেকেই ব্রাহ্মতথ্যটি এমন কায়দায় গোপন তথ্য হিসাবে পরিবেশন করেছেন যাতে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা ব্রাহ্মপন্ডিতদের হিন্দু বলেই মনে করতে থাকে। আসল সত্য এটাই যে, হিন্দুদের মধ্য হতে ধর্মান্তরিত হয়ে কেউ যেমন মুসলমান হয়েছেন, কেউ খৃষ্টান হয়েছেন, কেউ জৈন বা কেউ বৌদ্ধ হয়েছেন ঠিক তেমনি হিন্দু ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেই কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্মী বা অহিন্দু হয়েছেন। তবুও ছলে বলে কৌশলে তা চেপে রাখার চেষ্টা আজও অব্যাহত। এ আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে।

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যায়, আমাদের দেশের হিন্দু মহিলারা যখন থেকে কাগজ ও অক্ষরের সাথে পরিচিত হলো সেই সময়কার শিক্ষিতা মহিলাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে, লেখাপড়া জানা মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নিস্তারিনী দেবী, ব্রহ্মময়ী, মনোরমা মজুমদার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাজকুমারী দেবী, অরুদত্ত, তরুদত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, সৌদামিনী দেবী, কুমুদিনী, বামাসুন্দরী, কৈলাসবাসিনী প্রমুখ; এঁরা বেশিরভাগই বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছেন। এঁরা কেউই তখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে ছিলেন না, বরং সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের মহিলা। শুধুমাত্র অরুদত্ত ও তরুদত্ত দুই বোন খৃষ্টান ছিলেন। তাঁদের খৃষ্টান পিতা তাঁদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ইংলন্ড ও ফ্রান্সে।

ঠিক এই সময়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তখন মুসলমান সমাজে বালিকা হতে বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকে কোরআন পড়তে অভ্যস্ত ছিল। তখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সী। এমনকি ইংরেজ আমলের প্রথমদিকেও ফার্সী ভাষা ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা; আর ফার্সী ও আরবীর অক্ষর একই। ফার্সীতে কয়েকটি অক্ষর বেশি আছে মাত্র। মুসলিম মহিলাদের পড়বার লেখবার অধিকার বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীতেই দিয়ে গেছেন হজরত মহম্মদ [স]। তাঁর পরলোকগমনের সাল ছিল ৬৩২ খৃষ্টাব্দ। সেইসময় থেকে কোন সময়েই এই পদ্ধতির ছেদ পড়েনি। অর্থাৎ হজরত মহম্মদ [স] ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে যা চালু করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও আমাদের দেশে অমুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা সম্ভব হয় নি। একটি হিসেবে তা প্রমাণিত হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বঙ্গদেশে বালিকা ও মহিলাদের সংখ্যা যেখানে কয়েককোটি সেখানে স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রী ছিল ২,৪৮৬ জন মাত্র। ১৮৭১ সালে তা উন্নীত হয় ৬,৭১৭ তে।

১৮৮১ তে তা বেড়ে হয় ৪৪,০৯৬। আর ১৮৯০-এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৭৮,৮৬৫ তে, যা সমগ্র বালিকা-সমুদ্রের কণামাত্র [General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-1864, 1871-1872, 1881-1882 and 1890-1891]। লুকিয়ে লাভ নেই, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের গগনচুম্বী যত প্রশংসাই করা হোক ইংলন্ডের ছাত্রীদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। অথচ অপ্রচারিত সত্য এটাই যে, সেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হজরত মহম্মদের [স] সময় কিন্তু প্রায় ৯৫% মুসলিম মহিলা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ কোরআন পড়া শৈশবেই বাধ্যতামূলক ছিল। কোরআন আরবী ভাষায়—আর তাঁদের মাতৃভাষাও আরবী। সুতরাং খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ পেতেন—কেউই প্রায় নিরক্ষর ছিলেন না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পরে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি একটি সাব-কমিটি তৈরি করে অনেক ভেবেচিন্তে মহিলাদের পরীক্ষা দেওয়ানোর পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গবেষণা শুরু হয়। ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৮৭৮ সালে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এখানেও ১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, হিন্দু মহিলারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। [100 Years of the University of Calcutta (Calcutta : University of Calcutta 1957) P. 121-22]

হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা থাকার কারণ অনেকের মতে ধর্ম। কেননা, বৈদিক ধর্মে ব্রহ্মার পুত্র মনু যা বলেছেন, তার সারমর্ম হল ঃ মহিলা জাতি বিশ্বাসঘাতক, যেকোন মুহূর্তে তাদের মতি গতি বদলে যেতে পারে, সুতরাং তাদের স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। "মনু বলেছেন যৌন বিষয়ে মহিলাদের বিবেক বিবেচনা নেই, যুবক অথবা বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথবা মূর্খ, সুশ্রী অথবা কুৎসিত যে কোন ধরণের পুরুষ পেলেই তারা তাদের সঙ্গে শয্যায় যেতে রাজী।" [মনুসংহিতা, ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত, কলিকাতা অরুণোদয় প্রেস, ১৮৬৬, নবম অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮, পৃষ্ঠা ৫২২-২৪]

মুসলমানদের পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে অনেকে বিরূপ মন্তব্য ও কু ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু প্রগতিশীল মহা ঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবীর যখন নদীতে স্নান করার ইচ্ছা হত তখন তাঁকে পাল্কি করে চড়িয়ে গঙ্গা নদীতে নামিয়ে দিয়ে "পাল্কিটি পুরোপুরি গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আসত আর তিনি পাল্কিতে বসে থাকতেন।" [স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার'—প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ]

বড় দুঃখের বিষয় অনেক লেখক একটা মিথ্যা প্রচার করতে চেয়েছেন যে, হিন্দুদের পর্দাপ্রথা প্রচলিত হয়েছে মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হতে বাঁচার জন্যই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এটাই, ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্বে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও এই নিয়ম অব্যাহত ছিল। আসলে ওটা ছিল সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক সংবিধান।

মক্কার অল্প সংখ্যক মুসলমান যখন ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রচন্ড আগ্রাসী আক্রমণে মার খাচ্ছিলেন তখন মায়া, মমতা, দয়ার মূর্ত প্রতীক হজরত মহম্মদ [স] কি যে করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। সেই সময় তাঁর প্রতি বাণী অবতীর্ণ হয়, যার মর্মার্থ ছিল—তোমরা বিদ্রোহী বিধর্মীদের আক্রমণের মোকাবিলা কর এবং তাদেরও আঘাত কর যতক্ষণ না তারা বশ্যতা বা পরাজয় স্বীকার করে। সুতরাং আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বহু পুরুষ মুসলমানকে আহত ও নিহত হতে হয়েছিল। এখনকার মত তখন আধুনিক হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ছিল না। তাই নবীর নির্দেশে মুসলিম মহিলাগণ বিনা দ্বিধায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন সহোদরা বোন অথবা কন্যার মতই।

হজরত মহম্মদের [স] পরলোকগমনের পর তাঁর অসংখ্য ভক্তজনের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে যে অভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করতে হজরতের [স] সুযোগ্য সঙ্গীগণ এগিয়ে এসেছিলেন। সেইসকল যোগ্য সাহাবী বা সঙ্গীদের মধ্যে যিনি উল্লেখযোগ্য পান্ডিত্যপূর্ণ অধিক সমাধান দিয়ে গেছেন জাতিকে, তিনি একজন মহিলা যাঁর নাম হজরত আয়েশা [রা]।

হজরত মহম্মদ [স] ও তাঁর ভক্তবৃন্দ ভ্রমণে যাবার সময় তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মুসলিম ভাগ্যান্বেষী ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিরূপে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্ত্রীদের। কিন্তু তদানীন্তন ভারতে হিন্দুসমাজে পুরুষের জন্যও সমুদ্র পার হওয়া ছিল কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। স্বার্থের খাতিরে যাঁরা ঐ অপকর্মটি [?] করেছিলেন তাঁদের ফিরে এসে শুদ্ধ হতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত করে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তো সমুদ্র পার হওয়া ও বিদেশে যাওয়া ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার।

আমাদের দেশে যিনি সর্বপ্রথমে দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ঠাকুর পরিবারের শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রথম দেশীয় সদস্য তিনি। দেশে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তার পূর্বে যখন একাকী ইংলন্ড গিয়েছিলেন, তখন ইংলন্ড থেকে তাঁর স্ত্রীকে যেসব পত্র লিখেছিলেন তার একটির অংশ এখানে পরিবেশন করছি ঃ ''তোমার হৃদয়, মন এখন অন্তঃপুরে প্রাচীরের মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। তুমি ইংলন্ডে আসিয়া আর এক নতুন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে।'' [দ্রষ্টব্য-১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র]

অনেক কাণ্ড করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন এবং জাহাজে চড়েই বিলেত যাবেন স্থির হল। কিন্তু জাহাজের বন্দর পর্যন্ত পৌছাবেন কি করে? ভদ্র হিন্দু মহিলাদের তখনও গাড়ি চড়া ছিল কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। শেষ পর্যন্ত জাহাজ পর্যন্ত উঠতে দরজাবন্ধ পাল্কি করে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। [জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা 'আমার স্মৃতিকথা', পৃষ্ঠা-২৯]

জ্ঞানদানন্দিনী যখন বিলেত থেকে ফেরেন তখন তিনি বেশ আধুনিকা হয়ে উঠেছিলেন; তাই একটি পুরুষ ভোজসভায় যোগদান করেছিলেন তিনি। ঠাকুর পরিবারের প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন বলে প্রচারিত। কিন্তু তিনি যখন তাঁদের বাড়ীর বউ জ্ঞানদানন্দিনীকে ভোজসভায় দেখলেন তখন ঐ রকম অসভ্যতা [?] বরদাস্ত করলেন না। তাই ঘৃণায় ও ক্রোধে অধীর হয়ে সভা ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য]

মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায়, যেকোন বিচারে বিচারকের সামনে মহিলারা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসামী, বিচারপ্রার্থী ও সাক্ষী হিসাবে হাজির হওয়ার অধিকার রাখতেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারা সামাজিক হওয়ার অধিকার পেয়ে তাঁদের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়ে ভক্তিমূলক গীত গাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা ও নেতা। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেছে, রামতনু লাহিড়ী যখন কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে কেশব সেনের প্রর্থনা সভায় উপস্থিত, তখন অসন্তুষ্ট হন তিনি এবং সমালোচনা করেছিলেন কেশব সেনের। [শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ']

ব্রাহ্মধর্মের মহিলারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রার্থনা সভার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা হিন্দু ধর্মের ক্ষমতা অনেক আগেই বাদ দিয়ে অর্জন করতে চেয়েছিলেন নতুন ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। খাঁটি হিন্দুসমাজের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। বেশিদিনের কথা নয়, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকুমার যখন কলকাতায় এলেন তখন হাইকোর্টের হিন্দু উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্মানে আয়োজন করেছিলেন একটি ভোজসভার। তাতে সাহেবদের অভ্যর্থনা জানাতে উকিলবাবুর বাড়ির মেয়েরা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এগিয়ে আসেন। সেজন্য হিন্দুসমাজে তাঁকে কঠোরভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। তাঁকে অপমান করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একটি নাটক করা হয় যা ছিল অত্যন্ত অরুচিকর ও

অশ্লীল। উকিল জগদানন্দের নামটি পরিবর্তন করে নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। [দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা 'নাট্যশালার ইতিহাস', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬১ তে ছাপা]

সাধারণ যাত্রা থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চে বাঙালী মহিলারা প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট। মহিলারা যেদিন প্রথম নাট্যমঞ্চে অভিনয় করলেন, সেদিন সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কারক প্রগতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী দুজনেই খুব অসন্তুষ্ট হন। তার পর থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে কখনও আসেননি ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়। [দ্রষ্টব্য 'আত্মচরিত', শিবনাথ শাস্ত্রী ও ইন্দ্র মিত্রের লেখা 'সাজঘর', ১৯৬০-এ ছাপা]

হিন্দু ধর্ম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মরা মূর্তি পূজা বর্জন করে প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসভায় মহিলারা বসে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনতেন। কিন্তু মহিলা ও পুরুষদের মাঝে একটি মোটা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গানো থাকত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্দার আড়ালে থেকে উপদেশ শোনাতেন। ঠাকুর বাড়ি থেকে মেয়েরা ব্রাহ্ম ধর্মসভায় পর্দার আড়ালে উপদেশ শোনার অধিকার প্রাপ্ত হন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ঠিক তার পরের বছর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের এতটা অধিকার দেওয়া ঠিক হয়নি মনে করে আবার তা নিষিদ্ধ করা হয়। [কলকাতা হতে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৭৩ সনের মাঘ সংখ্যা, ৪৪৪ পৃষ্ঠা]

ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে এসে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একটির নাম দেন 'ভারত সংস্কার সভা' আর মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল 'সামাজিক সমিতি'। ঐ 'সামাজিক সমিতির' তিনি নিজেই হলেন প্রেসিডেন্ট। আর নামকরা সদস্যাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণলতা ঘোষ, ব্রহ্মাময়ী, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ। কিন্তু রহস্যময় ঘটনা হল এই, ঐ মহিলা সমিতির ভেতরে দুজন বিলেতী মহিলা বিলেতী আভিজাত্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখেই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একজনের নাম লেডি ফেয়ার এবং অপরজনের নাম মিস্ পিগট।

হিন্দুধর্ম হতে বেরিয়ে আসা ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ ইঙ্গিতে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক ভাগ হতেই নিজস্ব মহিলা সমিতি সৃষ্টি হয়। আর হিন্দুধর্ম হতে বেরিয়ে আসা বাঙালী খৃষ্টান মহিলারা পৃথক মহিলা সমিতি সৃষ্টি করেন। এত কাণ্ড ঘটতে থাকলেও হিন্দু নারীরা তখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পারেন নি। ঠিক ঐসময় বৃটিশের নিয়োগ করা যুদ্ধ সচেতন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত কর্ণেল H. S. Olcot মহিলাদের মাঝে উদ্ভূত হয়ে আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুরু করেন। তার পেছনে কোন গোপন কৌশল থাকলেও অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে

আরেকটি উল্লেখযোগ্য মহিলা সংস্থার সৃষ্টি হয়। সেটির নাম 'সখী সমিতি'। ঐ সংস্থা দুটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল—একটি মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে সাবলম্বী করা এবং অপরটি ধর্ষিতা মহিলাদের ফিরিয়ে এনে তাদের মর্যাদা দেওয়া। সরলাদেবী চেয়েছিলেন ঐ পতিতা ধর্ষিতাদের আইনের অনুকূলে সমাজে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করাতে।

মেয়েরা পুরুষদের মত লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে এটা হিন্দু সমাজে কল্পনা করতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবিও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নারীদের চাকরি করা সহজে সমর্থন করতে পারেন নি।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ডাক্তারি পড়বার জন্য মেডিকেল কলেজ খোলা হয়; তা হিন্দু সমাজে গৃহীত হতে পারল না। কারণ মৃতদেহ কাটাকাটি করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আর মহিলাদের জন্য ব্যাপারটা ছিল আরও কঠিন। যাইহোক, হিন্দু সমাজ হতে ধর্মত্যাগীরা সাহস করে আস্তে আস্তে ঐ কাজে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নারী সমাজকে এগিয়ে দিতে অনেক সময় লাগলো। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ খোলা হলেও ১৮৮৯ সালে কাদম্বিনী দেবী ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হয়, কাদম্বিনী পাশ করলেও তাঁকে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে। ঘটলোও তাই। তাঁকে পরীক্ষায় ফেল করিয়েই দেওয়া হল। অবশ্য তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁকে চিকিৎসা করার একটা অনুমতিপত্র লিখে দেওয়া হয় যাতে তিনি চিকিৎসা করতে বাধা না পান। কিন্তু তাঁর নামের পাশে M. B. লিখবেন সে সৌভাগ্য হয় নি তাঁর।

গর্ভবতী হিন্দু নারীরা প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করলেও ডাক্তার দেখানোর প্রথা ছিল কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ফলে প্রসবকালে প্রচুর মহিলা ও শিশু মারা যেত। এটাই ছিল তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা । প্রথমে বঙ্গের যে দুজন মহিলা M.B. পাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী। তাঁরা দুজনেই ছিলেন খৃষ্টান। পূর্বে উল্লিখিত কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কিন্তু হিন্দু ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে এমন কুৎসা রটানো হয়েছিল যা তাঁর চরিত্রের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। অবশেষে তা পৌঁছে গিয়েছিল আদালত পর্যন্ত। ['বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ.১০৬ দ্রষ্টব্য]

সর্বপ্রথম যে বাঙালি মহিলা চাকরি করেন তাঁর নাম ছিল রাজরাণী দেবী। তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৪০ টাকা। তখন ইংরেজরা খুব অবাক হয় এবং তাঁর একটি ছবি পাঠিয়ে দেয় ইংলণ্ডে যাতে বিলেতের মানুষও অবাক হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৬৬ খৃষ্টব্দে। অর্থাৎ ১৮৬৫ পর্যন্ত কেমন অন্ধকার যুগ ছিল একমাত্র ইতিহাসই তার

সাক্ষী। এমনি আর একবার খুব হৈ-চৈ হয়েছিল যখন বাঙালী মহিলা সর্বপ্রথম চশমা পরেছিলেন। তাঁর নাম রাধারাণী।

হিন্দু সমাজে মহিলাদের চারিদিকে এমন অবরোধের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছিল যে তাদের বাইরের উল্লেখ্যযাগ্য কোন জিনিস দেখবার অধিকার প্রায় ছিলই না। এগুলো প্রমাণ হয় তখনকার প্রকাশিতলেখা হতে। উদাহরণে বলা যায় , যখন হাওড়ার বিখ্যাত ব্রীজটি তৈরি হয় তখন তা দেখবার জন্য পুরুষেরা দলে দলে ভিড় জমায় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়। পুরুষদের কাছ হতে হাওড়ার পুলের কথা শুনে মহিলাদেরও দেখার সাধ হয়েছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাই কলকাতার মায়াসুন্দরী দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, '' স্ত্রী লোকদের কিছু দেখিবার হুকুম নেই। কলকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল। একদিনও চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না।'' [দ্রষ্টব্য শ্রীমতী মায়াসুন্দরীর লেখা 'নারীজন্ম কি অধর্ম?', 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা, ১৮৮২-র শ্রাবণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯৪]

১৪০০ বৎসর পূর্বে হজরত মোহাম্মদ [স] পুরুষ ও নারীর পোষাকের যে ছক তৈরি করে দিয়েছেন তা আজও সারা বিশ্বে মুসলমান সমাজে অনুসৃত হচ্ছে তাই নয় বরং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও দেশে সে প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। আরবীয় মহিলাদের ছিল ফুলহাতা জামা, কোমর হতে পা পর্যন্ত পাজামা কিংবা সায়ার মত পোশাক, মাথার চুল ও বক্ষ আচ্ছাদনের জন্য অস্বচ্ছ কাপড়ের ওড়না আর পুরুষদের জন্য ছিল নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি বা পাজামার মত পোশাক আর ঊর্ধাঙ্গে ছিল পাঞ্জাবী, পিরহান বা কামিজ, মাথায় ছিল টুপি এবং তার উপর পাগড়ি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পায়ে পরতো চামড়ার মোজা, তার উপর চামড়ার জুতো।

ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্বে গোঁড়া রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে পুরুষদের পোষাক যা ছিল তা অত্যন্ত সীমিত। শুধু ছোট একটুকরো কাপড় যা ল্যাংটের মত ব্যবহৃত হোত। এমনকি সাধু-সন্ন্যাসী, মুনি- ঋষিরা পর্যন্ত ঐ অত্যল্প পোষাককেই যথেষ্ট মনে করতেন। গায়ে ভষ্ম মাখার প্রচলন ছিল। বেশিরভাগ মহিলা এবং পুরুষদের খালি পায়েই ছিল হাঁটার অভ্যাস। কিছু কিছু সাধু সন্ত ফিতেবিহীন কাঠের পাদুকা ব্যবহার করতেন। পোষাকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গামছার মত ছোট ধুতি, খালি গা এবং শীতকালে একটা ছোট্ট চাদর ব্যবহৃত হোত। আর মহিলাদের পোষাক ছিল আরও করুণ। শুধু একটি শাড়ি মাত্র। ভারত একটা বিষয়ে গৌরবের অধিকারী—পাতলা কাপড় সৃষ্টিতে শিল্পীরা ছিলেন পরম প্রশংসিত। আর মহিলাদের পাতলা পোশাক পরিধান ছিল আভিজাত্যের প্রমাণ। কিন্তু মহিলাদের কোন জামা, ব্লাউজ, সায়া, সেমিজ, জুতো, মোজা ব্যবহারের নিয়ম ছিল না; বরং তা ছিল নিষিদ্ধ। অন্যদিকে মহিলাদের

জন্য নিয়ম করা হয়েছিল তারা জলাশয়ে স্নান করে ঐ ফিনফিনে পাতলা ভিজে কাপড় পরেই বাড়ি ফিরবে। ঐ পাতলা ভিজে কাপড় কাঁচের মত স্বচ্ছ লাগত ফলে কাপড় ভেদ করে গোটা দেহ উলঙ্গ দেহের মতই মনে হোত [শ্রী রাজকুমার চন্দ্রের লেখা 'দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম' পুস্তকের ৬ ও ৭ পৃষ্ঠা]। ফ্যানি পার্কাস একজন ইউরোপীয় মহিলা; এই ঘটনার কথা তাঁর লেখা বইতেও লিখে গেছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল—''লম্বা শাড়ী পরলেও বাঙ্গালী মহিলারা প্রায় উলঙ্গই থাকতেন এবং এরূপ পোষাক প্রকাশ্যে জনসমক্ষে পরিধান করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়'' [দ্রষ্টব্য 'সূক্ষ্মবস্ত্র', বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্তিক, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ১২৪-১২৬]। কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবী মুসলমান, পারসিক ও শিখদের পোষাক লক্ষ্য করে আধুনিকভাবে পোশাক পরার প্রচলনের প্রতিষ্ঠাত্রী বলা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু মহিলা সমাজ এবং ব্রাহ্ম ও বাঙালী খৃষ্টানেরা পর্যন্ত পাঁচমিশালী পোষাক পরতেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পোষাকের উন্নত সংস্করণ বের হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কোন এক বিশেষ পোষাক পরার নিয়ম চালু হয়নি। সুন্দর আধুনিক পোষাক সৃষ্টির গোড়াতে হিন্দু মহিলাদের মধ্যে যখন নানা বাধা বা দ্বিধা আসছিল, তখন প্রথম এগিয়ে আসে 'বারাঙ্গনা' বা বেশ্যা সমাজ। তাতে ভদ্রলোকেরা একটু মুশকিলে পড়ে যান। বেশ্যাদের প্রচলিত ঐ পোষাক পরলে তাঁদের মেয়েদেরও হয়ত কেউ কেউ বেশ্যা ভাবতে পারে, সেইজন্য শাড়ীর ওপর একটি বাড়তি চাদর গায়ে দেওয়ার নিয়ম চালু হয়; যেটা ১৪০০ বছর পূর্বে হজরত মহম্মদ [স] ওড়না হিসাবে ব্যবহার করতে মুসলমান নারী সমাজকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

নারী সমাজের প্রতি পুরুষের অত্যাচারের ইতিহাস অদ্ভুত ধরণের ছিল। যেমন তাদের বাইরে বের হতে না দেওয়া, কোন ভদ্রমহিলাকে গাড়ি চড়তে না দেওয়া, হাওড়া ব্রীজের মত দর্শনীয় অনেক কিছুই দেখতে না দেওয়া, স্বামী সঙ্গে থাকলেও তাঁর কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীকে যেতে না দেওয়া, ছেলেদের সঙ্গে বৌমাদের প্রকাশ্যে কথা বলতে, গল্প করতে বা হাসিঠাট্টা করতে না দেওয়া ইত্যাদি। অথচ তাঁদের অত্যন্ত মিহি কাপড় পরিয়ে, ব্লাউজ বডিস সায়া সেমিজ ওড়না না পরিয়ে, পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ি আসতে দিতেকোন বাধা ছিলনা— বরং তা সাধারণ নিয়মই ছিল।

১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে বসু অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে এক পোশাক ব্যবসায়ী বামাবোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় এইভাবে—''বাঙালী মহিলাদের জন্য এই কোম্পানি নতুন ধরণের 'সংস্কৃত' পোষাক তৈরি ও সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে। এই পোষাক 'প্রগতিশীল' ও সভ্য সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হবে।''

তা সত্ত্বেও মনে রাখা ভাল যে, সেই সময় শাড়ী পরার আধুনিক প্রচলন করতে গিয়ে যাঁরা অনেক বিদ্রুপ ও বিরোধিতা সহ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা প্রগতিমনা সুচারু দেবী।

মানুষ জাতি অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং যা ভাল, যা মানবকল্যাণ বা মানব উন্নতির পথে সহায়ক তা গ্রহণ করা, অন্ততঃ স্বীকার করা মানবিক বৈশিষ্ট্য। মুসলমান সমাজে শাড়ী পরার নিয়ম ছিলনা। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ও দু-একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীতে এই নিয়ম নেইও। বস্তুত শাড়ী এ দেশীয় সভ্যতার অবদান।

এত তথ্য সম্বলিত আলোচনায় বেশ বোঝা গেল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট ঋণী। আর ব্রাহ্ম সমাজ সরাসরি অনুসরণ করেছে ইউরোপকে। কিন্তু যে সত্য কথাটুকু মেনে নেওয়া কঠিন, সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলো সভ্যতা শিখেছে মুসলমানদের কাছ হতে। আরব, তুরস্ক, পারস্য, মিশর, স্পেন প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলো তখন সভ্যতার বিকাশকেন্দ্র ছিল বিশ্ববাসীর জন্য। পৃথিবীর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, যেমন আজ এই চলন্ত শতাব্দীতে মানুষ তাকিয়ে আছে আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান জার্মানী প্রভৃতি দেশের দিকে। মুসলিম সভ্যতাই যে ইউরোপীয় দেশগুলোকে সভ্য করেছে, এ তথ্য স্বীকার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে। পৃথিবীতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে মুসলিম জাতি, যেটার নাম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় যা স্পেন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—'যেখানে ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এল; রাজা রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধ বিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল।' [দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃষ্ঠা ১১০]

ভারতের প্রাচীন সমাজে পুরোহিতদের অন্ধতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে উন্নতির পথে এগোতে দেয়নি। বৈদিক সভ্যতাকে যদি উন্নতি বিকাশের চাবিকাঠি ধরা হয় তাহলে সেই বেদ বা বেদের বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সদিচ্ছা তখনকার নেতাদের ছিল না, বরং অনিচ্ছাই ছিল। কারণ কোন অনুন্নত সমাজের ছোটলোকেরা [?] যদি বেদের বাণী শুনতেন বা বেদ পড়বার চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁদের অনধিকার কর্মের জন্য জিভ কেটে দেওয়া হোত এবং কানে তপ্ত সীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হোত। [তথ্যঃ বাঙলা দেশের ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার]

মিলন মৈত্রীর পথে এমন প্রাচীর তোলা হয়েছিল যা সত্যিই বিস্ময়কর। ভারতীয় অনুন্নত দুর্বল সমাজের মানুষকে ছোটলোক বলে অচ্ছুত মনে করা হয়েছিল। তাঁদের থুতুতে রাস্তা অপবিত্র হতে পারে, তাই তাঁদের প্রত্যেকের গলার সামনের দিকে একটি ভাঁড় ঝোলানো থাকত। আর তাঁদের ছায়াতে মাটি অপবিত্র হবে—সেইজন্য পাটের

ঝাঁটা কোমরের পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হোত, যেটা মাটিতে ঠেকতে ঠেকতে যেত [তথ্যঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত]

১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে। তার মাত্র ৩০ বছর পূর্বে মহিলাদের কতটা শিক্ষিত ও উন্নত করা হয়েছিল তার খতিয়ান দেখলে অবাক হতে হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গসমাজে মাত্র ৪৯ জন মহিলা বি. এ. পাশ, ৮ জন এম. এ. আর ছিল দুজন পাশ করা ডাক্তারের অস্তিত্ব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুতো পরার প্রথা হিন্দু সমাজে ছিল না। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম যিনি জুতো পরেছিলেন তিনি ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথমে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরার স্পর্ধা [?]প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে কবিগুরু রবিঠাকুরের পরিবারে তিনি বিরাগভাজন হন। বাধ্য হয়ে স্বামী-স্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পৃথক বসবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুসলমান সমাজে একান্ত প্রয়োজনে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। অভিভাবকদের ইচ্ছায় তা হতে পারত। কিন্তু স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বালিকা বধূ পিতা-মাতার বাড়িতেই থাকত। যেমন হজরত মহম্মদের [স] বালিকা বধূ আয়েশা [র] বিবাহের পরেও কয়েক বছর পিত্রালয়ে ছিলেন। যখন তিনি বরালয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন উন্নত অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী; তাঁর বয়স চলছিল দশ। এই নিয়ে অনেক বিরুদ্ধ আলোচনা করতে অনেক ঐতিহাসিকও কলম চালিয়েছেন। সেটা ছিল সপ্তম শতাব্দীর কথা। অথচ ইতিহাসের খবর লুকিয়ে লাভ নেই, আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল তা বড়ই বিস্ময়কর—দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যার অবাধে বিয়ে হোত, যাদের বয়স ছিল কয়েক মাস মাত্র। [অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'ধর্মনীতি ও কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ', ১৮৫৬, পৃষ্ঠা ৬৯]

হিন্দুসমাজে স্ত্রী জাতিকে মনে করা হোত যেন ক্রীতদাসী বা চাকরানী। তাই বিয়ে করতে যাবার সময় বরকে মা, বাবা ও অভিভাবকদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিতে হোত—'আমি দাসী আনতে যাচ্ছি।' [ভুবনমোহন সরকারের লেখা 'পারিবারিক সংস্কার', বঙ্গ-মহিলা' মাঘ ১২৮২, পৃষ্ঠা ২৩৬] তাছাড়া স্বামী নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ভালবাসতে, গল্প করতে, হাসি ঠাট্টা, আমোদ আহ্লাদ করতে পারত না, করলে তাকে নষ্ট ও স্ত্রৈণ আর সেই বধূকে পেতে হোত 'ডাইনি' উপাধি [স্বর্ণলতা চৌধুরীর লেখা 'বৌমা', অন্তঃপুর ১ম বর্ষ, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭]। দাসী মনে করেই বাড়ির কর্তা কর্ত্রীরা বাড়ির বৌদের অনেক কাজকেই অনধিকার মনে করতেন এবং কথায় কথায় তাদের অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হোত; শেষ পরিণতিতে অনেকেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হোত। এইভাবে শ্যামসুন্দরী

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক্যময়ীর মর্মান্তিক আত্মহত্যার কাহিনী ছাপা হয়েছিল 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১৮৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃষ্ঠা ১৩০-৩১ দ্রষ্টব্য]।

একজন লেখিকা তৎকালীন সমাজের সত্যচিত্র তুলে ধরতে লিখেছেন, "প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্যকে বলা উচিত নহে" [হেমাঙ্গিনী চৌধুরীর লেখা 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য' দ্রষ্টব্য]। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি বই থেকে তথ্য তুলে দিচ্ছিঃ জানা যায় নম্র, ভদ্র, বিবাহিতা মহিলারা তাঁদের স্বেচ্ছাচারী, মাতাল স্বামীদের দ্বারা কেমনভাবে প্রহার ও লাথি খেতেন আর ঐ প্রহার ও লাথি খাওয়াকে 'দেবতার আশীর্বাদ' মনে করা হোত। তবু স্বামীর দুর্নাম করার অধিকার ছিল না। তাঁরা তখন লাথি মারাতেও "পতির দোষ না দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহার চরণপূজা করিয়া নারীধর্মের অক্ষয়তা লাভ করিতেছেন" বলে বিশ্বাস করতেন। [গিরীবালা দেবীর 'সাধ্বী' বইয়ের ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও ইংরেজ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন ছিল না; বরং বলা যায় আকণ্ঠ তাদেরকেঅনুসরণ করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। তাতে সুফল ও কুফল দুইই হয়েছিল। খৃষ্টান মহিলাদের অনুসরণে অনেক আধুনিক শিক্ষিতা বিয়ে করেননি, আর যাঁরা করেছেন বেশ বেশি বয়সেই করেছেন। যেমন কামিনী সেনের বিয়ে হয়েছিল ৩০ বছর বয়সে। ঠাকুর পরিবারের সরলাদেবী বিয়েই করতে চাননি। তাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খুব রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, সরলার বিয়ে কোন মানুষের সঙ্গে না দিয়ে একটি তরবারির সঙ্গে দেওয়া হোক [সরলাদেবীর লেখা 'ঝরাপাতা' পৃষ্ঠা ১০৭]। ঠাকুর বাড়ির মেয়ে হিরন্ময়ী দেবী ফণীভূষণ বাবুর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন এবং তাঁরই মামাতো বোন ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরির সঙ্গে প্রেম প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন।

ঐ সময়ে বিলেতের মেয়েরা তাদের বক্ষ সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে শিশুকে স্তন পান করাতেন না। সুতরাং আমাদের দেশের যাঁরা ভদ্রলোক বা বাবুদের বাড়ির দুগ্ধবতী মহিলা তাঁরাও শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। বিকল্প হিসাবে গরীব লোকদের বাড়িতে শিশুকে পুষতে দিতেন অথবা ধাত্রী বা আয়াদের দিয়ে বাচ্চা মানুষ করাতেন। ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারীর মত মহিলাও বাড়ির সকল মহিলার 'মতই কোন সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করান নি।' [সরলা দেবীর লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা', পৃষ্ঠা ১]

শরৎকুমারীর লেখা হতে ভদ্র ও বাবু পরিবারের মহিলাদের আলেখ্য ধরা পড়ে। তাঁর মতে তখনকার হিন্দু সমাজের মহিলারা যেভাবে থাকতেন আজকের দিনের আধুনিক পুরুষেরা মোটেই তাঁদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারতেন না। মহিলারা বিনা ব্লাউজে শুধু শাড়ী পরে থাকতেন, আর সারাদিন কাজকর্ম করে যতবার প্রয়োজন কাপড়েই হাত মুছতেন। সুতরাং সারা কাপড়ে ময়লা, রান্নার কালি, হলুদের দাগ, নাক মোছার চিহ্ন লেগে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করত। শরৎকুমারী পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে তাদের কুরুচি প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেছেন, পুরুষদের রুচি অনুযায়ীই মেয়েদের সাজসজ্জা ছিল। তখন মেয়েরা দাঁতে মিশি ব্যবহার করত, যা ছিল নস্যির মত একপ্রকার পাউডার যাতে মহিলাদের দাঁতগুলো একেবারে আতার বীজের মত কালো হয়ে থাকত, এমনকি মিশি ব্যবহারের কারণে ঠোঁট পর্যন্ত কালো হয়ে যেত। লেখিকা নিজের ভাষায় যা লিখেছেন তা হল এই , " আমাদের বাঙালি যুবকদের রুচি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার অনুসারেই একালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় চওড়া সিঁদুর, কপালে বৃহৎ সিঁদুর-টিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দু'গাছা মল—ঝোঁটন করিয়া খোঁপা বাঁধা স্ত্রীর সহিত বোধ করি একালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, ঘরে ঢুকিতে দিবেন না।" [তথ্যঃ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা 'একাল ও একালের মেয়ে'র ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩ ও ৫৬৬ পৃষ্ঠা]

আমাদের দেশের কেউ কোনদিন জন্মদিন পালন করতে জানতেন না। এই ইউরোপীয় নিয়মের সর্বপ্রথম প্রচলন করেন জ্ঞানদানন্দিনী, নিজের জন্মদিন পালন করে। তাছাড়া এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে 'এপ্রিলফুল' পালন করা— এই রীতিও বিলেত থেকে আমদানি। [জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা 'সমাজসংস্কার ও কু-সংস্কার' পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৫]

ব্রাহ্মধর্মীরা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করতে, ঠাকুর দেবদেবীদের গালি দিতে, মদ্যপান বিশেষ করে গোমাংস খাওয়া প্রভৃতি কাজগুলোকে বাহাদুরি মনে করতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পরেই কোন অদৃশ্য প্রভুর আদেশে হঠাৎ হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মনেতারা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে যান। হিন্দুধর্ম বিরোধী ব্রাহ্ম নেতা রাজা রামমোহন উপনিষদের কিছু বাছাই করা অংশকে নিয়ে তার এমন নতুন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন যাতে বনেদী ব্রাহ্মণ সমাজ অবাক হন। দেশের শিক্ষিত যুবসমাজ বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষত ইয়ংবেঙ্গল দলের শিক্ষিত সদস্যরা বেশিরভাগই এমনভাবে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা বলতেন, 'হিন্দুধর্ম ধ্বংস হোক।' আর প্রকাশ্যে লোকদের শুনিয়ে বলতেন 'আমরা গোরু খাই! গোরু খাই! গোরু খাই!' আর হঠাৎ এই শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা এমন সব বই লিখতে লাগলেন, যার উদ্দেশ্য ও সারমর্ম ছিল হিন্দু সভ্যতাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সভ্যতা, তাতে যা কিছু আছে সবই ঠিক ; সুতরাং ভারতবর্ষের সকলেরই হিন্দুধর্মে আবার ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। অথচ এতদিন ধরে ব্রাহ্মধর্মীরা এবং ইয়ংবেঙ্গলের শিক্ষিত সদস্যবৃন্দ যা বলে আসছিলেন সেটা হচ্ছে এই, "তাঁরা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কিছু ঘৃণা করেন তবে তা হিন্দুত্ব"। [মাধবচন্দ্র মল্লিকের লেখা, 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার ১৮৩১ এর ৩০ শে অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোন গোপন ইঙ্গিতে মহিলাদের উন্নত করার যে চলমান গতি তা থামিয়ে বা বন্ধ করে দিয়ে শুরু হল নতুন দৃশ্য 'দেশপ্রেম'। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাটক, যাত্রা যতকিছু প্রদর্শিত হয়েছে সবকিছু ছিল হিন্দু সমাজের সংস্কারের উপর। কোন্ ইঙ্গিতে কোন্ ব্রেনের বুদ্ধিতে ১৮৭৬ তে শুরু হয়ে গেল আর এক নতুন পালা—হিন্দু গৌরব, পুরাণ নির্ভর সভ্যতার অবিষ্কার। প্রচার করা হোল প্রাচীন ভারতে সবই ছিল ইত্যাদি। দেশাত্মবোধক নাটকের স্রোত বইয়ে দেওয়া হল আমাদের দেশে।

ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত নেতা বা প্রেসিডেন্ট রাজনারায়ণ বসু ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম এবং পুরোপুরিভাবে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী। প্রমাণ করতে গিয়ে বলা যায় তিনি গোঁড়ামি প্রদর্শন করতে সকলের সম্মুখে গোরুর মাংস ও বিস্কুটখেয়ে বীরত্ব [!] দেখালেন। সেই রাজনারায়ণ বসুই আবার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কোন্ ইঙ্গিতে, কাদের অঙ্গুলীহেলনে খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, হিন্দুধর্ম খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম হতে শ্রেষ্ঠ। শুধু বক্তৃতা নয় একটি বইও লিখেছিলেন, যেটির নাম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রাহ্ম অবস্থাতেই ঐ স্রোতেই সাঁতার কাটলেন। বোধহয় এসব বৃটিশ ব্রেনের বাহাদুরি। হিন্দু বিরোধীদের মুখ দিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে হিন্দুসমাজ যেন নতুন করে পুঁজি পেয়ে গেল হাতে। ঐ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে বেশ কিছুদিন পূর্বেই তাঁর পৈতে ত্যাগ করেছিলেন।

হজরত মহম্মদ [স.] বিধবা বিবাহ শুধু মুখেই সমর্থন করেননি, তিনি যাঁকে প্রথম বিবাহ করেছিলেন তাঁর নাম খাদিজা [রা] , তিনি ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী ও বিধবা। আর তাঁর সময় হতে আজও পর্যন্ত মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে ব্যাপকভাবে। বিধবা নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন হজরত মহম্মদ [স.] ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারী কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় আইন তৈরি হল যে বিধবারা বিবাহ করতে পারবেন; সেটি হয়েছিল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। হজরত মহম্মদ [স.] যা ষষ্ঠ শতাব্দীতে করলেন, ভারতে তা আইনে পরিণত হল উনবিংশ শতাব্দীতে। আইন পাশ হলেও কিন্তু আজও [একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়] হিন্দু সমাজে পুরোপুরি তা কাজে পরিণত হয়নি। সরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল ১৮৫৬ তে আইন পাশ হলেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বিশাল ভারতবর্ষে মাত্র ৫০০ জন বিধবার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য Report on the Administration of Bengal for 1882-83, p. 497]

মুসলমান সমাজের উপর একটা অসত্য অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মে নাকি চারটি বিয়ের নির্দেশ আছে। কিন্তু এটা সত্য নয়। আসলে নির্দেশ নয়, চারটি বিয়ের অনুমোদন আছে মাত্র। নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাতের মত নির্দেশ

হলে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য হোত। সেজন্যই মুসলমান সমাজে চারটি বিয়ে করার দৃষ্টান্ত সচরাচর খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে সেন আমলে অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনদের সময় কুলীন প্রথার প্রচলন হয়, তাতে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক এক জন বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, আশি এবং তারও বেশি বিয়ে করেছিলেন অবাধে। এইভাবে শতাধিক পুত্রকন্যাদের জন্মও হয়েছিল [দ্রষ্টব্য অধ্যাপক বিনয় ঘোষের লেখা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর']। এসব প্রাচীনকালের কল্পলোকের গল্প নয়, বিগত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেও বরিশালের ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং বর্ধমানের কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়ের মত বহু-বিবাহকারী কুলীনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০৭ টি বিবাহ করেছিলেন এবং কিশোরীমোহনের ৬৫টি স্ত্রী তখনও বেঁচেছিলেন। [দ্রষ্টব্য 'বামাবোধিনী' বাংলা ১৩০০ সনের পৌষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮৬]

মুসলিম সমাজে চিরদিন বিধবা রমণীরা পেয়ে আসছেন সম্মান ও স্বাধীনতা। যে কোন মুসলিম বালিকা বয়োপ্রাপ্ত হলেই সে নিজের পিতামাতা বা অভিভাবক বাদ দিয়েও স্বামী পছন্দ করে বিয়ে করার অধিকার রাখে। সেই সময় হিন্দু সমাজে বিধবাদের এই অধিকার ও সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে [১২৭৭ বঙ্গাব্দ] একটি মূল্যবান তাত্থিক লেখা 'বামাবোধিনী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেটা থেকে হিন্দু সমাজের বিধবাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হোত তার পরিচয় পাওয়া যায়। ''বিধবা যদি উত্তম বস্ত্র পরিধান করে এবং সমবয়স্ক রমণীদের সঙ্গে হাস্য করে তাহলে অনেক গৃহিনী খড়্গহস্ত হইয়া ওঠেন। ... আমরা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি যে, অমুক তাঁহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাঁহার বিধবা কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকা প্রহার করিতেছেন, অমুক তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন।''

হজরত মহম্মদের [স.] বালিকা বধূর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাত্র কয়েকমাস বয়সের কন্যাদের বিয়ে আমাদের ভারতের হিন্দু সমাজে সহজেই হোত। এইসব অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে বলা যেতে পারে যে, ঐ প্রথা অশিক্ষিত সমাজেই সম্ভব; শিক্ষিত সমাজে নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসখ্যাত শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত নেতারা কে কত বছরের বধূকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের দু-চারজনের নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও প্রগতিবাদী নেতা রাজনারায়ণ বসু বিয়ে করেন এগারো বছরের বালিকাকে। সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী বিয়ে করেছিলেন দশ বছরের বালিকাকে। ধর্মীয় নেতা, মহাপণ্ডিত কেশবচন্দ্র সেন বিয়ে করেছিলেন নয় বছরের বালিকাকে। বিলেত ফেরত

বিরাট মানুষ, ইতিহাসখ্যাত পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন আট বছরের বালিকাকে। বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত, মহাপণ্ডিত, নারীসমাজের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিয়ে করেছিলেন আট বছরের বালিকাকে। বিলেতে শিক্ষা প্রাপ্ত, ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকুর বাড়ির বিশেষ ব্যক্তি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন সাত বছরের বালিকাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা শুধু ঋষি নন্—মহাঋষি; সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ছয় বছরের বালিকাকে। তাঁর যুগের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণকারী পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও বিয়ে করেছিলেন ছয় বছরের বালিকাকে। সরকারের পুরস্কার, পদক, উপাধি ও সৌজন্য প্রাপ্ত, হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানের জন্মদাতা, বঙ্গসাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠতম গুরু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীর বয়স ছিল পাঁচ বছর মাত্র। [দ্রষ্টব্য Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905]

৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ [স.] পরলোকগমন করেন। কিন্তু নারীজাতিকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে গেছেন তা আজও বিশ্বের বিস্ময়। যেকোন মহিলা তাঁর পিতামাতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেতে বাধ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজে কত বড় বড় পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, সিদ্ধপুরুষ, স্বামীজি, গুরুজি জন্মালেও তাঁদের নজর পড়ল না কন্যা শিশুদের প্রতি। অনেকেই ভাবলেন না যে তারাও মানুষ, তাদেরও অধিকার বলে একটা পাওনা আছে। যখন এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হল তখন পৃথিবীর বয়স অনেক বেড়ে গেছে এবং বহু বঞ্চিতা, রিক্তা, নির্যাতিতা ও অবহেলিতা নারী দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়ে গেছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মহিলারা তাঁদের মৃত বাবা-মা'র পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার রাখতেন না। মুসলমান মহিলারা যে অধিকার ভোগ করে আসছেন, হিন্দু মহিলাদের সেই অধিকার পাওয়া শুরু হল সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর পর।

কিছু আধুনিকবাদীদের মত হচ্ছে, মুসলমান সভ্যতা সারা পৃথিবী তথা ভারতেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তুলনামুলক হিসাবে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে বলা যায়, হিন্দু সমাজের কু-সংস্কারগুলো মুসলমানরা গ্রহণ করেছে এবং এখনও অনেকে সেগুলো আঁকড়ে ধরে আছে। আজকের মুসলিম মহিলা সমাজের অবনতি ঘটেছে না বলে বরং অবনতি ঘটানো হয়েছে বলা ভাল। অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে তাদের। খেতে না পাওয়া কিলবিল করে পোকামাকড়ের মত বেঁচে থাকা সমাজে চোখে পড়ার মত কিই বা দেখাবার আছে তাদের? হিন্দু সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি আজকের আধুনিকতা

বিকাশের প্রধান কারণ। নতুবা মাত্র কয়েকবছর পূর্বে ঠাকুরবাড়ির মত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের সহোদর ও পিতৃদেবের ইতিহাস আলোচনা করলে আমাদের সমাজের পরিস্থিতি অনুমান করা সহজ হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে পত্রে যা লিখেছিলেন সেটা হিন্দু সমাজের ও তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই বলা যায়—"তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন, বাবামহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ রাখি। আমি তো তাই বুঝিতে পারি না বাবামহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। ... তুমি যদি পঁচিশ বছর অন্তঃপুরে যেমন আছ এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বৎসর আসিয়া ইংলণ্ডে যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ডের দুই বৎসর অন্তঃপুরের পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি-মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইবে" [১৮৬৪ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য]। মজার কথা হচ্ছে এই, জ্ঞানদানন্দিনীর যখন বিবাহ হয়, তিনি ছিলেন নিরক্ষর; পরে তাঁকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন ১১ বছরের বালিকা এবং তিনিও ছিলেন নিরক্ষর। পরে তাঁকে খানিকটা বাংলা ও ইংরাজী শেখানো হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ যত আধুনিকবাদীই হোন তাঁর কন্যা রেণুকা দেবীর বিয়ে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামক এক পাত্রের সঙ্গে। পাত্রের বয়স ছিল রবীন্দ্রনাথের কন্যার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন জামাতাকেই কয়েক সহস্র করে টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন। কন্যাদের তিনি স্কুল কলেজে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন নি। কবি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁকে নিজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বলে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই।

১৮৮৩ থেকে ১৯১০—এই সাতাশ বছরের শিক্ষিতা মহিলাদের তালিকা তৈরি করলে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ মহিলাই ছিলেন হিন্দুধর্ম বহির্ভূত। ঐ সময়ে মাত্র সাত জন এম. এ. পাশ করেছিলেন। মিস্ ভি. মুখার্জী, হৃদয়বালা বসু, রাজকুমারী দাস,

মার্গারেট গুপ্তা, চন্দ্রমুখী বোস, হেমপ্রভা বসু ও নির্মলা সোম—এঁরা সকলেই ছিলেন খৃষ্টান। শুধু হেমপ্রভা বসু ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বি. এ. পাশ ছিলেন তাঁরা হলেন : প্রিয়ম্বদা বাগচী, ইন্দিরা ঠাকুর, জীবনবালা দত্ত, সরলা ঘোষাল, কুমুদিনী খাস্তগীর, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, জ্যোতির্ময়ী দত্ত, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বাসন্তী মিত্র, কুমুদিনী মিত্র, শিশিরকুমারী বাগচী, প্রেমকুসুম সেন ও শশীবালা ব্যানার্জী। এঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুধর্ম বহির্ভূত ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রিয়তমা দত্ত, লীলা সিন্‌হা, এলেন চন্দ্র, ম্যাবেল সিংহ, রোসাবেল সিংহ, হৃদয়মোহিনী মিত্র, মেরী ব্যানার্জী, সুনীতি ঘোষ প্রমুখ—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খৃষ্টান। তবে সুপ্রভা গুপ্তা, শরৎ চক্রবর্তী, সুরবালা ঘোষ, সরলাবালা মিত্র, হিরন্ময়ী সেন, কমলা বসু, চারুবালা মণ্ডল, সুরবালা সিন্‌হা, রমা ভট্টাচার্য, বনলতা দে, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ, শোভনবালা রক্ষিত, বিভা রায়, শিশির কুমারী গুহ—এঁরা বি. এ. পাশ করা হিন্দু মহিলা ছিলেন। এই সময়ের পরিধিতে তিনজন মাত্র এম. এ. পাশ ডাক্তার ছিলেন। বিধুমুখী বসু, ভায়োলেট মিত্র ও রেচেন কোহেন—এঁরা তিনজনেই ছিলেন খৃষ্টান। একজন মাত্র L. M. পাশ করা মহিলা ছিলেন, যাঁর নাম যামিনী সেন। ইনিও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। [দ্রষ্টব্য Calcutta University Calender, 1911]

১৮৬৩ হতে ১৯০৫ — এই ৪২ বছরে যাঁরা লেখিকা ছিলেন, যাঁদের লেখা বাংলা পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ছিল উনআশি। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, দুজন খৃষ্টান, দুজন মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৪১ জন ছিলেন হিন্দু। সুতরাং একথা সত্য নয় যে, শত সহস্র বছর ধরে হিন্দু সমাজের নারী প্রগতি ও উন্নতি একইভাবে চলে আসছে। অনুরূপভাবে একথাও সত্য নয় যে মুসলিম নারী সমাজ শত সহস্র বছর ধরে এইরকম অনুন্নত এবং অবহেলিত। বরং সত্য তথ্য এটাই যে, হিন্দু নারী সমাজ ক্রমান্বয়ে যখন উন্নত হয়ে চলেছে, মুসলিম নারী সমাজের তখন হচ্ছে ক্রমাবনতি। এর পেছনেও আছে ঐতিহাসিক কারণ।

পুরুষ শাসিত সমাজে মুসলমান উপার্জনশীল পুরুষজাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই নারী সমাজও তাদের ছায়ার মত হয়ে উঠলো অনুন্নত, অশিক্ষিত ও সংস্কৃতি বিবর্জিত।

হজরত মহম্মদের [স] ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর থেকেই আরবদেশে শতকরা পঁচানব্বইজন মুসলিম মহিলা জ্ঞান রাখতেন তাঁদের মাতৃভাষায়। অর্থাৎ তাঁরা মাতৃভাষায় কোরআন পড়তে পারতেন। হজরতের কন্যা ফাতিমা, স্ত্রী খাদিজা ও আয়েশা [র] প্রমুখ মহিলাগণ শুধু শিক্ষিতাই নন, বরং ছিলেন বিদুষী। হজরত আয়েশা ছিলেন কবি, রাজনীতিবিদ্ এবং যুদ্ধ বিশারদ। এমনিভাবে হজরত হাফ্‌সা, হজরত খাওয়ালা প্রভৃতি

মহিলারাও শিক্ষিতা ছিলেন। শুধু আরবে নয়, তুরস্কেও হজরতের প্রভাবে শিক্ষার উন্নতি ছিল বর্ধমান। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় সেখানে মহিলা ডাক্তার ছিলেন সাত হাজার। ইরাকেও মুসলমান মহিলারা প্রায় পুরুষদের মত সর্ববিভাগেই অংশীদার ছিলেন। নির্বাচনে তাঁরা শুধু ভোটারই ছিলেন না, বরং নির্বাচিত প্রার্থীও হতেন। ম্যাডাম আহমাদ ফরিদ, ইসমত সিররী প্রমুখেরা ছিলেন বিখ্যাত ও শিক্ষিতা মহিলা। এমনিভাবে তুরস্কের নেজহী মোহিউদ্দিন খানুম শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। নাইগার, লায়লা ও পেরিসেক খানুমও এমনিভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইরানের কথা বলতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় এই কথা জেনে যে, ১৩১৬ খৃষ্টাব্দেও সেখানে ছিল 'লেডিজ এসোসিয়েশন'। তার সব সদস্যাই ছিলেন সুশিক্ষিত। [তথ্য : The Muslim Womenhood in Revolution : M. H. Zaidi, Calcutta 1937]

এমনিভাবে সিরিয়ার নাজুক বেহাম ছিলেন একজন শিক্ষিতা মহিলা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। চীনে যখন নারী ও পুরুষ সমাজ আফিমের নেশার ঘোরে বুঁদ হয়েছিল, মুসলমান সমাজ তখন এর থেকে মুক্ত ছিল। মুসলমান মহিলাদের একজনকেও তদানীন্তন পর্যটকরা নেশাগ্রস্ত দেখেন নি, বরং তাদেরকে উন্নত এবং শিক্ষিতই দেখেছিলেন। তিব্বতের মুসলিম মহিলারা শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না, বেকার না থেকে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের বড় বড় আমদানি রপ্তানির ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারতেন। [ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮]

মাইজিয়েন, রুহিজে এবং মাকসীদে—আলবানিয়ার এই তিনজন মহিলা এবং ইরানের খানম ইখতিয়ার আজম ও ডক্টর খাদিজা কেজাবার্জ যে অত্যন্ত শিক্ষিত ও উন্নতমনা ছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

মিশরে যুদ্ধের পূর্বে সমীক্ষকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানকার মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩,০০০ শুধু ছাত্রীই ছিল। সেটা বেড়ে পরে সংখ্যাটা তিনলাখে দাঁড়িয়েছিল। হিলমি পাশা, ফাউজিয়া, নাজলী বেগম, ফাইজি, ফাইকা, মিসেস ফরিদা এবং ফাতিহা—মিশরের এই সাতজন দেশবিখ্যাত শিক্ষিতা নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত। [পৃষ্ঠা ৮৯]

ভারতের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে চাঁদবিবি, রাজিয়া সুলতানা, নূরজাহান ও হজরতমহল বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা হিসাবে সর্বজনবিদিত। পণ্ডিত মহিলা সুগ্রা হুমায়ুন মির্জা ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং যশস্বী লেখিকা। আর একজন শিক্ষিতা মহিলা হলেন আশরাফুন্নিসা বেগম। মাইমুনা সুলতান শাহবানুও এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি পার্শী ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সুলতানা জাহান বেগম ছিলেন

বৃটিশের উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিতা মহিলা। বাই-আম্মা আবেদাবানু, রোকেয়া খাতুন, করিমুন্নিসা, নুরুন্নিসা, দৌলতুন্নিসা, হোসনে আরা বেগম, রাবিয়া সুলতানা, মাহবুবুন্নিসা, আফজালুন্নিসা, মিস বুরহান, মিস সঈদ, আবিদা লতিফ, মিস সরওয়ার করিমুল্লাহ ও কারিমা বেগম—এঁরা সকলেই ভারতীয় বিদূষী ছিলেন এবং ভারতে বৃটিশ বিরোধী রাজনীতিতে এঁদের উপস্থিতি থাকলেও ইতিহাসে তাঁদের করা হয়েছে অনুপস্থিত।

খাদিজা বেগম লন্ডনের ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং আটটি ভাষায় পন্ডিত একজন ভারতীয় মহিলা। হালিমা খাতুন, প্রফেসর খুরশিদারা বেগম, মিসেস জুম্মান খাঁন, মিসেস কাসেম আলি, মিসেস নাজরুদ্দিন এবং শিরীন—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিতা।

মিস জাকিয়াহ, রাজিয়া, বেগম এফ. এস. মুওয়ায়িদজাদা, মিসেস হাসিনা মুরশিদ—এঁরাও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত মহিলা বুদ্ধিজীবী।

মিসেস হাসিনা মুরশেদ ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়র। শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন অধ্যাপিকা। মিসেস আসিয়া হাসান ছিলেন লন্ডনের ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন বিদূষী। মিসেস ইকবালুন্নিসা ছিলেন বি.এ.পাশ এবং ডিপ. এড. [লিডস]। বিদুষীদের মধ্যে আরো ছিলেন সফুরা খানম, সাহেরা খাতুন, কাজী সদরুন্নিসা, মিসেস আমিনুল হক, সৈয়দা ফাতেমা, সৈয়েদা শাহজাদী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা, আক্কিকুন্নিসা, তৈয়েবুন্নিসা, কাজী লুতফুন্নিসা, হোসনে আরা, হোসনা বানু, রওশন আরা, লায়লা হক, মিস্ নূরজাহান, চিকিৎসক ডাঃ কে. এন. খানম, মিস্ জিন্নাত মুখতার, মিসেস হিজাব ইমতিয়াজ, মমতাজ জাহান, মিস্ জাফর আলী, মিস্ বিরজিস আবদুল্লা, বিবি মুলুক, মিস্ শিরীন সুজাত আলী, মিসেস হিলালী, মিসেস রহীম, এডিনবার্গের ডিগ্রীপ্রাপ্ত শল্যচিকিৎসক কুমারী মাহমুদা, মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

ভারতের নেতৃস্থানীয়া শিক্ষিত মহিলাদের অনেকের মধ্যে আরো আছেন যেমন পাটনার লেডী ইমাম, মহীশূরের লেডী মির্জা ইসমাঈল, ডঃ মিস্ সিরাজুদ্দিন এম.এ., পি-এইচ. ডি., ইঞ্জিনিয়র মিস্ আগা মুসতাফা খাঁন, লেডী মহম্মদ শফী, মহিলা উকিল মুওয়াইদজাদা সকিনা ফারুক সুলতান, বেগম মীর আমীরুদ্দিন, লেডি আব্বাস আলি বেগ, মিসেস কাসেম আলি, মাদ্রাজের হাসুরুন্নিসা বেগম এম.এ., লেডি করিমভৈ, উকিল মিসেস হামিদা মোমেন, লক্ষ্ণৌর ওয়াসিম বেগম, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট বেগম হবিবুল্লা, লন্ডন থেকে পাশ করা ব্যারিষ্টার বেগম এম.এ. ফারুকী প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের আরো বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন লেখিকা ও পত্রিকা সম্পাদিকা রোকেয়া মুওয়াইদজাদা কমর সুলতান, অর্থনীতি ও আরবীতে এম.এ. সৈয়েদা ফাতেমা খাতুন, নাজমুন্নিসা খাতুন, কুমারী জাকিয়াহ মনসুর—বি.এ.বি.টি., বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ।

খানম ইখতিয়ার আজম

ডঃ খাদিজা কেজাবার্জ

ফাউজিয়া

নাজলী বেগম

মিসেস ফরিদ

মিসেস হাসিনা মুরশিদ

শামসুন্নাহার মাহমুদ

মিসেস আসিয়া হাসান

মিসেস ইকবালুন্নিসা

নাহরিন জান্নাত জুবিলী
রোমিতা আহমেদ
রাবেয়া বেগম রুবী
মরিয়ম রহমান
মোহসিনা আকবর
সৈয়দা শামসুন্নাহার জামী

ভারতের আরও কিছু খ্যাতনামা মহিলাদের মধ্যে আছেন বেগম শাহনাওয়াজ, আতিয়া বেগম, লেডি আব্দুল কাদির, বেগম হামিদ আলি, 'হার হাইনেস' উপাধিপ্রাপ্তা দুররে শেহবার, 'হার রয়াল হাইনেস' প্রিন্সেস্ নিলুফার, ইউরোপ পর্যটনকারী 'হার হাইনেস' বেগম রামপুরী, 'হার হাইনেস' ভূপালের বেগম সাহেবা, 'হার হাইনেস' মন্ডির রাণীসাহেবা, সাহেবজাদী নসিফুন্নিসা বেগম, 'হার হাইনেস' কারওয়াই'র বেগম সাহেবা প্রমুখ।

মাফরূহা চৌধুরী, কাজী লতিফা হক, জুবাইদা গুলশন আরা, সৈয়দা লুতফুন্নিসা, জেবুন্নিসা জামাল, হামিদা হাফেজ, সৈয়দা কানিজ ফাতিমা হোসেন বুলবুল, শেরিফা নারগিস আখতার রেখা, আখতার বানু বেলা, আলেয়া ফেরদৌসী, অধ্যাপিকা সাহেরা খাতুন, সালমা শহীদ চৌধুরী, দিল আফরোজ ছবি, শাহানা বেগম মলি, আসুরা খাতুন, লায়লা বিলকিস বানু, মাহবুবা সুলতানা, ফ্লোরা নাসরীন খান, মাহবুবা করিম, লিন্ডা রহমান, রেশমী আহমেদ রাসু, চৌধুরী মাহমুদা মইন, নাসিমুন্নেসা নাসিম, ফরিদা আখতার খান, খোশনূর আলমগীর, সুরাইয়া চৌধুরী, কামরুন্নাজ সিদ্দীকা, সাবেরা শহীদ হাই, সৈয়দা মালেকা আকবরী, রীনা ইয়াসমিন খাঁন, নাসরিন মাহমুদ, সাহিদা আহমদ, মাহমুদ সুলতানা, নুরুন্নিসা, নাহরিন জান্নাত জুবিলী, রোমিতা আহমেদ, রাবেয়া বেগম রুবী, মরিয়ম রহমান, মোহসিনা আকবর, সৈয়দা শামসুননাহার জামী এঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলা।

আজকের বাংলাদেশ নেত্রী শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং পাকিস্তান নেত্রী বেনজির ভুট্টোকে দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে, মুসলমানরা জাগতে শুরু করেছে অমুসলিমদের প্রভাবে। বরং সারা পৃথিবীর মহিলা সমাজের স্বাধীনতা, অধিকার, শিক্ষা ও চেতনার নেপথ্যে রয়েছে মুসলিম তথা ইসলামী সভ্যতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। কারণ হজরত মহম্মদ [স.] আসার পর প্রত্যেকটি দেশেই কোরআন এবং হাদীসের নির্দেশমত শুধু পুরুষরাই শিক্ষিত হন নি, মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না; ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে, বঞ্চিত হয়েছে শিক্ষা এবং উন্নতির আলো থেকে।

ছবি : সাওগাত, The Islamic Review, মোহাম্মদী এবং Royal Indians-এর সৌজন্যে।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী

পূর্বে হিন্দু বুদ্ধিজীবী সৃষ্টিকরণ, তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সম্মান ও উপাধিপ্রাপ্তির দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে; যেটা পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা গেলেন কোথায়? এর সঠিক উত্তর এটাই যে, সরকার তার প্রশাসনিক প্রভাব ও ক্ষমতায় তাদের তৈরি করা ঐ বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরি হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবেই।

হিন্দু বুদ্ধিজীবী তথা 'রাজা' 'মহারাজা' 'বাবু সমাজ' এবং উপাধিপ্রাপ্ত সহযোগীদল যখন সংখ্যায় বেড়ে গেল তখন তাঁদের প্রাপ্তিযোগে সৃষ্টি হোল সঙ্কট। ফলে বৃটিশের শোষণ ও ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা এবং সেই পরিমাণে কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রী পাচার হওয়ার 'ড্রেন থিওরী' তাঁদের কাছে অসহনীয় হতে লাগলো এত দিনে। এই অবস্থা যদি পূর্বেই সৃষ্টি হোত তাহলে মিলিত হিন্দু মুসলমান যুগ্মশক্তিতে বিতাড়িত করতে পারা যেত বৃটিশকে, ভারতবর্ষ রক্ষা পেত প্রচন্ড 'পাচারপর্ব' থেকে এবং মুসলমানদের অর্থনৈতিক পতন ও সেইসঙ্গে তাদের পাঁচ লক্ষের মত মানুষ নিহত হওয়া থেকে রেহাই পেত হয়ত। সবচেয়ে বড়কথা হচ্ছে, এই দুই ক্ষমতা একত্রিত হলে মুসলিম ও হিন্দু বুদ্ধিজীবী পাশাপাশি বেঁচে থাকতো উল্লেখযোগ্যভাবে।

নতুন উদ্ভূত শিক্ষিত হিন্দু সমাজের এই বিরোধিতা লক্ষ্য করে বৃটিশের শুরু হোল নতুন হৃদকম্প। প্রচন্ড বুদ্ধিসম্পন্ন বৃটিশ অঙ্ক কষে দেখে নিল যে সংখ্যালঘু সমগ্র মুসলিম সমাজের বিরোধিতার সঙ্গে যদি সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের বিরোধিতা এক হয়ে যায় তাহলে তাদের শোষণ শাসন জান মাল ইজ্জত সম্মান সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তাই শুরু হোল আর এক নতুন খেলা।

মুসলিম সমাজকে বঞ্চিত করে হিন্দু সমাজের প্রতি যেমন সীমাহীন ঢালাও করুণা [?] বর্ষণ শুরু হয়েছিল সেই 'করুণা' বর্ষণ শুরু হোল মুসলিম জাতির প্রতি। সিদ্ধান্ত হোল এখন থেকে মুসলিম জাতিকে তোষণ পোষণ করে, তাদের সুযোগ সুবিধা, নতুন নতুন পদ ও উপাধি দিয়ে তুলে ধরতে হবে পাতাল থেকে উপরে। আর পুরনো পদ্ধতিতে এই নতুন মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে তাদেরকে করতে হবে বঞ্চিত, অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত। আলিগড় আন্দোলন বা সৈয়দ আহ্মাদের সময় থেকে মোটামুটিভাবে এই বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছিল বলা যায়। ফলস্বরূপ ১৭৫৭'র পর থেকেই যে মুসলমান জাতিকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল, মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরি করার পর বৃটিশ তাদেরকে কিছু চাকরি ও সুযোগ সুবিধা দেয় দেশত্যাগের প্রাক্কালে। এটুকুও কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজনেই করেছিল।

সৈয়দ আহ্মাদঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৯৮-এ মৃত্যু হয় তাঁর। চার বছর ধরে তিনি ছিলেন 'বড়লাটের শাসন পরিষদ'-এর অতিরিক্ত সদস্য। তাঁকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ। বৃটিশের সহযোগিতায় একটা সাধারণ মাদ্রাসা থেকে আলিগড়ের কলেজ [Anglo Oriental College] এবং শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ঐ প্রতিষ্ঠান রূপ নেয় আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হতে বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধ, আন্দোলন, বিপ্লব ও বিদ্রোহ প্রায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চালিয়ে মুসলিমদের একদিকে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির অবলুপ্তি ঘটেছিল অন্যদিকে সমগ্র মুসলমান জাতি বৃটিশ বিরোধী বা রাজদ্রোহীরূপে চিহ্নিত হয়। ফলে মুসলিম জাতির 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণী' বলতে যেটা বোঝায় সেটার সৃষ্টি ও বিকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—এটা অত্যুক্তি নয়। সৈয়দ আহ্মাদ স্বয়ং মুসলিম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, পরিচালক ও সহযোগীদের নিয়ে গ্রহণ করলেন বিশাল পদক্ষেপ—ঐ প্রতিষ্ঠানে এমন একটি মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইলেন যাঁরা বৃটিশ-বিরোধী না হয়ে হবেন নব্য বাবু সমাজের মত বৃটিশ সহযোগী এবং প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় ভারতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে তাঁদের। সৈয়দ আহ্মাদের পিছনে ছিল বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগ। সার্থক হয়েছিল তাঁর পদক্ষেপ, পরিপূর্ণ হয়েছিল বৃটিশের পরিকল্পনা। সুতরাং তিনিও পেয়েছিলেন বিখ্যাত উপাধি 'স্যার' এবং K.C.S.I. [Knight Commander of the Star of India] উপাধি।

সৈয়দ আহ্মাদ

মহম্মদ আলি জিন্নাহঃ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯৪৮-এ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসের পর সম্পর্ক ছেদ করেন কংগ্রেসের সঙ্গে। তিনি প্রথমে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক নেতা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ছিল তাঁর স্বপ্ন। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁকে বলতেন 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত'। ইংরাজীতে বলা হোত 'Ambassodor of Hindu-Muslim Unity'। বিলেতে পাশ করা বিখ্যাত ঐ ব্যারিস্টার টোপ গিললেন বৃটিশের। 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' খাড়া করে দাবি করলেন

পাকিস্তানের। কয়েক কোটি মানুষ বুঝে গেল হিন্দু-মুসলমান পৃথক পৃথক সম্প্রদায়, তারা যেন পৃথক পৃথক জীব। ভারত হয়ে গেল বিভাজিত। তৈরি হোল পাকিস্তান। এসবই বৃটিশ ব্রেনের বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছু নয়।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্

মহম্মদ ইকবাল ঃ ১৮৭৬ এবং ১৯৩৮ হোল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। তাঁর জন্মস্থান ছিল শিয়ালকোট। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে ওরিয়েন্টাল কলেজের ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক হয়েছিলেন তিনি। সরকারের বাছাই করা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য। গিয়ে পৌছালেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে পুনরায় M.A. করলেন দর্শন শাস্ত্রে। চলে গেলেন জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে Ph.D. করলেন। আবার লন্ডনে এসে ব্যারিষ্টার হলেন। ভারতে 'হিরো' করার প্রয়োজনে তাঁকে করে দেওয়া হল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ঘুরে এসে লাহোর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করতেলাগলেন তিনি। পরে যুক্ত হলেন 'মুসলিম লীগ' এর সঙ্গে। এলাহাবাদের 'লীগ অধিবেশনে' তিনিই

মহম্মদ ইকবাল

প্রথম পেশ করেন 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' এবং তিনিই ছিলেন ঐ অধিবেশনের সভাপতি। তাঁর 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' জিন্নাহ সাহেবের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। ইকবাল প্রস্তাবিত ঐ 'বীজ' বিলেত হতে আমদানি বলে আধুনিক গবেষকরা বিশ্বাস করেন অনেকেই। 'আসরারী খুদি' নামে বিখ্যাত কাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধ হন তিনি। ডঃ নিকলসন করেছিলেন সেটার ইংরাজী অনুবাদ। মহঃ ইকবালও পেয়েছিলেন বৃটিশের দেওয়া 'স্যার' উপাধি।

মহম্মদ শাহ্ আগা খাঁ ঃ জন্ম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। বাড়ি ছিল বর্তমান পাকিস্তানের করাচি। পিতা হোসেন আলি এসেছিলেন পারস্য থেকে। তিনি ছিলেন বৃটিশের প্রথম সারির সহযোগী। আফগান যুদ্ধে বৃটিশের বিপদে ও সিন্ধু বিদ্রোহে ভারতীয়দের আক্রমণে বিপদগ্রস্ত ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করেছিলেন ঐ বৃটিশপ্রেমী। তিনি ছিলেন এক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তাঁর প্রধান ব্যবসা ছিল ঘোড়ার রেস। বৃটিশের চক্রান্তে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, আলিগড় ইউনিভার্সিটি সৃষ্টির পূর্বে, আলিগড় কলেজের উন্নতিকল্পে দিল্লিতে যে অধিবেশন বসেছিল তার সভাপতি হয়েছিলেন তিনিই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'মুসলিম লীগ'-এর প্রতিষ্ঠালগ্নে যাঁরা ছিলেন সক্রিয় ভারপ্রাপ্ত কর্মী আগা খাঁ তাঁদের

আগা খাঁ

একজন শ্রেষ্ঠতর উদ্যোক্তা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে গিয়েছিলেন দায়িত্ববান সদস্য হিসাবে। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'স্যার' এবং একটি বিশেষ উপাধি 'His Highness' [হিজ হাইনেস]।

এম. এ. আনসারী ঃ ১৮৮০-তেজন্মগ্রহণ করে পরলোকযাত্রা করেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। জন্মস্থান ছিল বিহারের গাজীপুর। ইংলন্ডের এডিনবার্গ হতে M.B. ও C.H.B. পাশ করেন তিনি। ১৯২০-তে 'মুসলিম লীগ'-এর সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৭-এ হন মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর জনপ্রিয়তা ও যোগ্যতা চোখে পড়ে বৃটিশ সরকারের।

এম. এ. আনসারী

তারা বুঝেছিল ক্রীতদাসের মত পূর্ণ দালালি করানো যাবেনা তাঁকে দিয়ে। সুতরাং ভেঙে

গিয়েছিল তাঁর উন্নতির মই। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দুবার ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে কারাদন্ড।

ওয়াজেদ আলী ঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মারা যান ১৯৫৬-তে। হুগলী জেলার তাজপুরে বাড়ি ছিল তাঁর। বৃটিশ সরকারের সহযোগী ছিলেন তিনি। বিলেতে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলেন স্বদেশে। কলকাতা হাইকোর্টে শুরু করলেন আইনব্যবসা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁকে করে দেওয়া হোল প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকে দিয়ে আরও মুসলমান বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির কথা ব্রিটিশ ভাবে। সেই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পুরনো ইতিহাস স্মরণ করিয়ে উৎসাহ দেওয়ার উপযুক্ত বই সৃষ্টিতে লিখলেন 'ইরান-তুরানের গল্প', 'গ্রানাডার শেষ বীর', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোওয়া' ও 'গুলদস্তা' প্রভৃতি। তাঁকেও সরকার দিয়েছিল বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি।

খাজা আব্দুল গনি ঃ ১৮৩০ ও ১৮৯৬ হোল যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ। বড় ধনী ব্যবসায়ী এবং ছিলেন বৃটিশের একান্ত সহযোগী। তাই বৃটিশ সরকার তাঁকেও দিয়েছিল 'নবাব বাহাদুর' উপাধি।

আব্দুল লতিফ ঃ ১৮২৮-১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। ফরিদপুর জেলায় বাড়ি ছিল তাঁর। সরকার পরিচালিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী ছিলেন তিনি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'-র সদস্যও হয়েছিলেন। কলকাতায় শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন 'Mohamedan Literary Society'। পরে ভূপালের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সরকার সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকেও দিয়েছিল 'স্যার' ও 'নবাব বাহাদুর' উপাধি।

আব্দুল লতিফ

সৈয়দ আমীর আলি ঃ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় তাঁর। বাড়ি ছিল হুগলী জেলার চুঁচুড়া। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল। সরকারি বৃত্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইংলন্ডে। সেখানে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন কলকাতায়। সরকারের সুনজরে পড়ে তিনি সদস্য হয়ে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ঐ মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে করে দেওয়া হোল কলকাতা

হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি। উন্নতির কাঁটা শেষপ্রান্তে ঠেকে তিনি হয়ে গেলেন কলকাতা হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতি। তাঁকেও একটা বিশেষ উপাধি, যেটা প্রথম সারির সহযোগী ও স্তাবকরা পেয়ে থাকেন, C.I.E. দেওয়া হয়েছিল। সরকারের উৎসাহ ও ইঙ্গিতে যে গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন তাতে থেঁতলে যাওয়া বা চাপা পড়া মুসলিম সমাজ যেন নতুন করে জানতে পারল যে, তারা অখ্যাত নয়, তারা সকলের সেরা। শুধু তাই নয়, তারা আরও জানলো, তাদের প্রভাব শুধু ভারতে নয় বরং সারা বিশ্বে। তিনি 'পরহেজগার' বা নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন সে প্রমাণের অভাব আছে যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো যেভাবে পরিপুষ্ট ঐ রকমভাবে লেখা ইসলামধর্ম বিশারদ সকল দিকপালের পক্ষেও সহজ নয়। ঐ বইগুলোতে আর একটি জিনিস জানানো হয়েছে, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির উপরে থাকতে পারেনা কোন কিছুই। আধুনিক গবেষকদের মতে তাঁর লেখনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ইসলামধর্ম বিশারদ স্যার মহঃ ইকবাল এবং প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ E.G.Brown। বইগুলো হোল 'The Spirit of Islam', 'History of Sarasen', 'Ethics of Islam' ও 'Mohammedan Law'। 'প্রিভি কাউন্সিল'-এর সভ্য হওয়ার পর আবার ইংলন্ডে যান তিনি। তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত 'স্যার' উপাধি। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন ইংলন্ডেই।

খাজা আসানুল্লাহ্ ঃ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯০১-এ। বংশগতভাবেই তিনি ছিলেন বৃটিশ-ভক্ত। বৃটিশের হাত মজবুত করতে সেই বাজারে তিনি সরকারকে দিয়েছিলেন ১১ লক্ষেরও বেশি টাকা। অনেক সরকারি সহযোগ ও সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে পেয়েছিলেন 'নবাব' উপাধিও।

মহঃ রহিমতুল্লা সায়ানী ঃ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মে মারা যান ১৯০২-এ। তিনি ছিলেন M.A. পাশ মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও কংগ্রেস কর্মী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি হয়েছিলেন প্রথম মুসলিম 'শেরীফ'। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি। ওই কংগ্রেস সমিতিতে মুসলমানদের আরো বেশি যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মহম্মদ সফি ঃ তিনি ছিলেন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ। বাড়ি ছিল লাহোরে। ১৮৯২-এ ব্যারিষ্টার হয়ে ১৯১১-তে তিনি হয়েছিলেন 'ব্যবস্থা পরিষদে'র সদস্য। ১৯১৯-এ তিনি পেয়েছিলেন সরকারের 'শিক্ষা সচিব'-এর পদ। 'কার্যনির্বাহক কমিটি'-র সদস্যপদও পেয়েছিলেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠায় বড় মাপের উদ্যোগ ছিল তাঁর। লক্ষ্ণৌতে 'মুসলিম লীগ'-এর যে সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন তিনিই।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেলেও কিছু সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবীর আলোচনা করা হচ্ছে মাত্র। উদ্দেশ্য জীবনী লেখা নয়, উদ্দেশ্য একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করা।

আরো যাঁরা 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন সেকেন্দার হায়াত, আব্দুল কাদের, ফজলে হোসেন, ফিরোজ খাঁন নূ-ন, সলিমুল্লাহ, লেঃ কর্নেল ডাঃ হাসান সোহরাবর্দী, আব্দুস সামাদ খাঁন রামপুরী, জুলফিকার আলি খাঁন [C.S.I.], মির্জা মহঃ ইসমাঈল K.C.I.E., এস. এম. সুলাইমান—এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, আব্দুল হালিম গজনবী, আব্দুল করিম গজনবী, আকবর হায়দারী প্রমুখ।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী দলে আরো যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন ব্যারিষ্টার আব্দুল হালিম, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল করিম খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল কাদের, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল ওহাব খাঁন বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবুল হাসান খাঁন, প্রফেসর আবুল খায়ের, খাঁন বাহাদুর কাজী সৈয়দ আহমাদ, বাহাদুর আমানতদ্দৌলা, খাঁন বাহাদুর ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর হোসেন, 'প্রিন্স' উপাধিপ্রাপ্ত আসমতজাহ বাহাদুর, 'প্রিন্স' বসিরউদ্দিন, ডঃ বজলুর রহমান, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ফজলুল করিম খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ফয়জুদ্দিন হোসেন খাঁন বাহাদুর, হামিদ বখত্ খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইকরাম রসুল খাঁন বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর কমরউদ্দিন, প্রিন্স কমর কাদের, ম্যাজিষ্ট্রেট কুদরতুল্লাহ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মজিদ বখত্ খাঁন বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর মোস্তাফা হোসেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ খাঁন বাহাদুর, ব্যারিষ্টার সৈয়দ নুরুল হুদা, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাজুল হক খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ ওবাইদুল্লা খাঁন বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ সুবহান হায়দার খাঁন বাহাদুর, অধ্যাপক আব্দুল কাদের, খাঁন বাহাদুর নজিরউদ্দীন প্রমুখ।

বাঙালী মুসলিম যাঁরা বৃটিশের দেওয়া C.I.E. উপাধি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বখতিয়ার শাহ, খাঁন বাহাদুর আব্দুল জব্বার, নবাব বাহাদুর আহসানুল্লাহ, সৈয়দ আমীর আলী, খাঁন বাহাদুর আব্দুল লতিফ অন্যতম। K.C.I.E., K.C.S.I., C.S.I., নবাব, নবাবজাদা, খাঁনসাহেব, শামসুল উলামা, কায়সারে হিন্দ, অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইন্ডিয়া, অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডয়া প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত প্রচুর ভারতীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীও তৈরি হয়ে গেল সহজভাবে, ঠিক যেমনভাবে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা হয়েছিল।

এইবার মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হলেন অনেক লেখক, প্রকাশ পেল অনেক পত্র পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকা। বাঙালীদের মধ্যে লেখালেখিতে ও মুসলিম জাতির উন্নতির জন্য যাঁরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাজী ইমদাদুল হক, শেখ

রহিমতুল্লা সায়ানী · ফজলে হোসেন · এস. এম. সুলাইমান

আকবর হায়দারী · কাজী ইমদাদুল হক · শেখ মহঃ জমিরুদ্দিন

আব্দুল করিম · শেখ ফজলুল করিম · শেখ আব্দুর রহিম
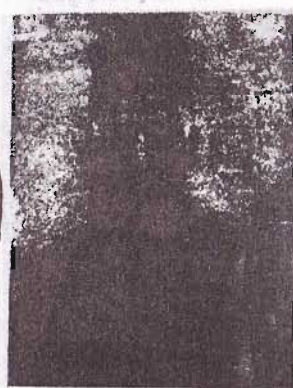
মহম্মদ জমিরুদ্দিন, সাহিত্য বিশারদ আব্দুল করিম, শেখ ফজলুল করিম, শেখ আব্দুর রহিম, বিখ্যাত কবি কায়কোবাদ, সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন, সংগঠক আব্দুর রসুল, আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হুদা, আব্দুল আজীজ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আব্দুস সালাম, হেমায়েতউদ্দীন আহমাদ, সৈয়দ আমীর আলী, খোন্দকার ফজলে রব্বি, ওবাইদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, নবাব আব্দুল লতিফ, আবুল হাশিম, হাফিজ মাহমুদ আলী খাঁন পন্নী, আলি নওয়াব চৌধুরী, সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী অন্যতম। এখানে প্রসঙ্গত বিখ্যাত চারণকবি শেখ গুমহানির নামও উল্লেখ করা যায়। এঁদের দুলর্বভ চিত্র দেওয়া হোল। এছাড়া বুদ্ধিজীবী মহিলা যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে; তাঁদের অনেকের ছবিও দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরির কাজে বৃটিশ আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলো উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। কারণ তারা তাদের দূরদর্শিতায় উপলব্ধি করতে পারছিল যে, হিন্দু বুদ্ধিজীবী তৈরির কাজে তারা সফল—তবে চাকরি এবং সুযোগ সুবিধা সীমিত হওয়ায় তাদের সকলকে খুশী করা যাচ্ছিল না। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় তখনো অনেক নগণ্য—অথচ নেতৃত্বের দিক থেকে সমাজে তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। ব্রিটিশ তাই মুসলিমদের তোষণ শুরু করলে ১৯৪৭ অর্থাৎ ভারত-স্বাধীনতার [?] প্রাক্কালে অমুসলিমরা অনেকেই ভেবেছিলেন,.এই মুসলিম জাতি ব্রিটিশের সহযোগী—স্বাধীনতা বিরোধী। কিন্তু ঘটনা তা নয়। যাঁরা স্যার, নবাব বাহাদুর, হিজ হাইনেস ইত্যাদি উপাধি পাচ্ছিলেন মুষ্টিমেয় তাঁরা ব্রিটিশপ্রেমী হলেও গোটা মুসলিম জাতি কিন্তু তা ছিল না; তারা চরমভাবে ব্রিটিশ বিরোধীই ছিল এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই তাদের বিপ্লব ছিল ধারাবহিক। ৯০ বছর পূর্বে, ১৮৫৭-তেই ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতো, এবং এই ভারত আরো সমৃদ্ধিশালী থাকতো যদি ঐ সব দেশীয় হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও দালাল সম্প্রদায় ঐ বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করতো।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই মুসলমান দলন বা দমন শুরু হয়েছিল। মুসলমানদেরকে সহ্য করতে হয়েছে অভাব, সম্মানহানির বেদনা, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার হতাশা, বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের করুণ দৃশ্য, লঘু পাপে গুরুদন্ডপ্রাপ্তির যন্ত্রণা ইত্যাদি। কয়েকশো বছর এই যন্ত্রণার স্টীমরোলার সহ্য করে গেছে সমগ্র মুসলিম জাতি—তখন অমুসলিম সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে এমন তথ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মুসলিম বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করার শুরু, অর্থাৎ আলিগড় আন্দোলন থেকে মুসলমানদের তোষণ ও পোষণ আরম্ভ হোল। খোলা কথায় বলতে গেলে যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের যেমন

করা হয়েছে উপেক্ষা অনাদর অপমানিত ও লাঞ্ছিত—এবারে ঐ একই পালা আরম্ভ হোল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি। এখনকার তুলনায় তখন শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক কম ছিল। ঐ হিন্দু সম্প্রদায় এই পরিস্থিতিতে ভাবতে শুরু করলো যে, মুসলমান জাতি শত শত বছর ধরেই বুঝি বৃটিশের অনুগত, স্বাধীনতা বিরোধী—সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা চাকরি বোধহয় তাই এইভাবেই পেয়ে আসছে তারা; তারাই আমাদের শত্রু, আমাদের বিরোধী, আমাদের উন্নতির পথের কাঁটা। আর এই ধারণা খুব প্রাচীন নয়, এর বয়স ১০০ বছর। মাত্র এক পুরুষ আগের এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্তমান প্রজন্মকে—সেই সঙ্গে মাত্রা যোগ করেছে মিথ্যা ইতিহাস। বৃটিশের বিভাজন নীতির এই চক্রান্ত তাই আজ চরম আকার ধারণ করেছে।

১৭৫৭ থেকে মুসলমানদের লড়াইয়ে যেমন আশানুরূপভাবে হিন্দু সম্প্রদায় সহযোগিতা করেনি, সেই প্রতিশোধ নিতে কংগ্রেস আন্দোলন তথা হিন্দু আন্দোলনে

৪ঠা অগস্ট ১৯৪৭। ক্ষমতা হস্তান্তরে আরও ১১ দিন বাকী ঃ
আলোচনারত মাউন্ট ব্যাটেনকে দেখা যাচ্ছে দলবলসহ।

হতভাগ্য মুসলিম সমাজ বা মুসলিম বুদ্ধিজীবীর বড় একটি অংশ যোগ তো দেয়ই নি, বরং বিরোধিতা করেছে বলা যায়। এরই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগ। তারপরেই বৃটিশদের ইচ্ছাকৃতভাবে চলে যাবার সময় হয়; শক্তির হস্তান্তর ঘটিয়ে তাদের প্রত্যাগমনের নামই আজকের 'স্বাধীনতা'।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা হোল যে, কয়েকশো বছরের ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরা হোলনা অথচ কয়েক বছরের ইতিহাসকে চর্বিতচর্বণ করে প্রচার করা হচ্ছে যে, মুসলমানেরাই সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান, তারাই করেছে ভারত বিভাগ।

হিন্দু নেতাদের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হলেও মুসলমান সেই

ডাকে কেন সাড়া দেয়নি তার দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে বৃটিশকে অসন্তুষ্ট করার অনিচ্ছা—সেটা ছিল প্রতিশোধমূলক। দ্বিতীয় কারণটি হোল, তাদের ধারণা ছিল যে হিন্দুদের এই আহ্বান আন্তরিকতাশূন্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—''আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহবোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না।''

কবিগুরু আরও বলেন, ''স্বদেশীযুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চৈস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদকণ্ঠে সাড়া দিল না, তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না ..... । বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'' তিনি অন্যত্র এও বলেছেন, ''খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেদের বেড়া তুলে রেখেছে।''

ইতিহাস বিলুপ্তির অপচেষ্টা

ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টির উৎসে মুসলিম অবদান অনস্বীকার্য হলেও এবং পরের যুগে অমুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুসলিমদের অনুসরণ করলেও একটি বিষয়ে তাঁরা নতুনত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন—সেটা হচ্ছে ছবির সংযোজন।

মানুষ এবং জীবজন্তুর ছবি অঙ্কনে হজরত মহম্মদের [স.] পক্ষ হতে বিশেষ আপত্তি বিদ্যমান। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে পরিণতিতে যাতে মূর্তিপূজা ইসলামধর্মে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী চিন্তাবিদেরা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শিথিল করায় পাসপোর্ট, চাকরি, পরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছবি বহুল পরিমাণে গৃহীত ও প্রচলিত। মুসলিম রাজা বাদশাহ ও রাষ্ট্রনায়কেরা শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে একটু আধটু চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা না করলে যেটুকু ছবি পাওয়া গেছে তাও থাকতো না—ফলে তাঁদের অস্তিত্ব কল্পনা করাই হোত এক কঠিন সমস্যা।

ক্ষুদিরাম বসু, ভগত সিং, মাতঙ্গিনী হাজরা, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি ছবিগুলোর পাশে অহিন্দু নেতা নেত্রীদেরও ছবি থাকলে একদল বিশেষজ্ঞের মতে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেটা হোত পরম প্রাপ্তি ও চরম কল্যাণ।

ফাঁসি হওয়া আসফাকউল্লাহ, শের আলী, হাফেজ গোলাম মাসুমের ছবি এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রক্তাক্ত দেহে প্রাণ দেওয়া আহমাদুল্লাহ, মজনুশাহ, টিপু সুলতান, বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ, আজিমুল্লাহ'র ছবি উপস্থিত থাকলে মুসলিম জাতির সহজ মূল্যায়নে সুবিধা হোত নিঃসন্দেহে। এমনিভাবে 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের' প্রথম প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক বরকতুল্লাহ ও রাষ্ট্রপতি শ্রী মহেন্দ্রপ্রতাপ, প্রাণদাতা নবাব মীরকাশিম, প্রাণদাতা লড়াকু নেতা নিসার আলী, ২৫ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত এবং কারাগারেই নিহত ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, সর্বভারতীয় বিপ্লবী নেতা সাইফুদ্দিন কিচলু, আসফ আলি এবং বৃটিশের চিরশত্রু হায়দার আলির ছবি সহজলভ্য হলে আজ ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন ও গবেষণায় সুবিধে হোত অনেক।

রক্তদাত্রী মাতঙ্গিনী হাজরার ছবির পাশে বিপ্লবী মহিলা হজরতমহল, লড়াকু প্রাণ দেওয়া নেত্রী নুরুন্নিসা, বিখ্যাত নেত্রী অরুণা গাঙ্গুলীর ইতিহাস ও ছবি সহজলভ্য হলে অনুসন্ধিৎসুদের সুবিধা হোত অবশ্যই। সিংহপুত্র-প্রসবিনী বিপ্লবী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের বীরমাতা বাই-আম্মা বা আবিদা বিবির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পর্দা' রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম বিপ্লবী ও শহীদ নারীদের নাম বিশেষভাবে অনুল্লিখিত। তাঁরা যেভাবে নির্যাতিতা লাঞ্ছিতা ও চাবুকের প্রহারে প্রহৃতা তা উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর।

ক্ষুদিরাম

ভগত সিং

মাতঙ্গিনী হাজরা

লক্ষ্মীবাঈ

আসফাকউল্লাহ

শের আলী

গোলাম মাসুম

আহমদুল্লাহ

মজনু শাহ

টিপু সুলতান

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী

আজিমুল্লাহ খাঁন

অধ্যাপক বরকতুল্লাহ

মহেন্দ্রপ্রতাপ

নিসার আলী

ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী

ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু

হায়দার আলী

হজরতমহল

নুরুন্নিসা

অরুণা আসফ আলি

আবেদাবানু

মহিলাকে চাবুকের প্রহার

অসত্য দুর্নাম-নিক্ষিপ্ত বৃদ্ধ বাহাদুরশাহের সত্য ইতিহাস দুর্লভ হওয়া কল্যাণের নয়, বরং অকল্যাণকর। গান্ধীজীকে যিনি রাজনীতিতে আমদানি করলেন, তদানীন্তন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত সেই মৌলানা মহম্মদ আলী এবং তাঁর সহোদর মৌলানা শওকত আলীর ছবি ও ইতিহাস সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি আজও। কবি রবীন্দ্রনাথের পাশে কলমযোদ্ধা, সর্বভারতীয় খ্যাতিপ্রাপ্ত কবি মীর্জা গালিব বিখ্যাত হয়েও আজ অখ্যাত। গালিব উদাহরণ মাত্র; ঐ রকম বহু কলমযোদ্ধার নাম আজ হারিয়ে গেছে যাঁরা একদিকে বিপ্লবীদেরকে করেছেন উৎসাহিত আর অপরদিকে বৃটিশের সঙ্গে চালিয়েছেন আপোসহীন সংগ্রাম।

বৃটিশের সঙ্গে সহ অবস্থানে শুধু খানিকটা পদ, ক্ষমতা ও সম্মান পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কংগ্রেস দল ভিক্ষা করে এসেছিল মাত্র স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ, ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা হোমরুল প্রভৃতি। ১৯২১-এ কংগ্রেসের আমেদাবাদ সভায় যে মহান নেতা সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং এই অন্যায় [?] মন্তব্যের জন্য গান্ধীর ধমকানি খেতে হয়েছিল যাঁকে সেই মৌলানা হসরত মোহানির নাম তলিয়ে দেওয়া বা চাপা দেওয়া অকল্যাণকর।

ভারত ভাগে নেহরুর সমর্থন

ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করা হয়েছে মুসলমান জাতিকেই। কিন্তু বৃটিশ নেতারা যখন কংগ্রেসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন দেশ বিভাগে তাঁদের সম্মতি আছে কিনা—তাতে কংগ্রেসের মহান নেতাদের হস্ত উত্তোলন বিস্ময়কর। ভারতের প্রথম ও আজীবন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুও ছিলেন দেশ বিভাগের অন্যতম সমর্থক। ঐ সভায় তিনি হাত তুলে দেশভাগের যে সম্মতি জানিয়েছিলেন ইতিহাস হয়ে আছে তার সাক্ষী। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহরু, গান্ধীজী, কৃষ্ণমেনন, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজা গোপালাচারী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মহান নেতাদের বিরোধিতা থাকলে দেশ বিভাগ সম্ভব ছিল না মোটেই—জিন্নার শত চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। বোকা বা শিশু বোঝানোর মত কোটি কোটি মানুষকে এটা বোঝানো হয় বা হয়েছে যে,

জিন্না সাহেবরাই দেশ ভাগ করেছেন। ক্ষণেকের জন্য যদি এটা মেনেই নেওয়া হয় তাহলে কি নেহরু, গান্ধী, প্যাটেল, মালব্য, মেনন, নেতাজী, চিত্তরঞ্জন, বিপিনপাল, তিলক, লাজপত রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীপ্রমুখ নেতাদের কোন যোগ্যতাই ছিল না, এটাই প্রমাণ হয় না? এও কি প্রমাণ হয় না যে, তখন জিন্নাই ছিলেন একমাত্র সার্থক রাজনীতিবিদ? তাহলে আসল সত্যটা কী? তা হচ্ছে এই, কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের ক্রমাগত বৃটিশ-বিরোধী লড়াই ও সংগ্রামকে নির্মূল করে বৃটিশের হাতকে আরো মজবুত করতে—"১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি মিঃ হিউম ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে যে জাতীয় চেতনা ক্রমশো সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য শাসনগত ব্যাপারে ভারতে একশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা লাভই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল।" [শ্রী সত্যেন সেনের লেখা 'পনেরোই আগষ্ট' পুস্তকের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

"রাজত্ব হারাইয়া মুসলমানগণই প্রথমে বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এবং প্রসঙ্গত এখানে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদের আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাকে অবলুপ্ত করিবার জন্যই বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের মত একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল।" [ঐ পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কংগ্রেসের মহান নেতারা ভারতের স্বাধীনতাই চান্‌নি, চেয়েছিলেন আংশিক [illegible] ক্ষমতামাত্র। অনুনয় ভিক্ষার ভাষায় যেগুলোর নাম ছিল 'স্বরাজ', 'স্বায়ত্তশাসন', 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ও 'হোমরুল' প্রভৃতি ছলনাময় শব্দ। কংগ্রেসের সর্বপ্রথম যিনি প্রকৃত বা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন তিনি বৃটিশ-বিরোধী, মুসলিম বংশজাত, খিলাফত কমিটির সদস্য হসরত মোহানী। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে গান্ধীজি তাঁকে তিরস্কার করে বসিয়ে বা থামিয়ে দিয়েছিলেন নিষ্ঠুরভাবে— "১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদে মৌলানা হসরত মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ The demand has grived me because it shows lack of responsibility. অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি আমাকে বেদনা দিয়াছে, কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।" [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬]

গান্ধীজি বলেছিলেন, ভারত ভাগ হবে তাঁর মৃতদেহের উপর। কিন্তু সাহেব লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশবিভাগের ব্যাপারে কিভাবে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতাদের বুঝিয়ে

বাহাদুর শাহ

মৌলানা আলী ভাতৃদ্বয়

মহাত্মা গান্ধী

বল্লভভাই প্যাটেল

মীর্জা গালিব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হসরত মোহানি

চিত্তরঞ্জন দাশ

রাজা গোপালাচারী

বিপিনচন্দ্র পাল

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

সুভাষচন্দ্র বসু

বালগঙ্গাধর তিলক

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

লাজপত রায়

'স্বাধীন ভারতে'র সীল
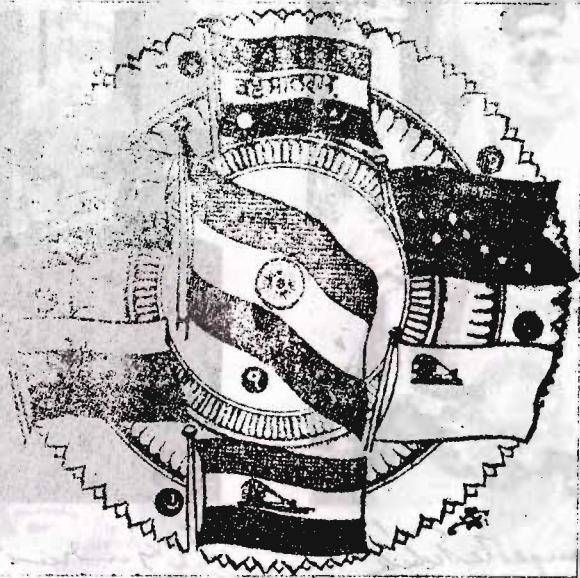
জাতীয় পতাকার বিবর্তন

একমত করাতে পারলেন সেটাই চিন্তার বিষয়—''মাউন্টব্যাটেন জানালেন যে, তিনি আন্তরিকভাবে গান্ধী নীতি অনুসারেই একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। অপরকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায় রাজী করাবার জন্য জোর না করা, নিজ নিজ সমাজের ইচ্ছা অনুসারে নিজ সমাজকে গড়ে তোলার অধিকার এবং যত শীঘ্র সম্ভব ভারত থেকে বৃটিশের প্রস্থান করা—গান্ধীজী নীতি ও অভিমতের এই প্রধান কয়েকটি লক্ষ্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেই এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।'' গান্ধীজি আরও বলেছেন, ''দেশ খন্ডনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট দায়ী নন। দেশখন্ডনে ভাইসরয়েরও কোন হাত নেই। ... আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যদি এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় সম্মত হতে না পারি তবে ভাইসরয় আর কি করতে পারেন?'' ['মোহভঙ্গ' ১৩৯০, অজয় কুমার হাজরার প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৪৭ হতে নেওয়া।]

পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাপক ডক্টর বরকতুল্লার 'স্বাধীন ভারতে'র সীলমোহর, তাঁদের ভারতীয় পতাকা তৈরির বিষয়, পতাকার বিবর্তনের ইতিহাস উচিত ছিল সকলের কাছে সহজলভ্য হওয়া।

বিখ্যাত বাগ্মী, আইনবিদ ও জেলখাটা নেতা আসফ আলি। তাঁর জ্ঞান, গুণ ও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত নেত্রী অরুণা তাঁকে বরণ করেন স্বামী হিসাবে। উভয়ে দেশগত-প্রাণ হয়ে লড়াই করলেন আজীবন। সেই আসফ আলীর স্ত্রী অরুণার নামও মুছে যাচ্ছে এক অজ্ঞাত কারণেই।

সেই বিখ্যাত নেতা বাদশা খাঁন বা সীমান্তগান্ধী উপাধিপ্রাপ্ত নেতা খান আব্দুল গফ্‌ফার খানের ইতিহাস স্পষ্ট নয় আজও।

ইংরেজ আমলে ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে মাদ্রাজের মুসলিম মোপলা বিপ্লবীরা হাজারে হাজারে আবালবৃদ্ধবণিতা যেভাবে কারাবরণ ও মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সেই রক্তাক্ত ইতিহাস ও মহান নেতৃবৃন্দের ছবি সরকারি মহাফেজ-খানায় জমা থাকলেও প্রকাশ করা হয়নি সহজভাবে।

শাইখুল ইসলাম উপাধিপ্রাপ্ত মনীষী, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী হোসেন আহমাদ মাদানী, প্রখ্যাত ইসলাম-বিশারদ মাওলানা মহম্মদ কাসেম, শাইখুল হিন্দ্‌ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ উলামাদের জেলখাটা ও কষ্টসহ্যের ইতিহাস সহজপ্রাপ্য হয়নি আজ পর্যন্ত।

সুভাষচন্দ্র বসুকে মৌলানা ওবাইদুল্লাহ কেন দাড়ি রাখিয়ে মুসলমানী পোষাক পরিয়ে 'জিয়াউদ্দিন' নাম দিয়ে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন সে ইতিহাস যেন আজও অজ্ঞাত। সুভাষ বোসের অন্তর্ধানের পর কেউ আঁচ করতে পারেন নি কে তাঁকে ভারতের

বাইরে কেন বা কিভাবে পাঠালেন? আর কারণ অজ্ঞাত ছিল বলেই আনন্দবাজার পত্রিকায় নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল।

সুভাষ বোসের 'আজাদ হিন্দ' ফৌজের বহু মুসলিম সৈন্যের প্রাণদান ও শতশত মুসলিম বিপ্লবীদের কারাবরণ ও ফাঁসির ইতিহাস আমি 'এ সত্য গোপন কেন?' পুস্তকে তুলে ধরেছি। ঐ সব মুসলিম নেতৃবৃন্দের, অন্ততঃ কিছু বড় মাপের নেতাদের ইতিহাস ও ছবি উচিত ছিল সহজলভ্য হওয়া। যেমন কর্নেল শাহনাওয়াজ, আবিদ হাসান, কর্নেল রাজা মহম্মদ আরশাদ প্রমুখ।

বর্তমান ইতিহাসের করুণায় মুসলিম জাতিকে যেমন নগণ্য ও জঘন্য মনে হয়, আসলে তা নয়। একদিন সারা বিশ্বের বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ 'প্রভু'রা মুসলমানদের দরবারে ক্রীতদাসের মত নতমস্তকে যেভাবে করুণা ও সুযোগ সুবিধা ভিক্ষা করত সে ইতিহাস আমাদের কাছে অনুপস্থিত।

বিশেষ একদল ঐতিহাসিকদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে সৎ ও স্বচ্ছচরিত্র মুসলিমদের ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রতিপন্ন করতে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁরা সফল হয়েছেন বলা যায়। কারণ মাওলানা হাফেজ আওরঙ্গজেব, মাওলানা হাফেজ সুলতান মাহমুদ ও মাওলানা হাফেজ মহম্মদ বিন তুঘলককে নিষ্ঠুর, হিন্দু বিদ্বেষী, পাগল, খামখেয়ালী, প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করতে এবং ইসলামী বিদূষী আলেমা ও হাফেজা জেবুন্নেসার মত মহীয়সী রাজকুমারীকে কুলটা চরিত্রে চিত্রিত করতে কলম কাঁপেনি তাঁদের। এ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' করা হয়েছে বিশদভাবে। চক্রান্তকারীদের কলমের খোঁচায় এইটুকু আজ দাঁড়িয়েছে যে, ধার্মিক নামাজী দাড়িওয়ালা মুসলিমরা গোঁড়া, আর অধার্মিক দাড়িবিহীন মুসলিমরা উদার, modern বা liberal। প্রকৃত ধার্মিক অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে নামাজ পড়া বা দাড়ি রাখা থেকে বিরত হন এই কারণেই। অথচ ইতিহাসে চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক তথা ভারতেরও রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক ও বিজ্ঞানের নেতাদের দাড়ি তাঁদের কলঙ্কিত করেনি গোঁড়া নামের কলঙ্কে। যেমন কার্লমার্কস, লেনিন, এঙ্গেলস, লিঙ্কন, বার্নার্ড শ, শেক্সপীয়র, চসার, টেনিসন, এরিস্টটল, সক্রেটিস, ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, লুই পাস্তুর, ডারউইন, ভারতের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উচ্চ প্রশংসিত মহামতি আকবর—এঁরা প্রত্যেকেই দাড়িমন্ডিত বা দাড়িওয়ালা ছিলেন। কেউ কেউ পরে দাড়িমুন্ডিত হয়েছিলেন যেমন বিবেকানন্দ, আকবর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

হুসেন আহমাদ মাদানী

সীমান্ত গান্ধী

মহঃ শরীয়তুল্লাহ

(A Courageous hand has the power of Destiny.)

THE
Constitution
OF THE
FEDERATED REPUBLICS
OF
INDIA.
1926.

'স্বাধীন ভারতে'র সংবিধান

আসফ আলি
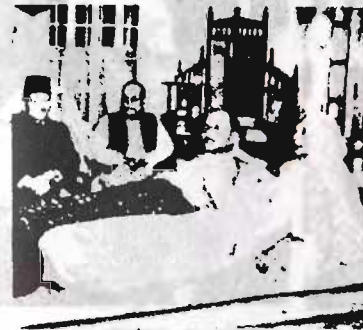
স্বামী বিবেকানন্দ

সম্রাট আকবর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা বড় রকমের আশ্চর্য ব্যাপার হোল, বৃটিশের পদলেহী, চামচা, সমর্থক এবং ভাড়াটে গুপ্তচরের মতো ব্যক্তিরাও ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন বিখ্যাত হিসাবে, অথচ যাঁদের বিখ্যাত হওয়া উচিত ছিল ইতিহাসের পাতায় তাঁরা অখ্যাতই থেকে গেলেন নীরবে। তাঁদের মধ্যে মুসলমান ও অচ্ছুত [?] হরিজনদের অবস্থা আরও করুণ।
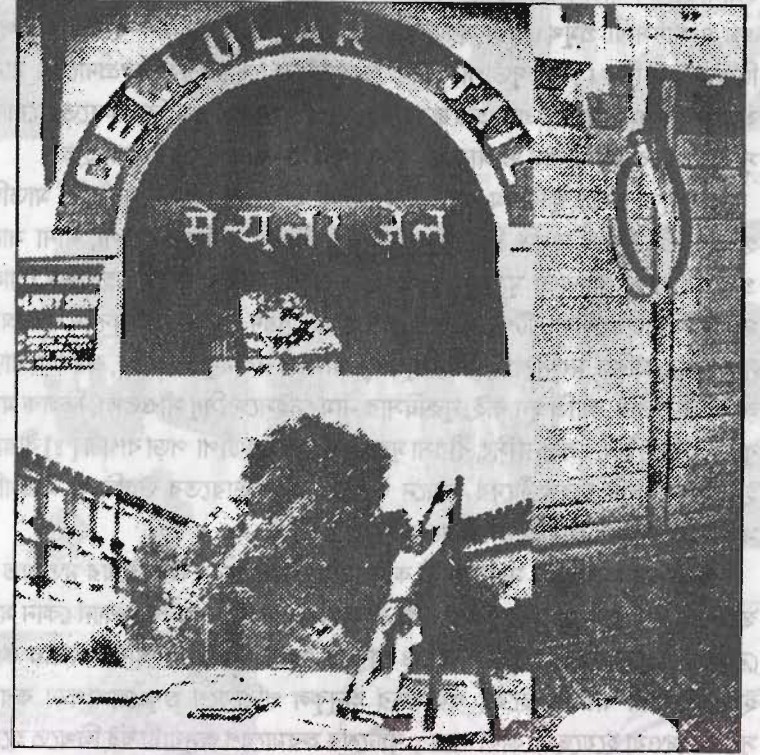
সেলুলর জেল। সঙ্গে বেত মারার স্ট্যাণ্ড এবং দেখা যাচ্ছে ফাঁসিকাঠও।

যে মুসলিম জাতিকে সর্বপ্রথমে শায়েস্তা করতে বৃটিশকে তৈরি করতে হয়েছিল আন্দামান দ্বীপে কুখ্যাত সেলুলর জেল, যেখানে তৈরি হয়েছিল ফাঁসি কাঠ, ঘানি ঘর ও আসামীকে অসহায় অবস্থায় চাবুক মারার জন্য কাঠের ফ্রেম তা যেন আজও অস্পষ্ট।

তদানীন্তন বিশাল ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হওয়া এক গৌরবময় ইতিহাস। তাঁদের নেপথ্য চরিত্র যাইহোক, ভারতবাসীর কাছে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বরণীয় ও মাননীয়। যেমন গান্ধীজি, উমেশ

নেহরু, প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী—এঁদের ইতিহাস ও ছবি সহজলভ্য, কিন্তু যা দুর্লভ হতে চলেছে তা হচ্ছে মুসলমান তথা অচ্ছুত ছোটলোকদের [?] ইতিহাস। ওই মহাপদে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন বদরুদ্দিন তায়বজী, নবাব সৈয়দ মহম্মদ, আর.এম.সায়ানি, সৈয়দ হাসান ইমাম, হাকিম আজমল খাঁন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, এম.এ.আনসারী প্রমুখ। এঁরা সকলেই মুসলিম। জগজীবন রাম—ইনিও ওই পদেই ছিলেন অধিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি 'অচ্ছুত' বা 'ছোটলোক' সম্প্রদায়ের মানুষ। অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায় এবং হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রভাবিত করতে প্রয়োজনে সুনিপুণভাবে এঁদের নাম ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা বর্তমান রাজনীতিতে অব্যাহত।

প্রাণদাতা নেতা ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, মদনলাল ধিংড়া, সূর্যসেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা, ভগত সিং, বাদল, বিনয়, দীনেশ, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব প্রমুখের সঙ্গে প্রাণদাতা মুসলিম নেতা শের আলী, আসফাকউল্লা, হাফেজ গোলাম মাসুম, সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ, সৈয়দ নিসার আলি, নবাব মীর কাশিম, মজনু শাহ, আহমাদুল্লাহ, মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, জামিলা খাতুন, আসগরী বেগম, আজিজুন বাই, নুরুন্নিসার নাম সেইসঙ্গে সিধু সাঁওতাল, তিলক মাঝি, বুধ সিং, হীরা সিং, লেহানা সিং, বীরসা মুন্ডা এবং শতশত চাপা পড়া বাগদী [?] বীরদের ইতিহাস ও ছবি ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হলে ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতির মজবুত সোপান তৈরি হোত নিঃসন্দেহে।

কোন কোন ভারতীয় মহান নেতা কারাগারে ধনী শ্বশুরের জামাইয়ের মত এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতেন যা প্রকাশ করা খুবই লজ্জাকর এবং বিপজ্জনক। কোন কোন মহান নেতা বন্দী অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়েও থাকতে পেতেন অবাধে। আরও মজার কথার ইঙ্গিত দেওয়া যায়—বছরের পর বছর অনুকূল পরিবেশে শুধু লেখাপড়া করারই সুযোগ দেওয়া হয়েছে ঐ কারাগারে ; বৃটিশের ফরমায়েশ অনুযায়ী বই লিখতে হয়েছে তাঁদের। কিছু অপদার্থ নেতা যাঁরা আন্তর্জাতিক মানের বই লিখতে সক্ষম ছিলেন না, ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে বই লিখিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের নামে। অথচ মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, মৌলানা হুসাইন আহমাদ, মৌলানা মাহমুদুল হাসান প্রভৃতি বেশিরভাগ মুসলিম নেতার কোমরে ও পায়ে শিকল ঝুলিয়ে বিনাশ্রম নয় বরং দেওয়া হয়েছে সশ্রম কারাদন্ড। সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেছেন সাঁওতাল, বাগদী, মুচি, হাঁড়ি, ডোম, মেথর গোষ্ঠীর বিপ্লবীরাও।

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একই কামরার জেলে থেকে শাহী খানাপিনা ও সেবক সেবিকার সেবা শুশ্রূষার সঙ্গে ডাক্তারের পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়াকে জেল বলে না ভাল সংরক্ষিত

বদরুদ্দিন তায়েবজী — নবাব সৈয়দ মহম্মদ — সৈয়দ হাসান ইমাম

হাকীম আজমল খাঁন — আবুল কালাম আজাদ — জগজীবন রাম

বুধ সিং — হীরা সিং — লেহানা সিং

হোটেলে অবসর যাপন বা চিত্তবিনোদন বলে বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু মুসলিম বিপ্লবী পুরুষদেরই শুধু কষ্ট দেওয়া হয় নি, তাঁদের বাড়ির মহিলাদেরও উলঙ্গ করে চাবুক মারা হোত ; সেকথা দেশবাসী সহজে জানতে পারলে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রদ্ধা জানাত তাঁদের।

করাচি সেন্ট্রাল জেলে মহম্মদ আলী এবং শওকত আলী

নেতা-নেত্রীদের কথা বাদ দিলে সাধারণ চাষী, কামার, কুমোর, তাঁতী, ধোপা প্রভৃতি বৃটিশ বিরোধী শ্রমিকদের যেভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তা প্রকাশে ঐতিহাসিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুচিবান নন। তখন তাঁতে কাপড় বোনার কাজটি মুসলমানেরাই করতেন বেশি; ওই মুসলিম তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুলটি কেটে দেওয়া হোত ব্যাপকভাবে যাতে তাঁরা আর কাপড় বুনতে না পারেন।

বৃটিশ ব্রেনের প্রশংসা করতেই হয়, তারা কেমনভাবে ক্রীতদাস বা গোলামের মত নতজানু হয়ে অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে মুসলমান বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করল এবং ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়ার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এক ঐতিহাসিক অভিনয় দেখাল—দিল্লিতে শক্তিহীন কাঠের পুতুলের মত মুসলিম শাসক আর মুর্শিদাবাদে নবাবের মসনদে ক্ষমতাহীন পুতুল নবাব একটির পর একটি তারা বসিয়ে চলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গীয় বা সর্বভারতীয় মুসলিম জনগণ যেন বৃটিশ বিরোধী না হয়ে ওঠে একসঙ্গে। অথচ যে নবাবদের বসানো হয়েছিল তাঁরা আসলে মসনদে উপবিষ্ট বৃটিশের বন্দী কয়েদীর মত ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। যেমন যথাক্রমে

মীরজাফর, মীরকাশিম, নাজমুদ্দৌলা, সাইফুদ্দৌলা, মোবারকদ্দৌলা, বাবর আলি, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুনজা, ফেরাদুনজা, হাসান আলি, ওয়াসেফ আলি প্রমুখ।

অধ্যাপক শান্তিময় রায় ঠিকই বলেছেন—আমাদের দেশে মিথ্যা ইতিহাস তৈরি করা যেন একটা 'শিল্প' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁরা লিখে ফেললেন, মায়ের ডাকে তিনি মাতৃভক্তিতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিলেন ভয়াবহ দামোদর নদে। সাঁতার কেটে পৌঁছালেন মায়ের কাছে। অথচ তাঁর সহোদর শম্ভুচরণ যিনি একই পরিবার, পরিবেশ, একই বক্ষের স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত, তিনি বলেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিনই সাঁতার জানতেন না।

সারাভারত তথা সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে পৌঁছেছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম তাঁর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করতে তাঁকেও হজরত মহম্মদের [স.] মত নিরক্ষর বলে প্রচার করা হয়েছে। অথচ বাস্তব সত্য এটাই, তিনি ছবি আঁকতে পারতেন এবং বাংলা লিখতে পারতেন শুধু নয়, তাঁর হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

'নিরক্ষর' রামকৃষ্ণদেবের হস্তাক্ষর

চরিত্রবান ঐতিহাসিকদের চরিত্রের এমনই গুণ যে, স্বাধীনতা আন্দোলনপর্বের যিনি জাতির জনক তাঁর নাম হিসাবে যাতে কেউ নিহত সিরাজউদ্দৌলার নাম করতে না পারে তার জন্য মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করে বলা হয়েছে তিনি নাকি চরিত্রহীন, বিলাসী, মদ্যপ এবং নিষ্ঠুর ছিলেন। নিষ্ঠুরতার ইতিহাস তৈরি করতে গিয়ে লিখতে হয়েছে অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস। আর এর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন লেখক মিঃ হলওয়েল। আগামী প্রজন্মের নিকট সাক্ষী হিসাবে তৈরি হয়ে গেল হলওয়েল মনুমেন্টও। কিন্তু বঙ্গীয় বীর সন্তান অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং সুভাষ বসুর চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবাদে সেই মনুমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হোল এবং ঐ ইতিহাসও মুছে দেওয়া হল যা পঞ্চম শ্রেণী হতে এম.এ. পর্যন্ত পড়ানো চলছিল অবাধে।

বৃটিশ বিরোধী 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের আহ্বানে মুসলমানেরা সাড়া দেয়নি—এটাও একটা ইতিহাস! যেহেতু ওই দলে মুসলমানদের খুব একটা নাম নেই। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে, ওই দলে মুসলমান যায়নি নয়, তাদের যাওয়ার পথ বন্ধ রাখা

হলওয়েল

হলওয়েল মনুমেন্ট

মাথায় গীতা, মুখে মন্ত্র, সামনে বগলা ঠাকুর—এই ছিল নতুন বিপ্লবীর শপথ গ্রহণের নিয়ম

হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। ওই দলের সদস্য হতে হলে বগলা দেবীর সম্মুখে গীতার মন্ত্র পড়ে হাঁটুগেড়ে বসে দীক্ষা নিতে হোত—যা ছিল মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব। [দ্রষ্টব্য 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', সুপ্রকাশ রায়]

মুজফফর আহমদ

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ তাদের ক্রুর পরিকল্পনায় মুসলমানদের ইতিহাস লুকিয়ে দেবে, তা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কিন্তু তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় লড়াই করা নিহত হওয়া মুসলমান, সাঁওতাল, হরিজন এবং 'চুয়াড়' নামে অভিহিত অনুন্নত ভারতীয়দের ইতিহাস চেপে রাখা সত্যঘাতী বিস্ময়। ঠিক এমনিভাবে মুসলিম কমিউনিস্ট নেতা যাঁরা কারাগারে বছরের পর বছর কষ্টভোগ করে তিলে তিলে মারা গেছেন সেই সব বঙ্গ ও ভারতখ্যাত নেতাদের নামও ক্রমে ক্রমে মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকে। আগামী প্রজন্ম কি তাঁদের প্রকৃত ও পূর্ণ ইতিহাস জানতে পারবে? কমরেড মুজফফর আহমদ, কম. আব্দুর রাজ্জাক খান, কম. আব্দুল হালিম, কম. আব্দুল্লাহ রসুল, কম. কতুবুদ্দিন আহমদ—এঁদের নামও কি তলিয়ে যাচ্ছে না ইতিহাসের পাতা থেকে? কম. মহম্মদ আলী সিপাসসী, কম. নিয়ামত, কম. আব্দুল কাদির, কম. জহিরুল হক, কম. সাজ্জাদ জহির, কম. মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, কম. ডক্টর আব্দুল আলীম, দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা কম. আমীর হায়দার খাঁন, কম. সৈয়দ মুতানাবী, কম. কে. এম. আশরাফ, কম. মুন্সী আহমাদউদ্দিন, কলকাতার শ্রমিক নেতা কম. আব্দুল মোমিন, বোম্বাইয়ের শহীদ কম.

আব্দুল্লাহ রসুল

বাবু গেণু, কম. গোলাম আম্বিয়া লুহানী, কম. শওকত ওসমানী, কম. মিএল আকবর শাহ, কম. আব্দুল মুজীদ, কম. রফিক আহমাদ, কম. লাল মহম্মদ, ফাঁসিতে মৃত কম. নাজাত আলী, কম. ফজলে ইলাহি কুরবান, বৈমানিক কম. আব্দুল করিম, বৈমানিক কম. নাজির সিদ্দীকী, কম. লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি সর্বভারতীয় ইতিহাসখ্যাত নেতাদের নাম আগামীতে জানতে পারা যাবে কি?

আব্দুল কাদির

আমীর হায়দার

আব্দুল হালিম

আব্দুল মোমিন

বাবু গেণু

কয়েক কোটি মানুষের কপালে কথকথিত মোহর মারা আচ্ছুত হরিজন সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যাঁরা রক্ত দিয়েছেন ও জেল খেটেছেন তাঁদের অনেকের ইতিহাস ও ছবি সরকারি সংরক্ষণে থাকলেও তাঁদের নাম আজও ভারতে বহুল প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে কি? শহীদ তিলক মাঝি, শহীদ নারায়ণ মুর্মু, শিবরাম সাঁওতাল, ভবানী বর্মন, শহীদ বাজী রাউতদের ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখা হবে কি?

শওকত ওসমানী

মিএল আকবর শাহ
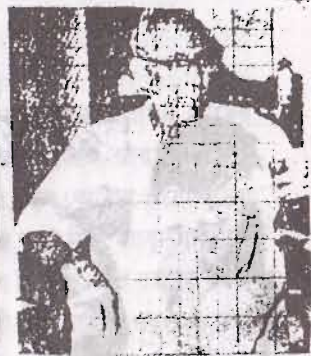
আব্দুল মজিদ

রফিক আহমাদ

ফজলে ইলাহি কুরবান

আব্দুল করিম

নাজির সিদ্দিকী

লিয়াকত হোসেন

সিধু সাঁওতাল

নারায়ণ মুর্মু ও ভবানী বর্মন

বাজী রাউত

তিলক মাঝি

বীরসা মুণ্ডা

চাকরির বণ্টন ব্যবস্থা

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা যে, বৃটিশ সরকার অর্থাৎ তদানীন্তন প্রশাসন তাদের ইচ্ছামত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক 'বাবু সমাজ'কে তুলে ধরেছে আর মুসলমান হরিজন আদিবাসীদের চেপে রেখে দিয়েছে অবনতির অতল তলে। আবার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই পরে তারা মুসলমান বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেছে আর হিন্দু 'বাবুসমাজ'কে বঞ্চিত রিক্ত ও কোণঠাসা করতে চেয়েছে। এইভাবেই দেশ বিভক্ত করে তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে তারা হয়েছে পলাতক। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীনতা পাবার পরও কাদের ইঙ্গিতে বর্তমান প্রশাসন মুসলিম এবং অনুন্নতদের চেপে রেখে দিতে চাইছে, তা আজ চিন্তার বিষয়। চাকরি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে বর্তমান চিত্র উপলব্ধি করতে পারা যাবে সহজেই।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ছিল অগ্রাধিকার ও সংখ্যাধিক্য। প্রশ্ন আসতে পারে, সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা দখল করেছিল চাকরির সুযোগ সুবিধার সিংহভাগ; সেটা কি মুসলমানদের অত্যাচার, নাকি তাদের সদিচ্ছার অভাব?

প্রকৃত সত্য এটাই যে, ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর নিজস্ব একটা করে জাত ব্যবসা ছিল, যেমন কেউ কর্মকার, কেউ চর্মকার, কেউ কুম্ভকার, কেউ স্বর্ণকার, কেউ ধোপা, কেউ কাঁসারী, কেউ চুনারী, কেউ তিলি, কেউ সূত্রধর, কেউ মেথর, কেউ বেদে, কেউ বারুই কেউবা পন্ডিত পুরোহিত। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ পেশায় লিপ্ত থাকতেন। কোন গোষ্ঠী অন্য কোন গোষ্ঠীর ব্যবসায় মাথা গলাতেন না। ফলে রক্ষিত হোত অর্থনৈতিক ভারসাম্য।

মুসলমান জাতির কিন্তু ধর্ম অনুযায়ী কোন বাধ্যতামূলক জাতব্যবসা ছিল না। বরং কোরআনের আদেশ বা প্রথম শব্দ হোল 'তুমি পড়'। অতএব পড়ালেখার বিষয়ে মুসলমান জাতি ধর্মীয় কারণেই ছিল অত্যন্ত অগ্রসর। ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ফার্সীতে মুসলিমদের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। আর শিক্ষিত হওয়ার কারণে এবং প্রশাসক জাতি হিসেবেও তাদের চাকরির ক্ষেত্র ছিল সহজলভ্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন হাতে ক্ষমতা পায় তখনই সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে তাদেরকে দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত করবে। বৃটিশ সরকার মন্থর গতিতেই করে চলেছিল এই মারাত্মক কুকর্মটি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের চাকরি কমিয়ে হিন্দু নিয়োগ দ্বিগুণ করে দেওয়া হোল। অর্থাৎ যেখানে দুজন হিন্দু চাকরিজীবী সেখানে মুসলমান একজন মাত্র। মারাত্মক পলিসি এগিয়ে চললো সর্পিল গতিতে। ১৮৭১ তে করা হোল তিনজন হিন্দু চাকরিজীবীর মধ্যে মুসলমান মাত্র একজন। তারপরের ধাপে প্রতি দশজন হিন্দুর মধ্যে মুসলমান চাকরিজীবী রাখা হোল মাত্র একজনকে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ১৪ জন হিন্দু—মুসলমান সেখানে শূন্য। প্রাকটিক্যাল ক্ষেত্রে হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ছজন, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা শূন্য। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে সাব-ইঞ্জিনিয়ার এবং ওভারশিয়ারের পদে হিন্দু ছিল চব্বিশজন, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র একজন। সার্ভে বিভাগে হিন্দু ছিল যেখানে তেষট্টি জন, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র দুজন। এ্যাকাউন্ট্যান্ট বিভাগে যেখানে হিন্দু ছিল পঞ্চাশ জন, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র তিনজন।

উচ্চশ্রেণীর চাকরির দিকে তাকালে অবাক হতে হবে আরও। ইংলন্ড হতে রাজকীয় নিয়োগপ্রাপ্ত দেওয়ানী আদালতসমূহে মোট নিয়োজিত ব্যক্তি দুশো ষাট জন, আর অস্থায়ী উচ্চপদে নিযুক্ত মোট সাতচল্লিশ জনের মধ্যে সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান শূন্য। এক্সট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে অফিসার ছিলেন মোট তেত্রিশ জন; তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান সেখানে শূন্য। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মোট একশো ছিয়ানব্বই জন, সেখানে মুসলমান ছিল মাত্র ত্রিশজন। ইনকাম ট্যাক্স এ্যাসেসরের মোট পদ ছিল ষাটটি, মুসলমান সেখানে ছজন মাত্র। রেজিষ্ট্রি বিভাগে মোট অফিসার ছিলেন আটান্ন জন, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র দুজন।

জজ ও সাবজজ পদের মোট সংখ্যা ছিল সাতচল্লিশ, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র আটজন। মুন্সেফের পদে নিযুক্ত ছিলেন দুশো ষোল জন, সেখানে মুসলমান রাখা হোল সাঁইত্রিশ জন। পুলিশ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদগুলোতে মোট চাকরির আসন ছিল একশো ন'টি। সব পদগুলোই ছিল হিন্দুর—মুসলমান ছিল শূন্য। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারের মোট পদ ছিল একশো তিয়াত্তরটি, মুসলমানের সংখ্যা সেখানেও ছিল শূন্য। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে অধীনস্থ আমলার পদ ছিল দুশো একটি—সেখানে মুসলমান ছিল চারজন মাত্র। পাবলিক ওয়ার্কস্ এ্যাকাউন্ট্যান্ট বিভাগের মোট পদ ছিল ছিয়াত্তরটি, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা করা হয়েছিল শূন্য।

শিক্ষা বিভাগ, শুল্ক ও আবগারী বিভাগে মোট পদ ছিল চারশো বাইশটি, সেখানেও মুসলমানের সংখ্যা করা হোল শূন্য। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে উচ্চ পদ ছিল মোট একশো চুয়ান্নটি, তাতে মুসলমান

রাখা হোল মাত্র চারজন। সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জেলা মেডিক্যাল অফিসারের মোট পদ ছিল তিপান্নটি, সেখানে মুসলমান রাখা হোল মাত্র একজন।

হাইকোর্ট অব জুরিসডিকশান জজদের সকলেই হয়ে গেলেন হিন্দু—মুসলমান সংখ্যায় হয়ে গেল শূন্য।

ঐ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সরকারি আইন সম্বন্ধীয় এ্যাডভাইসার বা পরামর্শদাতা ছিলেন মোট ছজন, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা রাখা হোল শূন্য। হাইকোর্টের উল্লেখযোগ্য সম্মানীয় অফিসারের পদ ছিল একুশটি, মুসলমান সেখানে শূন্য। ঐ সময় মুসলমান ব্যারিষ্টারের সংখ্যাও ছিল শূন্য। ১৮৩৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত যত উকিল ছিলেন তার অর্ধেক ছিল মুসলমান। ১৮৬৯ তে দেখা গেল মুসলমান উকিল মাত্র একজন।

এবার আইন ব্যবসায়ের দ্বিতীয় স্তরে দেখা গেল, কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাটর্নী বা সলিসিটর পদে হিন্দু ছিলেন সাতাশজন, সেখানে মুসলমান সংখ্যায় ছিল শূন্য।

১৮৬৮ তে কলকাতা হাইকোর্টে রেজিষ্ট্রারের দফতরে মোট পদ ছিল তেইশ, সেখানেও মুসলমান ছিল শূন্য। রিসিভার দফতরের মোট ছটি পদের সকলেই ছিলেন হিন্দু—মুসলমান শূন্য। ক্লার্ক অব্ দ্য ক্রাউন এবং ট্যাক্স অফিসারের পদের সংখ্যা ছিল ন'টি; সেখানে সকলেই ছিলেন হিন্দু, মুসলমান সংখ্যায় ছিল শূন্য। অনুবাদ-দফতরে কুড়িটি পদের একজন ছিলেন মুসলমান, বাকী সকলেই ছিলেন হিন্দু।

সারা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সামান্য দৃশ্য তুলে ধরা হোল মাত্র। দেশের অন্যান্য প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই ঐ কর্মযজ্ঞ চলেছিল এইভাবেই।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট শক্তির হস্তান্তর দিবস বা তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস; বৃটিশ চলে গেল তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে। ১৯৪৭-এর পর থেকে মার খাওয়া, রক্ত দেওয়া ও প্রাণ দেওয়া মুসলিম জাতি ভেবেছিল তারা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুখ দুঃখের সমান অধিকারী হয়ে ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবকিছু সুযোগ সুবিধা ন্যায্যভাবে পেতে থাকবে। কিন্তু তা হোল না। নমুনা স্বরূপ শুধু পশ্চিমবঙ্গের চাকরির পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে বর্তমান ভারতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

একদল বিশেষজ্ঞের মতে এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় একের তিন। ১৯৬৭ তে পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ আমলা আই.এ.এস. অফিসারের পদ ছিল একশো আটাত্তরটি। সেখানে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ ধরলে তাদের পাওয়া উচিত ছিল ষাটটি পদ, কিন্তু বাস্তবে মুসলমান পেয়েছে মাত্র একটি। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টরের মোট পদ ছিল চারশো তেত্রিশটি, মুসলমান সেখানে একশো চুয়াল্লিশটির পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র ন'টি। ১৯৭৫-তে মোট আই.এ.এস. পদ ছিল দুশো বাহান্নটি,

মুসলমান এক্ষেত্রে চুরাশিটি চাকরির বদলে পেয়েছে মাত্র দুটি। আই.পি.এস. পদ যেখানে ছিল একশো নব্বই, মুসলমান সেখানে তেষট্টির বদলে পেয়েছে চারটি। হায়ার জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদ যেখানে ছিল তিরানব্বই, সেখানে মুসলমান একত্রিশের পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র একটি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ যেখানে ছিল ছশো, মুসলমান এক তৃতীয়াংশ হিসাবে দুশোর পরিবর্তে সেখানেও পেয়েছে মাত্র একটি। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টরের মোট পদ যেখানে ছিল ছশো চুয়ান্নটি, মুসলমান সেখানে দুশো আঠারোটির পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র উনিশটি। উচ্চ আবগারী পদ মোট যেখানে ছটি, সেখানে মুসলমান শূন্য। নিম্ন আবগারী পদ ছিল একশো একুশটি, সেখানে মুসলমানেরা চল্লিশটির পরিবর্তে পেয়েছে সাতটি।

বামফ্রন্টের আমলে মুসলিমদের চাকরির ছবিটিও তুলে ধরা হচ্ছে। ১৯৭৭ সালে [ক] আই.এ.এস. পদ দুশো চৌষট্টি, মুসলমান সেখানে অষ্টাশি জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র দুজন। ঐ বছরেই পুলিশ বিভাগে কর্মচারি নেওয়া হয়েছে ছেষট্টি হাজার একশো তিনজনকে, সেখানে মুসলমান বাইশ হাজারের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র চারহাজার দুশো ত্রিশ জনকে।

[খ] আই.পি.এস. পদ যেখানে ছিল দুশো চারটি, মুসলমান সেখানে আটষট্টিটির পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র চারটি পদ।

[গ] ডব্লু.বি.সি.এস. প্রশাসনিক বিভাগে যেখানে মোট পদ পনেরশো পঁচাত্তরটি, মুসলমান সেখানে পাঁচশো পঁচিশের পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র আটত্রিশটি।

[ঘ] হায়ার জুডিসিয়াল সার্ভিস পদ যেখানে আশিটি, সেখানে মুসলমান ছাব্বিশটির পরিবর্তে পেয়েছে মাত্র দুটি।

এবার ১৯৮৮ সালের ছবি। উপরোক্ত 'ক' বিভাগে লোক নেওয়া হয়েছে মোট দুশো একানব্বই জন, সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে সাতানব্বই-এর পরিবর্তে মাত্র দুজন।

উপরোক্ত 'খ' পদে মোট নেওয়া হয়েছে দুশো ছ'জনকে, সেখানে মুসলমান আটষট্টি জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র ন'জনকে।

উপরোক্ত 'গ' পদে লোক নেওয়া হয়েছে মোট পনেরশো তিরাশি জন, মুসলমান নেওয়া হয়েছে সেখানে পাঁচশো সাতাশ জনের পরিবর্তে আশি জন মাত্র। উপরোক্ত 'ঘ' পদে নেওয়া হয়েছে মোট একশো আশি জনকে, সেখানে মুসলমান বাষট্টি জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র ছ'জনকে।

এবার অপেক্ষাকৃত নিম্নমর্যাদার পদগুলোতে চাকরির ছবি দেখা যাক। ১৯৮৩-তে স্টেট্ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস পদে লোক নেওয়া হয়েছে দুশো একজন, সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে সাতষট্টি জনের পরিবর্তে দুজন মাত্র। এ্যাকাউন্ট এণ্ড অডিট সার্ভিসে

লোক নেওয়া হয়েছে মোট দুশো তিনজন, সেখানে মুসলমান সাতষট্টি জনের পরিবর্তে চাকরি পেয়েছে মাত্র দুজন। স্টেট লেবার সার্ভিস পদে লোক নেওয়া হয়েছে মোট তিনহাজার পঞ্চান্ন জন, মুসলমান একহাজার আঠারো জনের পরিবর্তে সেখানে চাকরি পেয়েছে মাত্র একচল্লিশ জন। স্টেট ভেটারানারি সার্ভিসে লোক নেওয়া হয়েছে মোট আটশো উনত্রিশ জন, সেখানে মুসলমান দুশো ছিয়াত্তর জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র সাতাশ জনকে। জুডিসিয়াল সার্ভিসে মোট চাকরি হোল পাঁচশো সাতচল্লিশ জনের, সেখানে মুসলমান একশো বিরাশি জনের পরিবর্তে নেওয়া হোল মাত্র চব্বিশ জনকে।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দে চাকরির খতিয়ান তুলে ধরে বলা যায়, এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট জজ্ পদে নেওয়া হোল একশো কুড়ি জনকে—মুসলমান চল্লিশ জনের পরিবর্তে নেওয়া হোল মাত্র একজনকে। মুন্সেফের পদে নেওয়া হোল দুশো বাহান্ন জনকে, সেখানে মুসলমান চুরাশির পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র একুশ জনকে।

সাব রেজিস্ট্রারের পদে মোট একশো একুশ জনকে যেখানে নেওয়া হোল, সেখানে মুসলমান চল্লিশজনের পরিবর্তে নেওয়া হোল মাত্র চারজনকে।

ফরেস্ট বা বন বিভাগে অফিসার ও সাধারণ কর্মচারি মিলিয়ে মোট চাকরি হয়েছে ন'হাজার সাতশো সত্তর জনের, সেখানে মুসলমান তিনহাজার দুশো ছাপান্ন জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র তিনশো ষোল জনকে।

জেল ওয়ার্ডেন হিসাবে নেওয়া হয়েছে মোট দুহাজার পাঁচশো তিরাশি জনকে, সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে মাত্র একশো আটজন। অথচ এক তৃতীয়াংশ হিসাবে তাদের আটশো একষট্টি জনের এই চাকরি পাওয়া উচিত ছিল।

পরিবেশ দপ্তরে মোট নেওয়া হয়েছে চুয়াত্তর জনকে, মুসলমান সেখানে চব্বিশটির বদলে পেয়েছে শূন্য।

সি. এস. টি. সি. বা কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগে অফিসার নিয়োগ করা হোল একশো পঁয়ত্রিশ জনকে, সেখানে মুসলমান পঁয়তাল্লিশের পরিবর্তে পেল শূন্য। ঐ বিভাগেই কর্মী নিয়োগ করা হোল তের হাজার আটশো তেষট্টি জন, সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে চারহাজার ছশো একুশ জনের পরিবর্তে মাত্র পাঁচশো দু'জনকে।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় অফিসার নিয়োগ করা হোল মোট বত্রিশ জন, মুসলমান দশ জনের পরিবর্তে সেখানেও শূন্য। ঐ বিভাগে সাধারণ কর্মী নেওয়া হোল পাঁচহাজার ন'শো একান্ন জন, সেখানে মুসলমান নেওয়া হোল একহাজার ন'শো তিরাশির পরিবর্তে দুশো চব্বিশজন মাত্র।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ এই বারো বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারি নিয়োগে মুসলমান কত জন নেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করা হচ্ছে।

খাদ্য দপ্তরে মোট অফিসার নেওয়া হয়েছে চারহাজার তিনশো চৌষট্টি জন—সেখানে মুসলমান চোদ্দশো চুয়ান্নজনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র দুশো পাঁচজন।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে মোট লোক নেওয়া হয়েছে মোট একহাজার একাশি জন, সেখানে মুসলমান তিনশো ষাট জনের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মাত্র ছাব্বিশ জনকে। পর্যটন দপ্তরে মোট লোক নেওয়া হয়েছে একশো তিয়াত্তর জন—সেখানে মুসলমানের পাওয়া উচিত ছিল সাতান্নটি পদ, কিন্তু চাকরি পেয়েছে চারজন মাত্র। মৎস্য দপ্তরে মোট ন'শো বত্রিশ জন চাকরি পেল, মুসলমান তিনশো দশ জনের পরিবর্তে চাকরি পেল মাত্র দশ জন।

১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ এই তিন বছরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর মাধ্যমে চাকরি হয়েছে মোট একত্রিশ হাজার ছ'শো উননব্বই জনের—সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে দশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি জনের পরিবর্তে ন'শো চুরানব্বই জন মাত্র।

যে সমস্ত চাকরির জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় না, অল্প লেখাপড়া জানলেই হয়, সেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে ঐ ১৯৮৮ তে মোট চাকরি দেওয়া হয়েছে দশ হাজার দুশো পঁচাশি জনকে—সেখানে মুসলমান নেওয়া হয়েছে তিনহাজার চারশো আটাশ জনের পরিবর্তে চারশো ন'জন মাত্র।

রক্তাক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লড়াই করে বাঁচার ব্যাকুলতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সমর্থনে বামফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৮-তে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে মোট আটহাজার ন'শো সাতাশিজনকে নিয়োগ করলেন, সেখানে মুসলমানরা তিন হাজারের মত চাকরি পাবে আশা ছিল । তিনহাজার তো দূরের কথা তিনশোও নয়, মুসলমান চাকরি পেল মাত্র দুশো চোদ্দজন।

দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে পুলিশ বাহিনীর। সেক্ষেত্রে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯-এ বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ বিভাগের সাব ইনস্পেক্টর পদে লোক নিয়োগ করেন মোট একশো বাইশ জন—সেখানে মুসলমান চল্লিশ জনের চাকরি পাওয়ার কথা, কিন্তু একজনকেও নেওয়া হয় নি। আর কনস্টেবল পদে নেওয়া হোল মোট একহাজার তিনশো বিরানব্বই জন—মুসলমান সেখানে চারশো চৌষট্টির পরিবর্তে চাকরি পেল একশো তিতাল্লিশ জন মাত্র।

ঐ ১৯৮৭-৮৮ তে কনস্টেবল নেওয়া হয়েছিল মোট একহাজার ছ'শো উননব্বই জন, সেখানে মুসলমান পাঁচশো তেষট্টিটি চাকরির বদলে পেয়েছে ছিয়াত্তরটি মাত্র। ঐ বছরেই সাব ইনস্পেক্টর পদে নেওয়া হয়েছিল পঞ্চান্ন জনকে, সেখানে মুসলমান আঠার জন তো দূরের কথা, একজনও চাকরি পায়নি।